ডাক বাংলার ডায়রী

"Dak Bunglow Diary"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

নবপত্র প্রকাশন
৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলকাতা ৯

প্রথম প্রকাশ ১লা ভাদ্র, ১৩৭২

প্রকাশক । প্রসূন বসু
নবপত্র প্রকাশন
৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলকাতা ৯

মুদ্রক । যশোদা সাহা
নিউ এজ প্রিণ্টার্স
৫৯ পটুয়াটোলা লেন । কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ ও স্কেচ । সুবোধ দাশগুপ্ত

আট টাকা

যার পাল্লায় প'ড়ে

'আমার বাংলা' লিখেছিলাম

সেই বন্ধু

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়-কে

DAK BANGLAR DIARY

BY

SUBHAS MUKHOPADHYAY

ডাকবাংলার ডায়রী

এই লেখকের

* আমার বাংলা
* যখন যেখানে

ভূমিকা ও পটভূমিকা

জলে-ভেজা পুরনো যে ছবিটা মনে পড়ে যাওয়ায় ভূমিকার সঙ্গে ভয়ে ভয়ে পটভূমিকাটা জুড়ে দেওয়া হল, সে ছবিটা ছিল এই ;

একটা নারকোল গাছ। তার গায়ে টাঙানো বড় একটা দেয়াল-ঘড়ি। তার নীচে বাঁশের মাচার ওপর দোকান খুলে ব'সে একজন মুদি তার খদ্দেরদের জিনিস মেপে দিচ্ছে।

চারপাশে বন্যার জলে মাঠঘাট একাকার হয়ে নেই। ঘরবাড়ির চাল ডুবে নেই। বন্যার খবর আনতে গিয়ে শেষে কিনা এই ছবি? আক্কেল দেখে 'জনযুদ্ধ' আপিসে সবাই খুব হেসেছিল।

অথচ বানভাসি হওয়ার সব লক্ষণই সেখানে মজুত ছিল। তবে সামনে নয়, পেছনে। যে-মুখো হয়ে ফটো তোলা হয়েছিল, তার ঠিক উল্টো মুখে। ঘরবাড়ি ছেড়ে দুর্গত লোকজনেরা যে উঁচু ডাঙাটাতে এসে আশ্রয় নিয়েছিল, ওটা ছিল সেই উঁচু ডাঙার ছবি। গাছে টাঙানো ঘড়ি দেখাতে গেলে পেছনের জল দেখানো যায় না।

ঐ একটা ছবিই নয়। আরও ছবি তোলা হয়েছিল। সাক্ষাৎ বন্যার ছবি। ক্যামেরা জলে পড়ে গিয়ে ফিল্ম ভিজে যাওয়ায় বাকি একটা ছবিও ওঠে নি। ফলে, ঐ জলছুট ছবিটাই অগত্যা ছাপাতে হল।

গ্রামবাংলায় সেই আমার প্রথম খবর আনতে যাওয়া। 'আমার বাংলা' লেখায় সেই আমার পয়লা হাতেখড়ি।

বিশ বছর বাদে গিয়ে সে জায়গা চিনতেই পারি নি। গ্রামের ভোল বদলে সে জায়গায় এখন শহর বসেছে। ফাঁকা মাঠগুলোতে উঠেছে পাকা দালানকোঠা। লোকে এখন আর বন্যার ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকে না। বরাবর ধেয়ে এসে যে দামোদর ডুবিয়ে দিয়ে যেত—তাকে লাগামে বেঁধে, দৌড়ঝাঁপ করিয়ে—তারই জোরে সেখানে এখন আলো জ্বলছে, কলের চাকা ঘুরছে।

'আমার বাংলা'র পর 'ডাকবাংলার ডায়রি'। এক যুগ গিয়ে আরেক যুগ। মাঝখানে দাঁড়িয়ে দ্বিখণ্ডিত দেশ। স্বাধীনতার সমবয়সী দুটি দশক।

আস্ত অটুট ষোলআনা বাংলাদেশ নয় আর। এখন পুবে পশ্চিমে দশ-আনা ছ-আনায় দুভাগ হওয়া বাংলার জল হাওয়া মাটি। ভাই ভাই এখন দুই ঠাঁই। দুদিকে পৃথক দুই রাজ্যপাট। ভিন্ন নাম-নিশান। কিন্তু নাম আলাদা হলেও ডাক এক। ডাক বাংলা। এ তাই সেই এপারের একালের দিগ্‌দেশচিহ্নিত 'ডাকবাংলার ডায়রি'।

ডাকবাংলা। এই নামটার মধ্যে আরও একটা ইচ্ছের জায়গা করা ছিল। ইচ্ছে ছিল, ডাকবাংলো থেকে ডাকবাংলোয় বেদের টোল ফেলে ফেলে সারা গ্রামবাংলা টহল দেবার। যেখানে রেল-ভাড়াই জোটানো মুস্কিল, সেখানে ডাকবাংলোয় থাকবার কথা তো উঠতেই পারে না। শুধু গাড়িভাড়া সম্বল করে বেরিয়েছি। বাংলাদেশের গ্রামে কী, শহরে কী—কোথাও থাকতে খেতে দেবার লোকের আমার অভাব হয় নি।

'ডাকবাংলার ডায়রি' গোড়ায় শুরু করি আনন্দবাজার পত্রিকায়। কিন্তু শেষরক্ষা হয় নি। দিন আনি দিন খাই ক'রে সংসার চালিয়ে বাইরে বেরিয়ে একবারে একটানা অনেকদিন থাকা সম্ভব নয়, এটা

বোঝা গেল। ফলে, কলমও আর চলল না।

কিন্তু রোগেশোকেঅভাবে বাধা পড়লেও হাল ছাড়ি নি। গত সাত-আট বছরে পশ্চিমবঙ্গের ষোলটি জেলাতেই ঘুরেছি। কোথাও এক-বার, কোথাও একাধিকবার। ঘুরতে হয়েছে সুবিধে-সুযোগমত। ফলে, স্থানকাল বাছাইয়ের ওপর আমার নিজের তেমন হাত থাকে নি। এদিকে পুরুলিয়া, ওদিকে গোটা উত্তর বাংলা আরও সময় নিয়ে আরও খুঁটিয়ে দেখব ব'লে ঘুরে এসে তখন তখনই লিখি নি। পরে আর সে সুযোগ না পাওয়ায় 'ডাকবাংলার ডায়রি'তে বড় রকমের একটা ফাঁক থেকে গেল।

সমস্তই ঘুরে ঘুরে এক নজরে দেখা। শুধু দেখা নয়, অনেক-খানিই শোনা। বাইরে থেকে গিয়ে এইভাবে দেখাশোনার ব্যাপারে পরমুখাপেক্ষী হওয়া ছাড়া উপায়ও থাকে না। আসলে যেটা দাঁড়ায়, সেটা হল ঘুরে বেড়িয়ে পরের অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করা। শুধু অভিজ্ঞতা নয়, প্রায়ই কথাগুলো পর্যন্ত অন্যের যোগানো। এই পরমুখাপেক্ষিতার দোষগুণ দুইই এতে বর্তেছে। অবশ্য লেখকের দেখার ভুল, শোনার ভুল বা বোঝবার ভুলও কোথাও কোথাও হয়ে থাকতে পারে। তার জন্যে লেখক ছাড়া আর কেউ দায়ী নন।

যাঁরা আমাকে খেতে দিয়ে, থাকতে দিয়ে, খবরাখবর যুগিয়ে সাহায্য করেছেন—বাংলার শহর-গ্রামের চেনা অচেনা সেই অসংখ্য মানুষের কাছে আমি ঋণী।

আমি গবেষক নই! আমার ভূমিকা গ্রামবাংলায় পথচারীর। আমার দৌড় ততটুকুই--যেতে যেতে বাইরে থেকে যতটুকু চোখে পড়ে, যতটুকু কানে আসে।

নতুন মানচিত্রে নতুন পটভূমি।

ভারতের মানচিত্রের অগ্নিকোণে এখন পশ্চিমবঙ্গ। আলাদা ক'রে দেখলে মনে হয় যেন মাথায় ঝুঁটি-বাঁধা সুবচনীর হাঁস। তার ঝুঁটির

মধ্যে হিমালয়। গলায় কণ্ঠী পরিয়েছে গঙ্গা আর সেই কণ্ঠী থেকে একফালি সুতোর মত নেমে এসেছে ভাগীরথী। তার পায়ের কাছে ঢেউ দিচ্ছে বঙ্গোপসাগর।

তার গায়ে গা দিয়ে রয়েছে আপনপর সাত সাতটি রাজ্য। আর তার স্থলপথে জলপথে আকাশপথে পা বাড়ালেই মিলবে ভূভারত।

এত কাটাছেঁড়ার পরেও, কী আশ্চর্য, এপারে এখনও সেই আসমুদ্রহিমাচল বাংলা।

উত্তরে মহাকায় হিমালয় আর পশ্চিমে ছাড়া-ছাড়া কয়েকটা ক্ষয়াটে খর্বুটে পাহাড় বাদ দিলে এ রাজ্যের বাকি সমস্তটাই নদনদীতে খণ্ড-বিখণ্ড সমতল। পশ্চিমবঙ্গের ভূ-প্রকৃতিকে উত্তরে দক্ষিণে মোটামুটি দুভাগে ভাগ করেছে একদিকে হিমালয় আর একদিকে গঙ্গাভাগীরথী। জমিজায়গার বড় অংশই রকমারি চাষের উপযুক্ত উর্বর পলিমাটিতে গড়া। পশ্চিমের লাল মাটি পাথুরে মাটিতেও সেচের জলে চাষ করার সুবিধে। কিন্তু দক্ষিণ প্রান্তের মাটি নোনা-লাগা ব'লে তাতে বিশেষ ফলন হয় না।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আয়তন প্রায় ৩৪ হাজার বর্গমাইল। এ রাজ্যের ১২০টি শহরে আর ৩৫ সহস্রাধিক গ্রামে প্রায় ৭ কোটি লোকের বাস। পূর্ববঙ্গ থেকে উদ্বাস্তু আসা ছাড়াও অন্যান্য রাজ্য থেকে ক্রমাগত লোক আসে ব'লেও পশ্চিমবঙ্গে লোকসংখ্যা এত বেশী। লোকসংখ্যার বারো আনা গ্রামবাসী। এ রাজ্যের শহরবাসী লোকের মধ্যে শতকরা ৮৬ জনেরই বাস কলকাতা হাওড়া হুগলী চব্বিশ-পরগণা বর্ধমান এই পাঁচটি জেলায়। বাকি শতকরা ১৪ জন শহরবাসী থাকে রাজ্যের বাকি এগারোটি জেলায়। এ থেকে বোঝা যায়, সারা রাজ্যে ছড়িয়ে না থেকে বেশির ভাগ শহরাঞ্চল কাছাকাছি জায়গায় ভিড় ক'রে রয়েছে।

জনবলের কোঠায় তাদেরই ফেলা হয়, যাদের বয়স ১৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে—কাজ করুক না করুক, যারা কর্মক্ষম। এ রাজ্যে মোট

জনবলের বারো আনা গ্রামে ও সিকি ভাগ শহরে থাকে। গ্রামের চেয়ে শহরে স্ত্রীর চেয়ে পুরুষ জনবলের অনুপাত ঢের বেশী। মোট জনবলের মধ্যে শতকরা মোটে ৫৭ জন লোক রুজি-রোজগারের কাজ করে। পেট চালানোর মত যাদের রোজগার হয় না, এই হিসেবে তাদেরও ধরা হয়েছে। কর্মক্ষম পুরুষদের মধ্যে শতকরা ১৩ জনের কোনো কর্মসংস্থান নেই। কর্মক্ষম মেয়েদের মধ্যে শতকরা মাত্র ১৯ জন রুজি-রোজগারের কাজ করে। এ থেকে এ রাজ্যে বেকার সমস্যা কী ভয়াবহ এবং কী পরিমাণ কর্মশক্তি কোনো কাজেই লাগছে না, তা বোঝা যাবে।

মোট উপার্জনকারীদের মধ্যে কৃষিকাজে উপার্জনকারীর সংখ্যা শতকরা ৫৩ জন। কৃষিকাজে নিযুক্ত মোট লোকের সংখ্যা গত চল্লিশ বছরে বিশেষ বাড়ে নি। এ থেকে বোঝা যায়, এ রাজ্যে কৃষিতে নতুন কর্মসংস্থান বিশেষ সম্ভব নয়। সুতরাং কৃষি ভিন্ন অন্যান্য ক্ষেত্রে রুজি-রোজগারের পথ প্রশস্ত করতে হবে। গ্রামাঞ্চলে কাজে নিযুক্তদের মধ্যে কৃষিকাজ করে শতকরা ৬৯ জন। বাকি শতকরা ৩১ জনের জীবিকা কারুকর্ম, দোকানদারি, ছোটখাট ব্যাবসা এবং চাকরি। সারা ভারতে কৃষিজীবীদের জমির হার যেখানে জনপ্রতি ১৫ বিঘে, সেক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে পুরো ১০ বিঘেও নয়। ফলে, পশ্চিমবঙ্গে কৃষিকাজে নিযুক্তদের মধ্যে সিকি ভাগ লোককে বা[illegible] হয়ে কৃষিকাজ ছাড়াও রোজগারের অন্য উপায় দেখতে হয়।

পশ্চিমবঙ্গের অর্ধেক জনবল কৃষিতে নিযুক্ত থাকলেও কৃষি থেকে আয় রাজ্যের মোট আয়ের মাত্র এক-তৃতীয়াংশ। এ রাজ্যের মোট এলাকার শতকরা ৬০ ভাগ জমিতে চাষ হয়। তাতেও কৃষিজীবী জনসংখ্যার মাথাপিছু আবাদী জমির পরিমাণ দাঁড়ায় দু' বিঘের মত। জমি উর্বরা হওয়া সত্ত্বেও ফলন হয় খুবই কম। তার একটা বড় কারণ সেচের জলের অভাব।

হুগলী, বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, মালদহ আর পশ্চিম দিনাজপুরে

শতকরা ৭০ ভাগেরও বেশী এলাকায় চাষ হয়। সেক্ষেত্রে মোট এলাকার মাত্র শতকরা ২৮ ভাগে চাষ হয় দার্জিলিঙে এবং শতকরা ৪৫ ভাগে হয় জলপাইগুড়িতে। পশ্চিমবঙ্গের খুব কম পরিমাণ জমিতেই একটার বেশী ফসল হয়।

ফসল বলতে ধান আর খাবার ফসলই প্রায় একচেটে। আখ, পাট, তামাক, চা—এসব রকমারি অর্থকরী ফসলের ওপর জোর ঢের কম পড়ে। দেশে অন্নাভাব এবং কম ফলনই এর কারণ। পশ্চিমবঙ্গে ধানের গড় ফলন যা, মাদ্রাজে তার দেড়া। পাটের ফলন আসামের চেয়ে একরে প্রায় আড়াই মণ কম। আখের ফলন বোম্বাই রাজ্যের তুলনায় অর্ধেক। পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশী ধানের ফলন বর্ধমানে এবং আখ আর পাটের ফলন হুগলীতে।

রাজ্যের অর্ধেকেরও বেশী পরিমাণ চাষের জমিতে সেচের এখনও কোনো ব্যবস্থা হয় নি। অথচ বৃষ্টির জল বছরে মোটে চার পাঁচ মাস। দেখা গেছে, সেচের জল ভালমত পেলে ধানের ফলন বিঘেয় প্রায় তিন মণ ক'রে বাড়ে।

সেই সঙ্গে দরকার সার দিয়ে জমির উর্বরতা বাড়ানো। ঠিক জমিতে ঠিক সার দিলে চাষের ফলন দ্বিগুণ বাড়তে পারে। সেই সঙ্গে উন্নত বীজ ব্যবহার করলে উৎপাদন আরও প্রায় দশ ভাগের এক ভাগ বাড়ানো যায়।

চাষের ধরনধারণও অনেকখানি বদলানো দরকার। সময়মত বীজ বোনা, ঠিকমত নিড়ানো, গোবর সার আর পাতাপচানি দেওয়া, পোকা মারা—এ সবের ব্যবস্থা হলেও ফলন অনেকখানি বাড়ে।

দরকার জমিতে রকমারি ফসল বোনা এবং ধান জমিতে দু তিনটে ক'রে ফসল করা। তাতে জমির উর্বরাশক্তি বাড়বে। ধান চাষ বজায় রেখেও দ্বিতীয় ফসল হিসেবে ডালের চাষ করা যায়। এতে সার আর মেহনত দুই কম লাগে। ছোলা কলাইতে তো জমিতে সেচেরও দরকার হয় না। দ্বিতীয় ফসল হিসেবে রকমারি তৈলবীজ, অর্থাৎ তিল, তিসি, সর্ষে, মসিনারও চাষ হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের জমি জায়গা আখচাষের খুব উপযোগী। ভালভাবে চাষ করতে পারলে আখের ফলন এখনকার গড় ফলনের চেয়ে তিন চার গুণ বাড়াতে পারা যায়। সেচ এলাকায় আখের চাষ আরও বাড়ানো যেতে পারে। উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে পাটের ফলনও বাড়িয়ে দেড় গুণ করা যায়। পাটচাষের মুস্কিল এই যে, জমির উর্বরাশক্তি খেয়ে নেয়। পাটের চাষ ভাল হয় নামাল জমিতে—যেখানে বছর বছর পলি পড়ে। পাটের জমিতে সারও বেশী লাগে। অল্প কয়েক বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে পাট-বোনা জমির পরিমাণ এখনকার চেয়ে আরও সিকি ভাগ বাড়তে পারে।

কিন্তু এ সমস্ত কিছুর জন্যেই চাষীদের মধ্যে সাড়া জাগানো দরকার। যেখানে কৃষিজীবী লোকসংখ্যাব মধ্যে শতকরা ৪০ জনের নিজের বলতে জমি নেই, সেখানে ফসল বাড়াও বললেই বাড়ে না। যে জমিতে সে আজ আছে কাল নেই, খরচ করে খেটেখুটে সে-জমি বরাবরের মত ভাল করতে তার উৎসাহ হবে কেমন ক'রে? যাদের জমি আছে, তাদের জমিও এমন টুকরো টুকরো হয়ে এদিক ওদিকে ছড়ানো যে, তাতে চাষ ক'রে সুবিধে নেই। গতরে খেটে যে চাষ করে, তাকে জমি দিতে হবে। ছড়ানো ছিটানো জমিব বদলে একত্রে লাগাও জোত হিসেবে নতুনভাবে জমি বণ্টন ক'রতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গে যাদের জমি আছে, তাদেরও শতকরা ৬০ জনেরই জমি ১৫ বিঘের কম। বছরকার মামুলি চাষের খরচটাও তাদের হাতে থাকে না। ফলে, মোট চাষীর দশ আনা অংশকে চড়া সুদে মহাজনদের কাছ থেকে ধার করতে হয়। সরকারের সামান্য কৃষিঋণ গরীব চাষীর হাতে পৌঁছোয় না। ফলে, হয় দেনার দায়ে চাষীর জমি চলে যায় অচাষীর হাতে—নয় চাষ অভাবে জমি পড়ে থাকে। দৈনন্দিন প্রয়োজন মেটানোর জন্যে মাঠ থেকে ধান তুলতে না তুলতে চাষীকে যে দরে বেচে দিতে হয়, মহাজনদের কারসাজিতে পরে সেই ধানই তাকে বাজার থেকে ডবল দরে কিনতে হয়। ফলে, চাষীও তার ফসলের ন্যায্য দর পায় না আর দেশের

লোককেও অগ্নিমূল্যে বাজার থেকে কিনে খেতে হয়। সমবায় প্রথায় বিক্রির ব্যবস্থা করলে তবেই এই অরাজকতা দূর হতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের আয়তনের তুলনায় চাষের জমির অনুপাত যদিও অনেক বেশী, তাহলেও বিভিন্ন জেলায় একর প্রতি দুশো টাকা খরচ ক'রে এখনও অন্তত পাঁচ লক্ষ একর জমি আবাদযোগ্য করা যেতে পারে।

চাষের আরেকটি বড় দিক পশুপালন। দশ বছর আগেকার হিসেবে পশ্চিমবঙ্গে গৃহপালিত পশুর সংখ্যা প্রায় পৌনে দু কোটি। তার মধ্যে শতকরা ৭০ ভাগ গোধন। ভার বওয়ার ক্ষমতা বেশী ব'লে ইদানী গরুবলদের চেয়ে বেশী হারে মোষের সংখ্যা বাড়ছে। মোট গোধনের শতকরা ৪০ ভাগ লাগে লাঙল, গাড়ি আর ঘানি টানার কাজে। ধানের জমিতে বারবার লাঙল দিতে হয়, পরিমাণে ধানের জমি খুব বেশী, অথচ বলদগুলো তেমন শক্ত সমর্থ নয়—সেইজন্যে পশ্চিমবঙ্গে যা হালবলদ আছে তাতে প্রয়োজন মেটে না। নিজেদের হাল বলদ না থাকায় এ রাজ্যের সম্ভবত এক-তৃতীয়াংশেরও বেশী চাষীকে অন্যের হালবলদের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকতে হয়।

পুষ্টিকর খোরাকের অভাব, রোগভোগ এবং তার ওপর গরুগুলো ভাল জাতের গরু নয়—ফলে, এ রাজ্যে গড়ে গরুর দুধ খুবই কম হয়। পশ্চিমবঙ্গের গরু যা দুধ দেয়, দিল্লীর গরু তার সাড়ে তিনগুণ বেশী দুধ দেয়।

সংখ্যার দিক থেকে গরুমোষের পরই এ রাজ্যে ছাগল। কিন্তু মুড়িয়ে খেয়ে গাছপালা নষ্ট করে ব'লে ছাগলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী। পশম আর মাংস—দুটো কারণেই এ রাজ্যে এখন ভেড়ার চাষ ক্রমে বাড়ছে। কিন্তু পশম উৎকৃষ্ট তো নয়ই, পশমের পরিমাণও মোটেই বেশী নয়।

শুয়োরের চাষ ভাল হতে পারে উত্তরবঙ্গে।

পশ্চিমবঙ্গে চাষবাসের আনুষঙ্গিক হিসেবে পশু আর হাঁসমুরগি পালনের ব্যাপক ব্যবস্থা হলে দুধ, ডিম আর মাংসের অভাব যেমন বহু

পরিমাণে দূর হতে পারে—তেমনি চাষীদের রোজগার আর কর্মসংস্থান বাড়তে পারে। দুধ, চামড়া, হাড়—এসব দিয়ে ডেয়ারি, ট্যানারি, জুতো কারখানা, চর্মশিল্প, হাড্ডিকল গড়ে তোলা যাবে।

রেশমশিল্পে চাষেরই প্রাধান্য। গুটিপোকা পালনের জন্যে তুঁত-গাছ বসাতে হয়। এ রাজ্যের মোট তুঁতচাষের শতকরা ৮৪ ভাগ হয় মালদহে। প্রচলিত পদ্ধতিতে গুটিপোকা চাষে শতকরা ৭০ থেকে ৪৫ ভাগ ডিম নষ্ট হয়। 'চৌকি' প্রথায় গুটিপোকা বড় করতে পারলে পোকাগুলো রোগের হাত থেকে বাঁচে এবং খরচও ৩০ শতাংশ বাঁচে। দেখা গেছে, জাপানী গুটিপোকা আর দেশী গুটিপোকা এই দু জাতের মিশ্রণে ঢের ভাল রেশম উৎপন্ন হয়।

পশ্চিমবঙ্গের মোট আয়তনেব শতকরা ১৪ ভাগেরও কম অংশে বন। সারা ভারতের হিসেবে জনপ্রতি বনভূমি যেখানে গড়ে ৩০ কাঠার মত, সেখানে এ রাজ্যে জনপ্রতি বনভূমি মাত্র ৬ কাঠার মত। বনের আওতায় থাকলে মাটির ক্ষয় রোধ হয়, জল ধরা থাকে আর জলবায়ুতে সুস্থিরতা আসে। বন থেকে রকমারি সম্পদও মেলে। পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি যত বেড়েছে, বনও তত ধ্বংস হয়েছে। আবার বন যেমন ধ্বংস হয়েছে, তেমনি মাটিও ক্ষয়ে গিয়ে আবাদী জমিকে চাষের অযোগ্য ক'রে তুলেছে। ছ'টি জেলায় তো কোনো বনই নেই।

বন থেকে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যেব আয়ের পরিমাণ এবং এই বিভাগে কর্মে নিযুক্তের সংখ্যা খুব কম।

পশ্চিমবঙ্গে বনের পরিমাণ কম হলেও বনজ সম্পদের পরিমাণ কম নয়। রেলের স্লীপার, ঘরবাড়ির কাঠামো, খুঁটি, দেশলাইয়ের কাঠি, ভেনেস্তা, আসবাবপত্র, সুতোর নলি, খয়ের, প্যাকিং বাক্স, পেনসিল, ড্রইং বোর্ড, কাঠের খেলনা, জ্বালানি, কাঠের পুল ইত্যাদি বানাবার গাছ—এই সমস্ত জঙ্গল থেকে পাওয়া যায়।

এইসব বন থেকে বেত আর বাঁশ পাওয়া যায়। ওষুধের গাছ-

গাছগাছড়ার দিক থেকে উত্তরবঙ্গের বন বিশেষ সমৃদ্ধ। কাগজ, রং, তন্তুজাত বস্ত্র, নৌকো ইত্যাদি তৈরির শিল্পও গড়ে উঠতে পারে।

বাংলাদেশ ভাগ হওয়ায় ভাত আর মাছ দুদিক দিয়েই পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের ঘা খেতে হয়েছে। ঝিল বিল পুকুর নদীতে মিঠাজলের মাছ; নদীর খাঁড়ির মাছ আর সমুদ্রের মাছ—মাছের এই তিন আস্তানা। শুধু বাঁধা জলেই মাছের চাষ চলে। এ রাজ্যে মাছের চাষযোগ্য জলের যে এলাকা আছে, এ পর্যন্ত তার সিকি ভাগেরও কম এলাকায় উন্নতভাবে চাষের ব্যবস্থা হয়েছে। বহুক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা মাছ চাষের ক্ষেত্রে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। খাঁড়ি এলাকায় সংরক্ষিত বনভূমি হওয়ায়, সেখানেও মাছ ধরার নানা প্রতিবন্ধক। নদীতে বা সমুদ্রে ভালমত মাছ ধরতে হলে সেইমত উন্নতধরনের নৌকো, জাল এবং সাজসরঞ্জাম লাগে। জলাশয়গুলোতে উপযুক্ত মাছ ছাড়া এবং সার দেওয়া দরকার। মাছ ধরার পর সে মাছ বাজারে পৌঁছে দেবার জন্যে রাস্তাঘাট, যানবাহন, ঠাণ্ডাঘর দরকার। মাছের চারা যোগাড়, মাছের চাষ, মাছ ধরা, বাজারে পৌঁছানো আর বিক্রি, নৌকো তৈরি ইত্যাদি সবই যদি মৎস্যজীবীদের সমবায় গড়ে করা হয়, তাহলে পাইকার মহাজনদের জুলুমের হাত থেকে একদিকে মৎস্যজীবী এবং অন্যদিকে মাছের সাধারণ খরিদ্দার দুপক্ষই বাঁচতে পারে। তাহলে যারা মাছ ধরবে তারা যেমন ন্যায্য দাম পাবে, তেমনি যারা বাজারে কিনবে তারাও ন্যায্য দামে পাবে।

মাছ আশ্রয় ক'রে পশ্চিমবঙ্গে ব্যাপকভাবে শুঁটকী মাছ, মাছ থেকে তৈরী সার আর শার্ক লিভারের তেল সংক্রান্ত শিল্প এবং তার আনুষঙ্গিক নৌকো আর জাল তৈরির কারখানা এবং বরফকল গড়ে উঠতে পারে।

খনিজ উৎপাদনে সারা ভারতে বিহারের পরেই পশ্চিমবঙ্গের স্থান। খনিজ সম্পদ বলতে আছে কয়লা, ফায়ার-ক্লে, চুনাপাথর, চিনেমাটি, গিরিমাটি, উলফ্রাম, তামা, লোহা-পাথর, ম্যাঙ্গানিজ, ডলোমাইট,

আর্সেনিক, স্টিয়াটাইট, সিলিকা, বালি, বেলেপাথর, গ্রাফাইট, পেট্রোল ইত্যাদি। এখন পর্যন্ত শুধু প্রথম ছ'টিই ব্যবসায়িক ভিত্তিতে কমবেশী কাজে লাগানো হয়েছে।

ভারতের মোট কয়লা-সম্পদের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ পশ্চিমবঙ্গে। এ রাজ্যে মজুত কয়লার আনুমানিক পরিমাণ ১৩০০ কোটি টন। দার্জিলিঙে নিকৃষ্ট জাতের ১০ কোটি টন এবং বাঁকুড়া-বীরভূমে অল্প কিছু ছাড়া পুরো কয়লাই প্রায় রাণীগঞ্জ-বরাকরে।

কয়লা সাধারণত জ্বালানী হিসেবে কলকারখানা আর ঘরসংসারে ব্যবহার করা হয়। কোক-কয়লা তৈরির চুল্লী থেকে গ্যাস পাওয়া যায়। তাছাড়া উপজাত হিসেবে যে আলকাতরা, বেনজিন, অ্যামোনিয়া ইত্যাদি তৈরি হয়, তা দিয়ে নানা রকমের রং, সুগন্ধিদ্রব্য, কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম তন্তু, সার ইত্যাদির শিল্প গড়ে উঠতে পারে।

রাণীগঞ্জের কয়লাখনি এলাকায় মাটির ২০ ফুট নীচে ৪০ লক্ষ টন ফায়ার-ক্লে মজুত আছে। বিস্তৃতভাবে এবং আরও গভীরভাবে খুঁড়লে মজুতের পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে। এই মাটিতে হয় তাপসহ ফায়ার ব্রিক, ধাতু গলাবার মুচি, বোয়েম, বেসিন, স্যানিটারি ফিটিং ইত্যাদি।

পশ্চিমের জেলাগুলোতে, বিশেষত বীরভূমের মহম্মদবাজারে আর বাঁকুড়ার মেজিয়ায় কিছু কিছু পরিমাণে চিনেমাটি পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার ঝালদাতে প্রায় দেড় কোটি টন চুনাপাথর আর জলপাইগুড়ির বক্সা-ডুয়ার্স অঞ্চলে প্রচুর ডলোমাইট আছে। এ থেকে সিমেণ্ট তৈরি হতে পারে।

বিজলীবাতির ফিলামেণ্ট এবং বিশেষ এক রকমের ইস্পাত তৈরির পক্ষে প্রয়োজনীয় উলফ্রামের আকর আছে বাঁকুড়ার ঝিলিমিলিতে।

এ ছাড়া দার্জিলিঙে এবং বক্সা-ডুয়ার্স অঞ্চলে তামা মেলে। রাণীগঞ্জে নিরেস জাতের লোহাপাথর আছে প্রায় ৫০ কোটি টনের মত। মেদিনীপুরের বেলপাহাড়িতে আছে ম্যাঙ্গানিজ। দার্জিলিঙের এক

পাহাড় এলাকায় আর্সেনিকের সন্ধান পাওয়া গেছে। আর্সেনিক খুবই মূল্যবান খনিজ। ভারতের আর কোথাও পাওয়া যায় না। ওষুধপত্র ও কীটনাশক তৈরিতে এবং কিছু কিছু ধাতুশিল্পে এই খনিজ দরকার হয়। মেদিনীপুর জেলার বীনপুর থানায় কাঠখুরা, কাটুচুয়া আর গোহালবেড়িয়া মৌজায় সোপস্টোন আছে। এ দিয়ে স্পার্ক প্লাগ, ইনসুলেটার এবং এক ধরনের খেলনা তৈরি হয়। পুরুলিয়ার রঘুনাথপুরে এবং বাঁকুড়ার একাংশে কাঁচ তৈরি করার উপযোগী সাদা বালি ও বেলেপাথর পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গে এ যাবৎ কয়লা ছাড়া অন্যান্য খনিজের ওপর বিশেষভাবে কোনো নজরই দেওয়া হয় নি। এ রাজ্যে খুঁজলে একদিকে যেমন কয়লার নতুন নতুন ক্ষেত্র বার হতে পারে, তেমনি ফায়ার-ক্লে, চিনেমাটি চুনাপাথর আর ডলোমাইটের উৎপাদন বাড়তে পারে। তাছাড়া উলফ্রাম আর ম্যাঙ্গানিজ—এই দুটি দামী খনিজ কাজে লাগাতে পারলে পশ্চিমবঙ্গের সমৃদ্ধি বাড়বে।

পশ্চিমবঙ্গে শিল্পের মধ্যে সবচেয়ে বড় চটকল। মোট কারখানা-শ্রমিকের অর্ধেক চটকল মজুর। ভারতের বৈদেশিক মুদ্রার প্রায় এক-পঞ্চমাংশ আসে চটশিল্প থেকে।

কাপড়কল আছে ৫০টি-র ওপর। তাতে শ্রমিক সংখ্যা অর্ধলক্ষের কম। এ রাজ্যে কাপড়ের মোট চাহিদার মাত্র এক-পঞ্চমাংশ এইসব কাপড়কল থেকে পূরণ হয়।

ভারতের রপ্তানি-বাণিজ্যে পশ্চিমবঙ্গের চায়ের স্থান খুব বড়। এ রাজ্যের চা-বাগানের ছোট বড় কারখানাগুলোতে ৩০ হাজারের ওপর শ্রমিক কাজ করে। বাংলাদেশ ভাগ হওয়ায় চা পরিবহণের ক্ষেত্রে পথঘাট আর যানবাহনের গুরুতর সমস্যা দেখা দিয়েছে। এ ছাড়াও অযোগ্য পরিচালনা, দামের অস্থিরতা ইত্যাদির দরুন চা শিল্পের আশানুরূপ উন্নতি হচ্ছে না।

খাদ্য-ফসলজাত শিল্পে চালকলই প্রধান। ছোট বড় মাঝারি চালকলে ৪০ হাজারের ওপর শ্রমিক কাজ করে। সিকি ভাগ চালকল ২৪-পরগণায়, এক-পঞ্চমাংশ বীরভূমে এবং এক-পঞ্চমাংশ মেদিনীপুরে। তেলকলেব বেশির ভাগই কলকাতা-হাওড়ায়। ৬১টি তেলকলে শ্রমিক সংখ্যা আড়াই হাজারের কিছু বেশী। এ ছাড়া আছে ময়দাকল, রুটিবিস্কুট, মিঠাই জাতীয় কারখানা।

বনজ-নির্ভর শিল্পের মধ্যে প্রধান কাগজ, প্লাইউড আর দেশলাই। কাগজকল :৮টি, সবই হুগলিতে; শ্রমিক সংখ্যা ৩০ হাজার। ৩০টি প্লাইউডের শতকরা ৮০ ভাগই কলকাতায়; শ্রমিক সংখ্যা ১৬ হাজার। ৪টি দেশলাই কাবখানাব সবই কলকাতায়; শ্রমিক সংখ্যা প্রায় আড়াই হাজার।

খনিজ-নির্ভর শিল্প বলতে ধাতুশিল্পের কারখানাই প্রধান। সংলগ্ন বিহার-উড়িষ্যার উৎকৃষ্ট খনিজ আর পশ্চিমবঙ্গেব উৎকৃষ্ট কয়লা—এই দুয়ে মিলে বার্ণপুর-কুলটিতে যে দুটি লোহা-ইস্পাতের কারখানা গড়ে উঠেছিল তারই জোরে হুগলি এলাকায় রকমারি ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানার প্রসার হয়। রাজ্যের মোট শিল্প-শ্রমিকের এক-পঞ্চমাংশ ধাতুশিল্পের শ্রমিক। সারা ভারতের এক-চতুর্থাংশ ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা এই পশ্চিমবঙ্গে। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় গত কয়েক বছরে আরও যোগ হয়েছে দুর্গাপুরে ইস্পাত কারখানা আর খনিশিল্পের যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা। রূপনারায়ণপুরে কেব্‌ল্‌ তৈরির কারখানা, চিত্তরঞ্জনে রেলইঞ্জিন তৈরির কারখানা আর কলকাতায় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি তৈরির কারখানা। এ ছাড়া এ রাজ্যে আছে সারা ভারতের এক-চতুর্থাংশ কাঁচ আর সিরামিক কারখানা।

এ রাজ্যের শিল্প শ্রমিকদের ৫ শতাংশ রাসায়নিক শিল্পে কাজ করে।

পশ্চিমবঙ্গে ছোট ছোট কলকারখানার মধ্যে সিকি ভাগই কৃষিজ-নির্ভর। তার অধিকাংশই ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান,

হাওড়া, হুগলী আর দার্জিলিং জেলায়। কৃষিজ-নির্ভর ছোট শিল্পের মধ্যে প্রধান চালকল, তেলকল আর চা সংক্রান্ত কারখানা। ২৪-পরগণায় এ ছাড়া আছে রুটিবিস্কুট, কৌটোজাত ফল, কৌটোজাত খাবার, দড়ি আর বিড়ির কারখানা। বনজ-নির্ভর ছোট কারখানার মধ্যে প্যাকিং বাক্সের কারখানা, কাঠগোলা, করাতকল, আসবাব তৈরির কারখানা ইত্যাদি। পশুসম্পদ-নির্ভর ছোট ৬২টি কারখানার মধ্যে ৫২টিই ট্যানারিং। বাকিগুলোতে হয় চামড়ার জুতো, সুটকেস, আঠা আর দুগ্ধজাত জিনিস। খনিজ-নির্ভর ছোট শিল্পক্ষেত্রে ইট, টালি, সুরকি; পেট্রোলিয়াম ও কয়লাজাত ফেনল, ন্যাপথলিনের গুলি আর আলকাতরা; কাঁচের চুড়ি, পুঁতি, সাংসারিক ও ল্যাবোরেটারির সামগ্রী।

স্বল্পায়তন শিল্পের শতকরা ৩৬ ভাগ জুড়ে রয়েছে ছোট ছোট ইঞ্জিনীয়ারিং কারখানা। তার ৪৪ শতাংশ হাওড়ায়, ·৮·৫ শতাংশ বর্ধমানে, ১·৩ শতাংশ দার্জিলিঙে এবং ১২ শতাংশ জলপাইগুড়িতে। বাকি ১৫ শতাংশ হুগলি, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, মালদহ আর বীরভূমে। এইসব কারখানার শতকরা ৬০ ভাগ তৈরি করে যন্ত্রাংশ; এরা বড় বড় কারখানার মুখাপেক্ষী; প্রায় ৩৫ ভাগ তৈরি করে শিল্পদ্রব্য—একদিকে কৃষিব যন্ত্রপাতি, রাজমিস্ত্রির কাজের জিনিস, নল, তার, ইলেকট্রিকের সরঞ্জাম, ইনসুলেটেড তার আর কেব্‌ল্‌, বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, নাট, বল্টু, পাইপ ফিটিং এবং অন্যদিকে আখ মাড়াই, বিচালি কাটা, ধান ছাঁটাই, ডাল ভাঙা ইত্যাদির কল।

ছোট ছোট কারখানার মধ্যে ৫·৭ শতাংশ রাসায়নিক-নির্ভর। এর অধিকাংশই ২৪-পরগণা, হাওড়া, কলকাতা আর হুগলিতে। এইসব কারাখানায় হয় ওষুধপত্র, রং, সাবান, মৌলিক রাসায়নিক এবং রবারের ও প্ল্যাস্টিকের জিনিস। কিছু কিছু কারখানায় হয় কালি, রবারের জুতো, কৃত্রিম সার এবং স্টোরেজ ব্যাটারি জোড়া দেওয়ার কাজ।

বস্ত্র শিল্পের ছোট ছোট কারখানার অর্ধেকই গেঞ্জীকল। বাকি-

গুলো সুতোকল, জুট প্রেস, কাপড়কল আর রেশমকল।

বাকি রকমারি ছোট কারখানার মধ্যে পড়ে ছাপাখানা, প্যাকিং কারখানা, কোল্ড-স্টোরেজ, বরফকল, গ্যাস তৈরি ও বিক্রির নানান প্রতিষ্ঠান।

গঙ্গার ওপর ফরাক্কায় বাঁধ আর ব্রিজ হলে উত্তরবঙ্গের সঙ্গে বাকি পশ্চিমবঙ্গের বিচ্ছিন্নতা অনেকখানি কাটবে, কলকাতা বন্দরেব উন্নতি হবে। হলদিয়ায় বন্দর হলে মেদিনীপুর, বাঁকুড়া আর পুরুলিয়ায় শিল্পোন্নতির পথ খুলে যাবে। হিমালয়ের খরস্রোতা নদীগুলোকে বেঁধে বন্যার যেমন আসান হবে, তেমনি আলো জ্বালাবার আর কল চালাবার বিদ্যুৎশক্তি জুটবে। কিন্তু জল মাটি হাওয়ায় এত সম্পদ থেকেও দেশের মানুষ কেন আজও বুভুক্ষু রিক্ত, কাজ করবাব হাত থেকেও লোকে কেন আজও বেকার, স্বাধীন হয়েও কেন আজও আমবা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারছি না, আজ বড়লোক কেন আবও বড়লোক হচ্ছে আব গরিব আরও গরিব—চোখ খুলে তাকালেই সে উত্তর আমাদের হাতে এসে যাবে।

ভারত বাদ দিয়ে পশ্চিমবঙ্গ নয়। সারা ভারতের সমস্যা এক, সমাধানেব পথও এক। ব্যক্তিগত লাভের দিকে তাকিয়ে উৎপাদিকা শক্তির বন্ধন মোচন করাই সমাধানের একমাত্র রাস্তা। মুনাফা নয় মানুষের ভোগ—উৎপাদনের এই হবে একমাত্র লক্ষ্য। কায়েমী স্বার্থেব জারিজুরি ভেঙে দেশকে নতুন ভাবে ঢেলে সাজার জন্যে চাই সঙ্ঘবদ্ধ সংকল্পবদ্ধ পরাক্রান্ত জনশক্তি—যারা শুধু ভারতের চিরায়ত সভ্যতা-সংস্কৃতির উত্তরসাধক নয়, যারা হবে বিশ্বমানবের জয়যাত্রার শরিক।

সারা পৃথিবী জুড়ে আজ প্রকাণ্ড বন্ধনদশা ঘুচিয়ে মানুষের অগ্রগতির পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে। অন্যদিকে ধ্বংস আর মৃত্যুর বন্যায় তাকে ডুবিয়ে দেবার জন্যে একদল সশস্ত্র হাত উঁচিয়ে আছে।

আমাদের আদর্শ, সংকল্প আর সংগঠন যদি দিকভুল না করে,

তাহলে এদেশের অবারিত সম্পদ আর বন্ধনমুক্ত জনবল এখানকার মাটিতে সোনা ফলাবে।

কাঁধে কাঁধ আর হাতে হাত লাগিয়ে চোখ খোলা রেখে এ মাটিতে সেই বাঞ্ছিত পালাবদল অচিরে আমাদের ঘটিয়ে তুলতে হবে।

আমরা যদি সকলে মিলে ইচ্ছে করি, তাহলে এই মুহূর্তেই তা সম্ভব।

বাংলা



এপার-বাংলা

সামনে আড়াই-তিন কাঠা প'ড়ো জমির সবটাই এখন চোর-কাঁটার দখলে। তারমধ্যে যেন পা তুলে বসে আছে রোয়াকে ওঠবার আখাম্বা সিঁড়িটা। ডানদিকে ছ্যাৎলা-ধরা পাঁচিলের গায়ে খিড়কির দরজা। ভেতরে পাতকুয়োর ধারে একটা ধিঙ্গি পেঁপেগাছ যেন ডিং মেরে দাঁড়িয়ে আছে। চুনকাম অভাবে দেয়ালগুলোর কেলেকিষ্টি চেহারা। ন্যাড়া ছাদের ফাটাফুটো থেকে মাথা চাড়া দিচ্ছে সবুজ সবুজ দস্যি চারাগাছ। আর আলসের সঙ্গে লাগানো সেই যে সেই পোড়ামাটির জলচুঙি—যেখান দিয়ে মুষলধারে জল পড়ত আমাদের 'যা বৃষ্টি ধরে যা'র নিরবচ্ছিন্ন ছন্দে।

বাড়িটা দেখেই চিনতে পারলাম। আমার পিসেমশাই থাকতেন। ছেলেবেলায় বার দুই এসেছি।

মাথার ওপর তাকালাম। সেই বিশাল রেন্টি গাছগুলো আজও আকাশটাকে জটায় বেঁধে রেখেছে। অন্ধকার রাত্তিরে গাছগুলোকে কি রকম দৈত্যের মত দেখাত।

সন্ধ্যেগুলোর কথা মনে পড়ে। কোথায় ছিল তখন ইলেক্ট্রিক, কোথায় কী! সারা বাড়িতে শুধু একটা-দুটো লণ্ঠন ঘর-উঠোন করত।

রান্নাঘরের পেছনে কচুবনে চোখ পিট্ পিট্ করত জোনাকির আলো। নিমগাছে থাকতেন ব্রহ্মদত্যি।

আর বাইরের ঘরে বসে লাল খেরোবাঁধানো খাতায় পিসেমশাই তাঁর ডায়রি লিখতেন। তাঁর হাতের কাছে থাকত একটা চ্যাপ্টা গোল কৌটো। তার মধ্যে ছোট্ট ছোট্ট আফিঙের বড়ি। কৌটোটা খুললেই ভক্ ক'রে নাকে এসে লাগত একটা ঝাঁঝালো গন্ধ। রাত্তির বেলায় যতক্ষণ না তিনি খেতে আসতেন, সারা বাড়ি যেন কান খাড়া করে তাঁর কলমের খশ্ খশ্ আওয়াজ শুনত।

ডায়রি লেখা কাকে বলে আমরা জানতাম না। শুধু এইটুকু বুঝতে পারতাম, পিসেমশাই ডায়রি লিখতে বসলেই বাড়িটা কেমন যেন হয়ে যায়। সবাই পা টিপে টিপে হাঁটে, গলা নীচু করে কথা বলে। যারা সারাদিন আমাদের দাঁতে দাঁতে রাখে, সন্ধ্যে হলেই তারা একেবারে মাটির মানুষ। বেশ বোঝা যেত, যে যা নয়--এই সময়টুকুর মধ্যে সে তাই হবার চেষ্টা করছে। বড়দের চাউনি দেখে মনে হত বাইরের ঘরে নিশ্চয় কিছু ঘটছে। পর্দাটা সরিয়ে বার বার উঁকি দিয়েও তেমন কিছু কই নজরে পড়ত না।

আস্তে আস্তে রহস্যটা আমাদের কাছে পরিষ্কার হল। বুঝলাম আসলে পিসেমশায়ের ডায়রির জাদুতেই সন্ধ্যেবেলায় অমন করে বাড়িটার ভোল বদলে যায়। কবে কে যেন একবার চুরি করে পিসে-মশাইয়ের ডায়রিটা পড়েছিল। এ-বাড়ির লোকদের কার কী দোষগুণ, সব নাকি ডায়রিতে লেখা হয়ে যায়। শুনে অবধি সবাই খুব সাবধান। তবে দিনের বেলায় পাঁচ কাজে অত কি ছাই কারো মনে থাকে? সারাদিন বকুনি, ঠ্যাঙানির পর যেই সন্ধ্যে হয়, অমনি সকলের টনক নড়ে। বড়রা আমাদের যতটা অবোধ ভাবত, সত্যিই তো আর আমরা ততটা অবোধ ছিলাম না। কিসে কী হয়, বলতে না পারলেও বুঝতাম সবই। আমরাও তাই শাসনহীন সন্ধ্যেটার জন্যে সারাদিনের বাছা বাছা দুষ্টুমিগুলো তুলে রাখতাম।

এখানকার বাস উঠিয়ে চলে যাবার পর পিসেমশাই বেশীদিন বাঁচেন নি। তারপর থেকে তাঁর ডায়রিটার কথাও কখনও আর শোনা যায় নি। একেক সময় মনে হয়, ডায়রিটা কি সত্যিই ছিল? নাকি গোটা ব্যাপারটাই বাড়ির লোকদের দুরস্ত করবার একটা উপায়!

হঠাৎ খেয়াল হল পরের বাড়ির দিকে হাঁ করে তাকিয়ে আছি। দরকার নেই—অনেকে অনেক কিছু ভাবতে পারে। পিচ্-ঢালা রাস্তাটা এক ছুটে যেখানে ইছামতীর গায়ে গিয়ে মিশেছে, সেইদিকে তাড়াতাড়ি পা চালালাম।

বনগাঁ যে আর সে-বনগাঁ নেই, স্টেশন থেকে বেরোতে না বেরোতেই টের পেয়েছিলাম। গোটা চত্বরটা জুড়ে কিলবিল কিলবিল করছে লাইনবন্দী সাইকেল-রিক্সা। যেদিকেই ঘাড় ফেরাই, শুধু প্যাক প্যাক আওয়াজ। একদল পাল্লা দিয়ে হাঁকছে: বর্ডার! বর্ডার!

কথাটা ধরতে একটু দেরি হল।

বর্ডার! তার মানে, সীমান্তে এসেছি। হঠাৎ মনটার মধ্যে কেমন যেন করে উঠল। এই অবধি তাহলে আমাদের আপন। কিন্তু তারপর? তারপর কি পর হয়ে গেছে?

স্টেশনের রাস্তাটা দেখে চেনা যায় না। সামনে ফুটবলের মাঠটা গেল কোথায়? আর সেই শিমুলগাছ? কালবোশেখির ঝড় উঠলে পট পট আওয়াজে তুলোর পাখা মেলে বীজ ছড়ানোর দৃশ্য? আকাশ থেকে বরফ পড়তে দেখলে আজও সে দৃশ্য মনে পড়ে যায়! রাস্তার দুপাশে রুজু রুজু দোকান। যতদূর দেখা যায় কোথাও এতটুকু ফাঁক নেই। ছেলেবেলার যে ছবিটা মনে মনে এঁকে এনেছিলাম, সেটা মিলিয়ে নেবার কোনো উপায় নেই। সামনে দোকানঘরগুলো ওপাশের পুরো ছবিটা আড়াল করে রেখেছে।

একটু এগিয়ে গিয়ে ডানদিকে মোড় নিয়েছে শহরের রাস্তা। স্টেশন থেকে বেরিয়ে এসে খানিকটা ফাঁকা। তারপর আবার কাতারে

কাতারে দোকান। চা, খাবার, বিড়ি, মনিহারি। কাঠগোলা, চিরুনিকল, সাইকেল-সারাই।

আর রেন্টি গাছের নীচে মুক্ত আলো-হাওয়ায় মজার এক চুলছাঁটাইয়ের সেলুন। গাছের গায়ে টাঙানো আয়না। বাঁশের সঙ্গে লাগানো প্রায় রণ-পায় দাঁড়ানো উঁচু চেয়ার। সরু মাচায় সাবান, বুরুশ, ক্লিপ, চিরুনি।

এদিকে ওদিকে নতুন নতুন বাড়ি। যত না বাড়ি, তার চেয়ে বেশী দোকান। কোনোটা কাঠের, কোনোটা ছিটেবেড়ার।

বিশ বছর আগে যা ছিল, শহরে লোক এখন তার তিনগুণ। রাস্তায় সভয়ে সরে দাঁড়াতে দাঁড়াতে মনে হয় যত না লোক, তার চেয়ে বেশী সাইকেল-রিক্সা। এখন আর সেই আপন মনে গান গেয়ে গেয়ে রাস্তা হাঁটা সম্ভবই নয়। একটু তালভোলা হয়েছ কি গেছ।

বাঁধানো সড়কটা সামনে বরাবর ছুটে গিয়ে ইছামতীর জলে যেখানে কাটা পড়েছে, সেখানে সার-বাঁধা নৌকোর ওপর আগেকার সেই কাঠের পুল। ছেলেবেলায় আমরা তার ওপর থেকে ঝপাং ক'রে ঝাঁপ দিতাম জলে। সে জলের তলা পর্যন্ত দেখা যেত। ইছামতীর বুক এখন কচুরিপানায় ভারী হয়ে আছে। পাড় বরাবর সার সার আড়তগুলোর আগেকার সে দবদবা আর নেই।

জলে নেমে দুপাশের উঁচু শানবাঁধানো পাড়গুলো দেখতে বেশ লাগত। কুলিদের হাঁকডাকে আর পায়ের শব্দে গম গম করত বন্দরের সীমাসরহদ্দ। চালানী নৌকোগুলো নোঙর করা থাকত এপারে ওপারে।

সন্ধ্যেবেলা পুলের ওপর উঠে থমকে দাঁড়ালাম। এক জায়গায় এক দঙ্গল লোক ভিড় করে কী যেন দেখছে। জিজ্ঞেস করে জানলাম, সওয়ারীসুদ্ধ একটা সাইকেল-রিক্সা জলে উল্টে পড়েছিল। মানুষগুলো আগেই উঠেছে। রিক্সাটাকে এখন টেনে তোলা হচ্ছে। তাকিয়ে দেখলাম পুলটার দুপাশই খোলা। আগে লোহার শেকল লাগানো থাকত। শেকলগুলো নাকি কবে চুরি হয়ে গেছে। তারপর আর লাগানোই হয় নি।

জ্যোৎস্না রাত ছিল। ওপারের রাস্তা ধরে হাঁটতে লাগলাম। কতটা গিয়েছি জানি না। গাছের তলায় একটা চায়ের দোকান। চা খেতে বসে গেলাম।

জনকয়েক গাঁয়ের ছোকরা বসে জটলা করছিল। কথার আড়ে বুঝলাম শখের যাত্রা করে। ওর মধ্যে জনকয়েক দেড়-দুক্রোশ রাস্তা ভেঙে এসেছে।

একজনের সঙ্গে ভাব হয়ে গেল। যাত্রায় ফিমেল পার্ট করে। তার বাড়িটা বেশী দূরে নয়। কথা বলতে বলতে তার বাড়িতে নিয়ে গেল। একে রাত্তির, তায় অজানা অচেনা জায়গা। ডাইনে বাঁয়ে ঘুরে কোথা দিয়ে কিভাবে যে গেলাম, এখন আর তার দিকনিশানাটা ঠিক মনে নেই।

দাওয়ায় বসে কথা হল। কৃষ্ণপক্ষেব রাত্তির। একটু তফাতে টিম টিম করছে জং-ধরা একটা লণ্ঠন।

ছেলেটি ব্যাবসা করে। না, তার দোকানপাট কিছু নেই। ধান নয়, পাট নয়। একটু আজব ধরনেব ব্যাবসা। তার বাপ-চোদ্দপুরুষ সে ব্যাবসা কখনও দেখে নি। যারা বর্ডার পেরিয়ে আসে, তাদের পাকিস্তানী টাকার বদলে দেয় ভারতীয় টাকা।

কাজটা তো বে-আইনী!

আজ্ঞে হ্যাঁ। কিন্তু কী কবব বলুন? অন্য কোন্ কাজই বা পাচ্ছি কোথায়?

যে দিকটা বনজঙ্গলে ঢাকা সেদিক থেকে একসঙ্গে অনেকগুলো পায়ের শব্দ ভেসে এল। তারপরই মাথায় বড় বড় মোট নিয়ে একদল ছায়ামূর্তি পায়ে-চলা সরু রাস্তাটা দিয়ে নেমে গেল।

ছেলেটি রহস্য করে বলল, কিছু বুঝলেন?

না।

তারপর সে গলা নামিয়ে বলল, সুপুরি।

খানিকক্ষণ পর পরই একবার করে পায়ের শব্দ ভেসে আসতে লাগল। তারপর একেক দল ছায়ামূর্তি।

সুপুরি আসছে পাকিস্তান থেকে চোরাপথে। মাঠ-ঘাট পেরিয়ে, ঝোপঝাড় আর পাটক্ষেতের সুঁড়িপথ বেয়ে।

উঠব উঠব করছি। হঠাৎ টর্চের আলো এসে পড়ল রাস্তায়।

ছেলেটি বলল, লাইনম্যান ফিরে আসছে। তার মানে, এ রাস্তায় সুপুরি আসা আজকের মত এখানেই শেষ।

লাইনম্যান বলতে, যে চোরাচালানের গ্যাংটাকে রাস্তাঘাট দেখিয়ে সাম্‌লে সুম্‌লে নিয়ে যায়।

ঠিক হল পরদিন সকালে বর্ডার দেখ্‌তে যাব।

যে ছেলেটি রিক্সা চালাচ্ছিল তার নাম জিজ্ঞেস করলাম। জোসেফ, ম্যাথু, ডেভিড, বেনেডিক্ট গোছের একটা নাম বলল। নামের শেষে দাস, মণ্ডল, না পাড়ুই কী যেন।

দেশী খৃস্টান। আবার রিফিউজিও বটে। মাদারীপুরের ওদিকে কোথায় থাকত। একুশ-বাইশ বছর বয়েস। ইস্কুলে পড়েছে। তবে বেশীদূর নয়। অবস্থায় কুলোয় নি।

অন্য একটা রিক্সা পাশ দিয়ে যেতে যেতে জিজ্ঞেস করল, কে যায়? হাংরি নাকি?

না হে, না।

প্রশ্নটা যে আমাকেই লক্ষ্য ক'রে, তাতে সন্দেহ ছিল না। কিন্তু 'হাংরি' কথাটা অত্যন্ত আপত্তিকর ঠেকল।

(এখানে ব'লে রাখা ভাল, বাংলা সাহিত্যে ক্ষুৎকাতর সম্প্রদায় তখনও মাথা চাড়া দেয় নি। কাজেই এ-হাংরি সে-হাংরি নয়।)

যে সঙ্গে যাচ্ছিল, আমার মনের ভাব বুঝে তাড়াতাড়ি ব্যাপারটা সে পরিষ্কার করে দিল। 'হাংরি' মানে যারা বিনা পাসপোর্টে যায় আসে। এগুলো হচ্ছে সাঁট-ইশারার ভাষা। এ সান্ধ্য ভাষা যারা বোঝবার তারা বোঝে। আগে বলত 'হাঙ্গি-মাঙ্গি'। কিছুদিন চলেছিল 'উইদাউট'। এখন আবার নতুন একটা শব্দ উঠতে আরম্ভ করেছে—'কেস'। 'কেস'ও যে কতদিন টিঁকবে বলা শক্ত। মনে হয়, ভেতরের কথা যখন বাইরে

জানাজানি হয়ে যায়, তখন তাড়াতাড়ি সেটা বদলে ফেলা হয়। শব্দ আর অর্থের অনিত্য সম্বন্ধের যুক্তিটা অন্তত এক্ষেত্রে অকাট্য।

দেখতে দেখতে আমরা হরিদাসপুর ছাড়িয়ে গেলাম। পথে পড়ল ছোট্ট একটা নদী। জলে পাট আছড়াচ্ছে একদল চাষী।

সামনে দিয়ে অনবরত যাত্রী আসছে। সঙ্গে পোঁটলাপুঁটলি আর একটা করে মাদুর। কখনও কখনও মাদুর আসছে গোছা গোছা। হাংরি—তাতে সন্দেহ নেই।

ডানদিকে পেঁটরাপোলের চেকপোস্ট। সারি সারি ঘর। ঠিক ছিল রিফিউজিদের ক্যাম্প হবে। পরে আর দরকার লাগে নি। বেশির ভাগ ঘর এখন খালি পড়ে আছে।

রাস্তায় বিস্তর রিক্সা দাঁড়িয়ে। যাত্রীদের নিয়ে যাবে।

জয়ন্তীপুরে গিয়ে রিক্সা থেকে নামলাম। চা-জলখাবারের অনেক-গুলো দোকান। লোকজন আছে কিছু। অনেকেরই চোখ ঘুরছে। এখানে সেখানে উর্দির উঁকিঝুঁকি, খাঁকির ছিটেফোঁটা।

আমি না-'হাংরি', না-সন্দেহভাজন লোক—চোখে চোখে সে ইশারা আগে থেকেই হয়ে গিয়েছিল। সুতরাং অতিথিসংকারে কোনো ত্রুটি হল না। যে খাওয়াল, তার বুকপকেটে একতাড়া নোট। নোটগুলো একটু অচেনা অচেনা ঠেকল।

ও হরি, এও নাকি বর্ডার নয়। আরও পোয়াটেক গেলে তবে বর্ডার দেখা যাবে।

গেলাম। রাস্তার ধারে গাছের একটা গুঁড়ি দাঁড়িয়ে। মুণ্ডু-উড়ে-যাওয়া বিশাল গাছটা কবে নাকি বাজির আগুনে পুড়ে গিয়েছিল। গাছটার ধারে-কাছে অনেকগুলো দোকান। চা আর পানবিড়ির। ডানদিকে মাঠের মধ্যে ফাঁড়ি।

হাত কয়েক তফাতে আড় হয়ে আছে ফটক। এপারে টিনের ফলকে লেখা: 'গবর্নমেন্ট অব ইণ্ডিয়া'। ফটকের পাশে ত্রিবর্ণরঞ্জিত

অনতিউচ্চ পতাকা। বাঁয়ে আটচালা ঘর, ডানদিকে একতলা পাকা দালানকোঠা। শুল্ক বিভাগের আপিস।

ফটকের ওপারে পঞ্চাশ গজ ফাঁকা রাস্তা। তারপর পাকিস্তানের ফটক। সবুজ নিশান উড়ছে। দূরে রাস্তা পারাপার করছে লুঙি-পরা মানুষ। দেখতে একদম আমাদের মত। যেন এদিকের লোকই ওদিকে গিয়ে আছে। ওপারে পাহারায় মোতায়েন পেশোয়ারী সেপাই।

মাঝখানে ফাঁকা রাস্তাটুকু কারো নয়। না ভারতের, না পাকিস্তানের। মালপত্র বয়ে দিচ্ছে এপার-ওপারের মার্কামারা 'আন্ত-র্জাতিক' কুলি।

বর্ডার বলতেই যে আতঙ্ক হয়, খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে বুঝলাম সে আতঙ্কের কোনো চিহ্ন অন্তত এখানে নেই। ওপারের লোকে পকেটে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে এপারে আসছে আবার এপারের লোকে পকেটে হাত দিয়ে হাসতে হাসতে ওপারে চলে যাচ্ছে। মোটের ওপব বেশ একটা উপুড়হস্ত দিলদরাজ অন্তরঙ্গ আবহাওয়া।

সঙ্গের ছেলেটি বলল, আপনি এই চায়ের দোকানে একটু বসুন। আমি ততক্ষণে একটু কাজ সেরে নিই।

ভারি ভয় হল। অজানা অচেনা জায়গা। শেষকালে কোনো গোলমাল টোলমালে পড়ব না তো?

দোকানে ধুতিপাঞ্জাবী-পরা একটি লোকের সঙ্গে আলাপ হল। তারও চোখ ঘুরছিল। জিজ্ঞেস করল, বর্ডার দেখতে এসেছেন বুঝি? কলকাতা থেকে তো নিত্যি লোক আসে দেখতে। রবিবারে এলে দেখতেন সাহেবমেমদের কী ভিড়। তবে বর্ডার তো একটা নয়। এ তো দেখছেন রাস্তা। তাছাড়া আছে পাটক্ষেত, ধানক্ষেত, নদীর এপার-ওপার। পাসপোর্টও তো একটা নয়। 'ধাক্কা-পাসপোর্ট,' 'পাটক্ষেত-পাসপোর্ট'—এমনি কত রকমের। সে অত বুঝবেন না।

কী করে কী হয় সত্যি বোঝা শক্ত। সেপাইদের নাকের নীচে

কোথায় নাকি কোন্ বেওয়ারিশ জায়গা আছে, সেখানে দুপক্ষের সর্দারদের বৈঠক বসে, দরদস্তুর হয়, বোঝাপড়া হয়।

ছেলেটি এসে পড়ায় উঠে পড়তে হল। যেতে যেতে বলল : চলুন, এর চেয়েও এক মজার জায়গা থেকে আপনাকে ঘুরিয়ে আনি।

আমবাগানের ভেতর দিয়ে রাস্তা। অনেকদিন পব দিনদুপুরে ঝিঁঝিঁর ডাক শুনছি। রেললাইন পেরোতে হল। দূরে পেট্রাপোল স্টেশন। আশশেওড়ার বন পেরিয়ে খানকয়েক টিনের ঘর। দুটো একটা ধানের গোলা। উঠোনে বাঁশের মাচায় এলোকেশী হয়ে পাট শুকোচ্ছে।

আরও এগিয়ে মেস্তার বন। যেতে যেতে আরও দুজন সঙ্গী জুটে গেল। সেইসঙ্গে গোটা দুই বৈঠা।

সামনে বিরাট বাঁওড়। ঘাটে নৌকো বাঁধা। দেখে মনে হল এজমালি। চোখকান বুঁজে উঠে পড়লাম নৌকায়। মাথার ওপর চন্‌চনে রোদ্দুর।

বাঁওড়ের আকণ্ঠ শ্যাওলা ঠেলে মাঝরাস্তায় পৌঁছুবার পর পেছন থেকে কে একজন বলল : ঐ যে দেখছেন কলাগাছ, ওখান থেকে পাকিস্তান আরম্ভ। ডানদিকে ঘুরে গেছে বাঁওড়ের জল। ডাইনে ডাঙা বরাবর পাকিস্তানের গাঁ। নৌকো ডানদিকে মোড় ঘুরল।

হাঁ-হাঁ করে উঠলাম। শেষে কি জেলে যাবো? ডিগবয়ের ওস্তাদজী অভয় দিলেন। বললেন : ভয় নেই ; জল আমাদের, ডাঙা ওদের।

আমার তখন 'পড়েছি যবনেব হাতে' গোছের অবস্থা। অন্যমনস্ক হবার জন্যে অগত্যা ওস্তাদজীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দিলাম। ওস্তাদজী বাঙালী। বিলক্ষণ বাঙালী। যাত্রাদলের মোশান-মাস্টার। আগে ডিগবয়ের তেলের খনিতে কাজ করতেন। কেন চাকরি যায় ঠিক ভাঙতে চাইলেন না। তবে দেখলেই বোঝা যায় এলেম আছে।

যা ভয় করেছিলাম ঠিক তাই। তাকিয়ে দেখি নৌকো ডাঙায়

ভিড়ছে। কী মতলব এদের ? পাকিস্তানীদের হাতে আমাকে ধরিয়ে দিতে চায় নাকি ? লোকগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে কিন্তু তা মনে হল না। যা থাকে কুলে-কপালে ব'লে ওদের দেখাদেখি লাফিয়ে ডাঙায় উঠলাম। এদিক ওদিক তাকিয়ে মনে হল বারো-তেরো ঘর লোকের বাস। ছোট্ট গাঁ।

আস্তে আস্তে সব পরিষ্কার হল। এ গাঁয়ের এক-দু একর জমি পড়েছে ভারতীয় ইউনিয়নের ভাগে। তিন-চার ঘর লোক নিয়ে ছোট্ট ছিটমহল। ডাঙা দিয়ে যেদিকে যাবে সেদিকেই পাকিস্তান। ভারতীয় ইউনিয়নের সঙ্গে একমাত্র যোগাযোগ জলপথে।

শুনে-টুনে সাহস ফিরে এসেছিল। একা একাই ঘুরছিলাম। উঠোনে-উঠোনে কালো কুচকুচে জাল শুকোচ্ছে। দাওয়ার ওপর ডাঁই-করা মেস্তা। একজনদের ভিটে পড়েছে ভারতীয় এলাকায়, উঠোনের সঙ্গে লাগানো ধানজমিটা পাকিস্তানে।

ডান পায়ের জুতোটায় কাদা লেগে গিয়েছিল। সামনের পা-টা বাড়িয়ে আমগাছের গোড়ায় মুছে নিচ্ছিলাম। সঙ্গের ছেলেটি পেছন থেকে ডাকাত-পড়ার মত করে চেঁচিয়ে উঠল : ও মশাই, করেছেন কী !

বিরক্ত হয়ে পেছনদিকে ফিরে তাকালাম।

খুঁটি দেখছেন না ? আমগাছটা যে পাকিস্তানে !

বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত তাড়াতাড়ি ডান পা-টা পাকিস্তান থেকে সরিয়ে আনলাম। চারদিকে ভাল ক'রে দেখে নিলাম। ভিন্‌দেশী কেউ আবার দেখে ফেলে নি তো !

বর্ডার দেখবার শখ মিটেছে। তারপর পড়ি-মরি ক'রে সটান বনগাঁয়।

সেদিনই সন্ধ্যেবেলা বনগাঁর শহর-বাজারে খানিকটা ঘোরা গেল চায়ের দোকানে নানা রকম গালগল্প। বর্ডারে নাকি পয়সার হরির লুট। রম্‌রমে ব্যাবসা। আসছে সুপুরি, যাচ্ছে বিড়ির পাতা, খাটছে লাখ লাখ টাকা। বাইরের লোকই বেশিটা লুটে নিয়ে যাচ্ছে। এ

কারবারের দুধসর জনকয়েকের ভাগ্যেই জোটে। নইলে এইটুকু ছোট্ট শহরে যক্ষ্মারোগীর তালিকায় কম ক'রে পাঁচ শো লোক নাম লেখাবেই বা কেন ?

একজনের সঙ্গে আলাপ হল। সোনা-রুপোর দোকানে কাজ করে। বলল, দশ-বারো বছর আগেও এ শহরে সেকরা-পোদ্দারের দোকান দু-পাঁচটার বেশী ছিল না। দেশ ভাগাভাগির পর দোকানের এখন ছড়াছড়ি। যত সোনা কলকাতা থেকে আসে, তার দেড়া সোনা কলকাতায় যায়। লোকে খরিদ করে কম, বেচে বেশী। দোকানে কারিগরের সংখ্যাও কমেছে। গহনা গড়াবার সামর্থ্য আছে ক'জনের ?

কাঁসাপিতলের দোকানেরও সেই হাল। কেননা এনামেলের দিকেই লোকে এখন ঝুঁকেছে। শুধু লগন্‌সার সময় যা একটু কেনাবেচা হয়। তাও আবার পুরনো বাসনের বদ্‌লিতে নতুন বাসন নেবার রেওয়াজটাই এখন বেশী।

আগে থেকে বলা-কওয়া ছিল। সকালে উঠেই চাকদা-র বাস ধরলাম। উঠে দেখি বাস বেশ সরগরম। একটা বড় দল একটা দিকে বেশ জাঁকিয়ে বসেছে। দেখলেই বোঝা যায় গাঁয়ের খেতাল-চাষী। তার মধ্যে একজন যে মহাজনও বটে, তা বাজি ফেলে বলা যায়। পাঁচ আঙুলে আংটি, পান-খাওয়া, মিশকালো দাঁত, হোঁৎকা কালো চেহারা। লাল-লাল ভাঁটার মত চোখ। হাতে সোনার তাবিজ। দুজনের সিটে একা দু-পা তুলে দিয়ে অনর্গল রাজা-উজির মারছে। কাল শহরে কোর্ট-কাছারি ক'রে, দলিল-দরখাস্তে টিপ সই মেরে আজ গাঁয়ে ফিরছে। আগে ছিল গাঁতিদার ; এখন মহাজন। জমিদারি গিয়ে সেই আজ গাঁয়ের মাথা। কথাবার্তায় হাবভাবে তাই তো মনে হল।

বাস থেকে নামলাম সাড়ে তিন মাইলের মাথায়।

ডানদিকে কাঁচা রাস্তায় মাইল দুই হেঁটে গেলে শ্রীপল্লী। দশ বছর আগে এখানে ছিল ঝোপজঙ্গলে ঘেরা কুঠির মাঠ। সন্ধ্যে হলে বাঘ ডাকত। সমবায় গ'ড়ে বন হাসিল ক'রে এখন সেখানে বাস করছে যশোর-খুলনার নীড়-ভাঙা ষাট-সত্তর ঘর মানুষ। ইস্কুল, মাতৃমঙ্গল, সব্জিক্ষেত, ধানকল, ইটখোলা, ট্র্যাক্টর, বাস, কামারবাড়ি, ছুতোরবাড়ি— সব কিছু নিয়ে দিনে দিনে বাড়বাড়ন্ত শ্রীপল্লীর সমবায়।

একটু এগোলে বাঁদিকে বারাকপুর গ্রাম। অপু-দুর্গা হরিহর-ইন্দির ঠাকরুনের দেশ। মোড়ের ওপর খয়রাতি তাঁবুতে আজ-আছে কাল-নেই এমনি ক'ঘর অস্থায়ী উদ্বাস্তু। দণ্ডকারণ্যের প্রতীক্ষায়?

ডান হাতে এগিয়ে কাটাখালির পুলের কাছে আসতেই যাঁকে খুঁজ-ছিলাম তাঁর সঙ্গে রাস্তায় দেখা হয়ে গেল। বললেন, নৌকো পাই না; ওপারে দেড় ঘণ্টা ব'সে। ভদ্রলোকের হাঁটুর ওপর কাপড় তোলা। দেখে কে বলবে ক'বছর আগেও উনি কলকাতার বাবু এবং সিটি কলেজের অধ্যাপক ছিলেন?

কবরেজ মশাইয়ের বাড়িতে তল্পিতল্পা রেখে বেরিয়ে পড়া গেল, কাছে-পিঠের গ্রাম দেখতে।

পুল পেরিয়ে বেলেডাঙা গ্রাম। বাগ্দীপাড়ায় বিশ ঘর লোকের বাস। মাছ ধরা ব্যাবসা। তবে নামেই জেলে। জাল নেই কারো। থাকলেও কৈ-জাল পুঁটি-জাল। খ্যাপলা জালের দামই ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ; রুই মাছ ধরবার টাটু জাল, পাশ জাল, ভোগ জাল আড়াই শো টাকা ক'রে। বড় বাতুড় জালের কথা তো কেউ ভাবতেই পারে না। তার দাম হাজার টাকা। এদের সরঞ্জাম বলতে একটা ডোঙা, কোঁচ আর তালের চোঁচ দিয়ে তৈরী ঘুনী। বাঁশের শলায় ময়নাগাছের কাঁটা বেঁধে তৈরি হয় এদের বড়শি।

পানা জমে বাঁওড়ের যা হাল হয়েছে তাতে পাখিতেও জল খাবার জায়গা খুঁজে পায় না। মাছও ওঠে তেমনি। ভোর রাত্তির থেকে ঘুরে ঘুরে পদো বিশ্বাস মাছ পেয়েছে পোয়া দেড়েক। পুঁটি আর খল্সে।

বেচেছে ন' আনায়। তিনজন পুষ্যি। আশ্বিনের শেষ থেকে কার্তিক মাস —কোষ্টা-পচা জলে মাছ ধরার মরশুম। অল্প অল্প বৃষ্টি হবে আর পুবে হাওয়া বইবে, তবে বছরে তিন-চার দিন মাছের গাবা লাগবে। তাও এদিকে অঘ্রান থেকে মাঘ—শীতের এই তিনটে মাস জল হয়ে যায় ফরসা; ঠাণ্ডায় মাছ হয় না। গোটা বাগ্দীপাড়া তখন অগত্যা জন খাটে।

দেড় মাস আগে এ-পাড়ায় আসা যেত না। বাঁওড়ে মাছ নেই, মাঠে ধান-কাটা পাট-কাটা নেই—শ্রীপল্লীতে লঙ্গরখানা হয়েছিল তাই রক্ষে।

পরের গ্রাম নতিডাঙা। বুড়ো মাদার মণ্ডলের বাড়ি দেখলেই বোঝা যায় আগে অবস্থা রীতিমত ভাল ছিল। তার ছিল পঁচাশী বিঘে খড়ের জমি। তাতে কুমড়ো আর পটলের ভাল চাষ হত। বিঘেভুঁই খড়ের দামই ছিল চল্লিশ টাকা। দু আড়াই বিঘে পটল বুনলে হাজার বারো শো টাকা ঘরে আসত। সে জমিতে এখন উদ্বাস্তুদের কলোনি বসেছে। নেই-নেই ক'রে মাদার মণ্ডলের এখনও ষাট-পঁয়ষট্টি বিঘে ধানজমি।

এই নতিডাঙারই আরেক বুড়ো আজাহার মণ্ডলের সঙ্গে কাটাখালির পুলের কাছে চায়ের দোকানে দেখা। তেল কিনতে এসে গল্পে গল্পে সারা চা-খানাটা রীতিমত জমিয়ে রেখেছে। বয়েস তার দুই কম একশো।

নীলের চাষ দেখেছে আজাহার। ভারি মজার লোক এই বুড়ো আজাহার। রোজ একবারটি চায়ের দোকানে না এলে ওর ভাত হজম হয় না। গাঁয়ের ছেলেছোকরাদের সঙ্গেই ওর বেশী ভাব। বুড়ো হাড়ে রসকষ খুব।

বেঞ্চিতে একটা পা তুলে ব'সে আজাহার পুরনো দিনের গল্প বলে। আশপাশে এই সেদিনও ছিল বাঘ-ডাকা জঙ্গল। সে কী বন! আজকের দিনে সে সব ধারণাও করা যায় না।

গাঁয়ে গাঁয়ে তখন থাকত পাহারাদার খালাসী। বেণীবাবুর

নীলকুঠি ছিল। ছেলেবেলায় চৌবাচ্চায় প'ড়ে গিয়ে একবার সারা গা নীল মাখামাখি হয়ে গিয়েছিল। বলতে বলতে ফোকলা মুখে সে কী হাসি! ফোকলা হলেও আজাহার এখনও হাঁটে ঘাড় সোজা ক'রে। দেখে কে বলবে বয়স তার পাঁচ কুড়ি।

বুড়ো আজাহার বলে সেকালের গল্প। দইয়ের মণ ছিল তখন দু তিন টাকা। তেলের সের তিন আনা, সাত-হাতি ধুতিও তিন আনা। তবু বুড়ো কী বলে জানেন? বুড়ো বলে, সে সময়ে নাকি ঘরে ঘরে অভাব এখনকার চেয়েও বেশী ছিল। চায়ের দোকানের লোকগুলো মুখ টিপে হাসে। বুড়োর কথা কেউ বিশ্বাস করে না। বলে, বুড়োর মাথা খারাপ। সেকালটা কী সুখেরই না ছিল!

আমাকে উঠতে হল। কিন্তু আজাহারের কথাগুলো মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারলাম না। সেকালটা কার কাছে সুদিন ছিল? অতীতকে আমরা কার চোখ দিয়ে দেখি?

সুন্দরপুর কলোনিটা বেশী দূরে নয়। আগে খড়ের মাঠ ছিল। এখন ঘর তিরিশেক বাস্তুহারার বাস। ঘর পিছু জমি মিলেছে ছ' বিঘে চাষের জন্যে, আট কাঠা ভিটে। আরও দেবার কথা ছিল, কিন্তু শেষ অব্দি কুলোয় নি।

ছিটেবেড়ার ঘরগুলোর দিকে তাকালেই মনে হয়, মাঠের মধ্যে হঠাৎ উড়ে এসে জুড়ে বসেছে এক লোকালয়। শেকড় এখনও ভাল ক'রে লাগে নি। আশপাশের গড়ে-ওঠা গ্রামগুলোর মত নয়। এখনও আলাদা আলাদা ঘর! চলায় বলায় আচারে আচরণে আজও মেলবন্ধন ঘটে নি।

চারিদিকে কেমন একটা দীর্ঘশ্বাসের আবহাওয়া। যারা জোয়ানমদ্দ তারা সব এখনও বোধহয় মাঠে ঘাটে। যেদিকে তাকানো যায়, মনে হয় ছিন্নমূল স্মৃতি যেন বয়সের ভারে এখুনি মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়বে।

দত্ত মশাইয়ের স্ত্রী চা আর মুড়ি নিয়ে এসে হাজির। অবস্থার কথা

আগেই শুনেছিলাম। ভারি লজ্জায় প'ড়ে গেলাম। ভদ্রমহিলার মুখে বিষণ্ণ হাসি। বললেন, ভারি তো চা আর মুড়ি! দেবার আর আছেই বা কী?

চন্দ্রনাথ নাহার বাড়িতে ঝুলন। রাধাকৃষ্ণের কাঠের মূর্তিটাকে ফুল-কাপড় দিয়ে সাজিয়েছেন। গ্যাসের আলোয় ভারি সুন্দর দেখাচ্ছে। চন্দ্রনাথবাবু প্রাইমারি ইস্কুলের মাস্টার। কথায় ত্রিপুরার টান। আগে এক জাহাজে খাতা লেখার কাজ করতেন। দুনিয়ার নানা দেশে ঘুরেছেন।

যাকে বলে ভেসে ভেসে বেড়ানো। পায়ের নীচে আজ একটু মাটি পাবার জন্যে ব্যাকুল। এমন মাটি যা পায়ের নীচে থেকে আচমকা সরে যাবে না।

আসবার সময় এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন ওঁর অনেক কবিতা লেখা খাতা আছে। খাতাগুলো নিয়ে কিছু করা যায় না? দু'এক ছত্র শুনিয়েও দিলেন। ভাব-ভাষা পুরনো, কিন্তু খুব আবেগ দিয়ে লেখা।

বেরিয়ে দেখি সন্ধ্যে হয়ে গেছে। ধানক্ষেতে ফুটফুটে জ্যোৎস্না।

বারাকপুরে একবার যাবার ইচ্ছে ছিল। বিভূতিভূষণের ভিটে দেখব আর সেই সঙ্গে তাঁর বাল্যবন্ধু ইন্দুবাবুর সঙ্গে একবার আলাপ করে আসব।

কিন্তু সন্ধ্যে হয়ে গেল। রাস্তাও অনেকখানি। এইসব ভেবে ইতস্তত করছি, এমন সময় ওয়াজেদ আলি বললেন, ঐ দেখুন ইন্দুবাবুর মেয়ে।

তখুনি ডেকে আলাপ ক'রে ফেললাম। কাল চলে যাব। হাতে সময় বলতে শুধু আজ সন্ধ্যেটা। কাজেই দুর্গা ব'লে বারাকপুরের রাস্তা ধ'রে রওনা হলাম।

দূরের রাস্তা হলেও গল্প করতে করতে দিব্যি চলে যাওয়া গেল। গ্রামে ঢোকবার সময় বন দেখে একটু ভয় হল। চারিদিক লতাপাতায়

এমনভাবে ঢাকা যে, স্পষ্ট করে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কচা গাছের ডাল আবডাল জড়িয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে জোনাকি। বাঁদিকে বিভূতিভূষণের বাড়ি। আলো জ্বলছে। কারা যেন এখন থাকে।

ডানদিকে আশশেওড়ার বন পেরিয়ে ইন্দুভূষণ রায়ের বাড়ি। ভদ্রলোক ত্নঘণ্টা ধ'রে বিভূতিভূষণের কত গল্পই যে করলেন। বাড়ির অবস্থা ভাল নয়। মেয়েটি শহরের হাসপাতালে নার্স-এর কাজ করে। ভারি স্থন্দর গানের গলা।

নিশ্চিন্দিপুর আজ নিশ্চিহ্ন হতে চলেছে। দ্বিতীয় অপু আর জন্ম নেবে না। তা নিয়ে ত্বঃখ করেও খুব লাভ নেই। দেশ-কাল-পাত্রের রূপান্তরে সাহিত্যেও নবযুগ না এসে পারবে না।

গল্পগাছা শেষ ক'রে কবরেজ মশাইয়ের বাড়িতে যখন ফিরলাম গাঁয়ের পক্ষে তখন রাত হয়েছে। কবরেজ মশাইয়ের মেজাজটা আজ খুব ভাল। লঙ্গরখানা আজ থেকে বন্ধ হয়ে গেল। মাঠে ধান-কাটা পাট-কাটা শুরু হয়েছে। যার জমি নেই সেও জন খেটে এখন যো-সো ক'রে চালিয়ে নিতে পারবে।

গাঁয়ে গাঁয়ে গান গেয়ে ভিক্ষে ক'রে শ্রীপল্লীর এই লঙ্গরখানা এতদিন চলেছে। পুরো একমাস রোজ একবেলা খিচুড়ি খেয়েছে সত্তর থেকে একশোজন ছেলে-মেয়ে-বুড়ো। নিজে দাঁড়িয়ে থেকে না খাওয়ালে কবরেজ মশাইয়ের তৃপ্তি হত না। কাল থেকে একটু ফাঁকা ফাঁকা লাগবে। কিন্তু তাই ব'লে লঙ্গরখানা উঠে যাওয়ার আনন্দও তো কম নয়।

পরদিন গাবতলায় লঙ্গরখানা বন্ধ হওয়ার উৎসব। গাঁয়ের লোক কিছুতেই সেদিন আসতে দিল না। ত্নপুরে পাত পেড়ে খিচুড়ি খাওয়া। সন্ধ্যেবেলা গান-বাজনার আসর। ওয়াজেদ আলির গানে, ছেলেদের যাত্রায় আর পদ্মলোচনের সারেন্দায় সন্ধ্যেটা জমে উঠল।

তারই এক ফাঁকে কাটাখালির পুল পেরিয়ে মাদার মণ্ডলের দোকানে গিয়েছিলাম একটা দেশলাই সওদা করতে।

মাদার মণ্ডল টুল দিলেন বসতে। বললেন, খবর জানতে এসেছিলেন তো এখানে? একটা খবর নিয়ে যান।

খবরটা ছোট্ট।

মাদার মণ্ডলকে পাঁচ-ছ' বছর আগে এক মহাজনের কাছ থেকে ছু দফায় আট শো টাকা ধার নিতে হয়েছিল। তার জন্তে ষোল বিঘে জমি বিক্রী কবলা করতে হয়েছিল। বছরে স্থদ বিশ মণ ধান, চার মণ খন্দ। ছু দফায় দলিল লিখতে খাতকের তিরিশ টাকা। স্থদের দায়ে আধাআধি জমি এরই মধ্যে বিক্রী হয়ে গেছে। যে টাকা ধার নেওয়া হয়েছিল তার ছু গুণ টাকা শোধ করেও মাদার মণ্ডলের ঘাড়ে স্থদে-আসলে এখনও আড়াই শো টাকার দায়। তার ওপর নতুন ক'রে আবার আরও এক শো টাকা কর্জ নিতে হয়েছে।

বাগ্দীপাড়ার নিরাপদ বসেছিল। তার দিকে তাকালাম। বলল, অবাক হচ্ছেন কী? আজ ঘরে ঘরে এই অবস্থা।

টাকা চাইলেই যে সব মহাজন টাকা দেয়, তা নয়। মনে করুন, এক মহাজনের নাম আসরাফ মিঞা। আপনি তার কাছে একশো টাকা চাইলেন, সে বলল—টাকা দিতে পারব না; ধান, কলাই, ছোলা দিচ্ছি, বেচে তুমি তোমার টাকা নিয়ে নাও। তবে বাজারদর যা তার চেয়ে এক টাকা বেশী দিতে হবে! বাজারদর কত, তা অবশ্য মহাজনই সাব্যস্ত করবে।

ধার আপনাকে করতেই হবে। নইলে চাষ বন্ধ। স্থতরাং টাকার বদলে ফসলেই আপনাকে রাজী হতে হল। আপনি কলাই নিলেন। প্রকৃত বাজারদর যখন আট টাকা, মহাজন বলবে ন' টাকা। স্থতরাং তার চেয়ে একটাকা বেশী, অর্থাৎ দশ টাকা মণ হিসেবে আপনি দশ মণ কলাই পেলেন। তার মানে, আপনি ধার করলেন এক শো টাকা।

এবার আপনি যাবেন আড়তদারদের কাছে বেচতে। আট টাকা বাজার-দর। ন' টাকা নয়। কিন্তু আট টাকা মণ হিসেবেও আপনি কিন্তু তাই বলে দশ মণে আশী টাকা পেলেন না! মণে ছু সের ধলতা,

আড়তদারি ছ আনা, মণে এক পয়সা বৃত্তি আর মুটে নেবে মণে ছু আনা। অর্থাৎ, এক শো টাকার জিনিসে সব মিলিয়ে পাবেন একাত্তর টাকা সাড়ে তেরো আনা। আবার এতেও রেহাই নেই। অনেক আড়তদারের দু রকমের হন্দর থাকে—বেচারাম আর কেনারাম। বেচার জন্যে এক প্রস্থ, কেনার জন্যে আরেক প্রস্থ।

এই সঙ্গে আরেকটা কথা মনে না রাখলে পুরো ছবিটা স্পষ্ট হবে না। কথাটা এই—যে মহাজন, সে আড়তদারও বটে। একেবারে যাকে বলে শাঁখের করাত। আসতে কাটে, যেতে কাটে।

পুরো ব্যাপারটা তাহলে কী দাঁড়াল? যে মহাজনের কাছ থেকে এক শো টাকা ধার ক'রে আদতে পাচ্ছেন একাত্তর টাকা সাড়ে তেরো আনা—তাকে ফসলে শোধ করতে গিয়ে আপনার এক শো টাকাটা হয়ে যাচ্ছে একাত্তর টাকা সাড়ে তেরো আনা। এ এক চরম নিষ্ঠুর মর্মান্তিক ধাঁধাঁ। এই ধাঁধাঁর মধ্যে পাক খাচ্ছে আজ কৃষকের জীবন।

শুনে মনটা এমন ভার হয়ে গেল যে ফিরে এসে তাতে আর সারেন্দার সুর লাগল না।

রাত্তিরেই শেষ বাসে শহরে ফিরে এলাম।

পরদিন সকালে এক মোক্তার বন্ধুর সঙ্গে দেখা। গ্রামাঞ্চলে তাঁর যাওয়া-আসা আছে। বললেন, চাষী যে শুধু এক তরফা পড়ে পড়ে মার খাচ্ছে এটা ঠিক নয়। এক বনগাঁ মহকুমাতেই একশো ছত্রিশটা কৃষি ঋণদান সমবায় সমিতি বসেছে। সরকারী ঋণ বিলি হয়েছে সাত লাখ টাকার। সরকারী ঋণ পেলে চাষীরা মহাজনদের খপ্পর থেকে বাঁচবে। তবে জমি জো হবার আগেই ঋণটা পাওয়া চাই। নইলে চাষীকে ছুটতেই হবে মহাজনদের কাছে। বুঝলাম চাষীতে-মহাজনে দড়ি টানাটানি চলেছে। যেখানে যাদের জোর বেশী তারাই জিতছে।

কী গ্রামে কী শহরে এখন আর জমি যার মুলুক তার নয়—টাকা যার মুলুক তার। সেই সুবাদেই গাঁয়ের বড়লোক এখন শহরের বড়লোকের ভাইব্রাদার। গ্রামের লুঠের টাকা শহরে শরিকানা

বন্দোবস্তে পোদ্দারিতে, চোরাকারবারে, চোরাচালানে খাটছে। টাকার জাত্নদণ্ড বুলিয়ে নিজেদের ইচ্ছে মত নয়কে হয় আর হয়কে নয় করা শক্ত হচ্ছে না। সরকারী কলকাঠি নাড়ানোর উপায়গুলো তাদের হাতের মুঠোয়—কেননা তাদের গাঁটের কড়ির গাঁটছড়ায় শাসক পার্টি বাঁধা।

এ হিসেবও মাঝে মাঝে উল্টে যায়।

একবার এক ছোকরা হাকিম এলেন। তিনি এসে পাইকার-মহাজনদের এমন ঢিট করতে লাগলেন যে, রক্তচোষাদের মহলে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠল। তাড়াতাড়ি তাঁকে অন্য জায়গায় সরিয়ে দেওয়া হল। পরে জানা গেল, উনি তো অমন করবেনই। গরীব জেলের ছেলে—লেখাপড়া শিখে কপালগুণে হাকিম হয়েছেন। হলে হবে কি, রক্তের টান যাবে কোথায়।

দেশ জুড়ে আজ এই রক্তের টানই চাই।

আসার দিন মেয়েটার স্বব দেখে এসেছিলাম। স্নুতরাং বিকেলের ট্রেণই ধবব ঠিক করলাম।

স্টেশনে লোক নেই বেশী। চলতি ট্রেণে যারা নামে ওঠে, সেই স্নপুরির লোকেরা গেল কোথায়? বলতে গেলে ট্রেণ একেবারে খালি।

হুইসেল শুনে সবুজ নিশান দেখে ট্রেণ ছাড়ল। পিসেমশাইয়ের কথা মনে পড়ছিল। পিসেমশাইয়ের অদৃশ্য-হওয়া ডায়রিটার কথা। আবার কবে আসব কে জানে।

সম্ভ-দেখে-আসা মুখগুলো মনে পড়ছে। আশা আর আনন্দের, তুঃখ আর ভয়ের রৌদ্রছায়ায় আউশের মাঠগুলো ছাড়িয়ে চললাম।

মাঠের মধ্যে ট্রেণ হঠাৎ দাঁড়িয়ে গেল। কোনো তুর্ঘটনা ঘটল নাকি? জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম।

একটা হৈ-হৈ চিৎকার। বাইরে তাকিয়ে দেখি খানিকটা দূরে লাইনবন্দী লোক হুড়মুড় করে আসছে পাটক্ষেতের ভেতর দিয়ে। হাঁটু-জল ভেঙে দেড়-তুশো মেয়েপুরুষ লাইনে এসে উঠল। ট্রেণের পা-দানিতে আগে থেকেই লোক দাঁড়িয়ে ছিল, পুরো দলটাকে তারা টেনে হিঁচড়ে

ওঠাতে লাগল। খানিক পরে দেখলাম তারা হাত তুলিয়ে তুলিয়ে রুমাল নাড়াচ্ছে। ট্রেণ অমনি চলতে আরম্ভ করল। দেখে মনে হল, ট্রেণের ল্যাজা-মুড়ো সমস্তটাই তাদের দখলে।

বনগাঁ থেকে চাঁদপাড়া আসতে রাস্তার মধ্যে ট্রেণ চার জায়গায় থামল। সব জায়গাতেই সেই একই দৃশ্য। লোক কোথাও কম উঠল, কোথাও বেশী। শেষবারে আমাদের ফাঁকা কামরাটাও বস্তায় বস্তায় ঠাসাঠাসি হল।

আমাদের কামরায় যারা উঠেছিল, তাদের সকলেরই বয়স পনেরো থেকে তিরিশের মধ্যে। তাদের চোখমুখ দেখে মনে হল না কাজটা খুব ভয়ের।

একজনকে জিজ্ঞেস করলাম, থাকে কি রকম ?

একটু হাসল। বলল, ধরা পড়লে সব গেল ; ধরা না পড়লে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ। বুঝলেন না, যখন যা বাজার !

তারপর ঘুরে ব'সে সঙ্গীদের সঙ্গে সিনেমার গল্প জুড়ে দিল।

করিডর দিয়ে পাজামা-পরা একটি ছোকরা ঢুকল খাতা-পেন্সিল নিয়ে। এদের বলে গ্যাংম্যান। বস্তাগুলোতে জুতোর আগা ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল, কোথাকার মাল ?

মুখ তুলে চেনা একজনের দিকে চোখ পড়তেই উত্তরের অপেক্ষা না ক'রে সরবে লিখতে শুরু ক'রে দিল : ও, বেলেঘাটার ?

তারপর উল্টোডাঙ্গার আগের ষ্টেশনে ছাড়া ট্রেণ আর অন্য কোথাও থামে নি। শুধু ছোট একটা দল দমদম ক্যান্টনমেণ্টে নেমে গিয়েছিল।

উল্টোডাঙ্গা স্টেশন ছেড়ে এসে একটা মাঠের মধ্যে ট্রেণ থেমে গেল। তারপর সে এক দৃশ্য। এক-মণী দেড়-মণী বস্তা মাথায় ক'রে লাইনের ওপর লাফিয়ে লাফিয়ে পড়ছে যেন কোনো প্যারাস্যুট-বাহিনী। লাফিয়ে নামার যেন অন্ত নেই। মানুষে মানুষে কালো হয়ে গেল জলে জলাকার মাঠ। গড়ান বেয়ে লোক কেবল নেমেই চলেছে। নেমেই সুদক্ষ সৈন্যের মত ছোট ছোট ভাগ হয়ে ছত্রাকারে ছড়িয়ে পড়ল।

দূরের মানুষগুলো ছোট হয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ একটা সুতীব্র হুইসেলের শব্দ। একে একে আরও কয়েকটা। সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল সারা মাঠে সভয় তরঙ্গ তুলে গোটা বাহিনী ফিরে আসছে। একটা পাঁচিলের আড়াল থেকে তীরবেগে ছুটে এল একটা লোক। প্রত্যেকের চোখ তার দিকে। একহারা রোগা লম্বা চেহারা। হাতে রূপোলি ব্যাণ্ড-লাগানো রিস্টওয়াচ। ওলটানো চুল। কুচকুচে কালো রং। পাট-ভাঙ্গা সাদা পাজামা-পাঞ্জাবী, পায়ে সাদা স্যাণ্ডেল। হাত নেড়ে সবাইকে সে উঠে পড়তে বলল। তারপর এক ঝাঁক রুমাল নড়ে উঠতেই ট্রেণ আবার চলতে শুরু ক'রে দিল।

কয়েক ফার্লং গিয়েই মাঠের মধ্যে ট্রেণ আবার থেমে গেল। এবার যারা নামল তারা আর ফিরে এল না।

ট্রেণ চলতে আরম্ভ করল। আমার সামনে যে হকার ছোকরা লজেন্সের বোতল নিয়ে গোবরডাঙ্গা থেকে উঠে এতক্ষণ ঠায় চুপ ক'রে বসেছিল, সে এবার মুখ খুলল :

কাল ওদের সব চেয়ে বড় লীডার ভুবনকে পুলিশে ধরেছে কিনা, তাই আজ একটু দাপট দেখিয়ে নিল।

তারপর লজেন্সের বোতলটা কোলে নিয়ে স্বীকারোক্তির সুরে বলল : দিন কতক আমিও করেছি। বড় খারাপ কাজ। ও কাজে মানসম্ভ্রম নেই।

সোনালী সূতোর পাকে পাকে

ট্রামের হরতাল চলেছে ক'দিন থেকে। রাস্তায় পিল পিল ক'রে হেঁটে চলেছে অফিস-ফেরতা লোক। যারা দূরের যাত্রী এবং যাদের শরীরে তাগৎ আছে, তারাই শুধু বাস ধবার চেষ্টা করছে।

কলকাতা সত্যিই আশ্চর্য শহর। এত দুঃখেও মানুষ হাসতে পারে! বাসে একটু জায়গার জন্যে ডায়মণ্ডহারবার রোডে হন্যে হয়ে ফিরছি।

সামনের একটা বাসে আধ-বৃদ্ধ এক ভদ্রলোক পাদানিতে কোনো রকমে একটা পা চালিয়ে দিয়ে দুর্গা বলে ঝলে পড়লেন। জনকয়েক যাত্রী হাঁ-হাঁ করে উঠল, 'পারবেন না মশাই, পাববেন না। এক পায়ে দাঁড়াতে। ছেড়ে দিন।'

ভদ্রলোক চোখমুখ লাল ক'রে ঠোঁটে একটু ম্লান হাসি ফুটিয়ে বললেন, 'চার-পা ছেড়ে দু-পা হতে পেরেছি যখন, দু-পা ছেড়ে এক-পা হতে পারব না? বললেই হল?'

ক্রমবিবর্তনের দুরূহ তত্ত্বকে এক পায়ে দাঁড় করিয়ে রেখে ভদ্রলোক যেন আমাদের কোনো এক বিস্মৃত পূর্বপুরুষের মত গাছের ডালের বদলে লোহার রড ধরে ঝুলে থাকলেন।

তারাশংকর বন্দ্যো

আলো ছায়ার পাকে পাকে



ডিপোয় বাস দাঁড়িয়ে। সামনে একবালপুরের নির্জন দিল-খোলা রাস্তা। গাছের নীচে পাঞ্জাবী চা-বিস্কুটওয়ালা। বেশ একটা মফস্বল মফস্বল ভাব। যতক্ষণ না বাস ছাড়ে সিটের ওপর পা তুলে দিয়ে বিড়ি-সিগারেট খান কেউ কিছু বলবে না। গরমের দিনে গাড়িতে বসেই বরফ-দেওয়া লেমনেড পাবেন। চানাচুরওয়ালার সঙ্গে দু মিনিট গল্প হবে। ছেলে-মেয়েদের জন্যে এক আনায় বারোটা বিস্কুট না নিয়ে যেতে পারলে মন খুঁতখুঁত করবে। আলিপুরে মামলা করতে আসা চেনা লোক, সওদা নিয়ে ফেরা ভূষিমালের দোকানদার—কারো না কারো সঙ্গে দেখা হবেই। আব এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো মুখরোচক খবর চালাচালি হবে।

৭৭-এ। বাসটা দেখে ভীষণ মন কেমন করে উঠল। বজবজে কত দিন যাই নি। মুখগুলো সব ভুলে যেতে বসেছি যে।

পবের দিন সকালেই বেবিয়ে পড়লাম বজবজের বাস ধরতে।

মোমিনপুরের মোড় থেকে উঠলাম। উঠে দেখি একগাদা শহুরে লোক। মফস্বলের এ-বাসে ঠিক মানায না। মাঝেরহাটে তারা নেমে যেতে বাস একদম ফাঁকা। এতক্ষণে সেই হাত-কাটা পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টর নজরে পড়ল। দাড়িতে পাক ধরেছে। দেখে নিজের সেই পাকা চুলটার কথা মনে পড়ে গেল, পানের দোকানের আয়নায় রগের ঠিক পাশে যেটাকে একটু আগে খাড়া হয়ে থাকতে দেখেছি।

টাঁকশাল পেরিয়ে বাস ডানদিকে ঘুরল। দরাজ রাস্তা। যুদ্ধের সময় একটু এগিয়ে ডানদিকে ছিল উড়োজাহাজ নামা-ওঠার শান-বাঁধানো রানওয়ে। এখন সেখানে মাঝে মাঝে হয় মোটরগাড়ির দৌড়।

বাঁদিকে সাহেবসুবোদের খানকয়েক সওদাগরী আপিস। তারপরেই পোর্ট কমিশনার্স-এর লাল ব্যারাক-বাড়ি। ফাঁকা রাস্তা পেয়ে বাস এত তাড়াতাড়ি যায় যে, গুণে শেষ করতে পারি না। হতে না হতে বাড়ি-গুলোর রং কালচে হয়ে এসেছে। আগে যে বাড়িগুলো দেখে অফিসারদের বলে মনে হয়েছিল, তাব বারান্দায় দেখলাম কালিঝুলিমাখা ধুতি আর

শাড়ি ঝুলছে। চোখে কুৎসিত ঠেকলেও মনে মনে খুব ভাল লাগল। বস্তি থেকে মানুষগুলো ফাঁকা মাঠের মধ্যে পাকা দালানে উঠে এসেছে। অফিসার নয়, নীচুতলার মানুষ। যখন তারা আরেকটু পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে থাকতে পারার মত অবস্থায় আসবে, সারা তল্লাটটা কী সুন্দর যে দেখাবে!

ডাকসাইটে জিঞ্জিরাপোলও পার হয়ে গেলাম। বন্দুক হাতে সেপাই দূরের কথা, লাঠিধারী লালপাগড়িও চোখে পড়ল না। ক' বছর আগে দিনে দুপুরে বাস থামিয়েও এখানে ডাকাতি হয়েছে। রাস্তার ধারে লাশ পড়ে থাকত। সেই ডাকাবুকোরা সব গেল কোথায়? না কি স্বভাব বদলেছে? না ধবন? খাদ্যবিভাগেব চেকপোস্ট দেখে স্পষ্ট ক'বে কিছু বোঝা গেল না।

তারপর একদমে মহেশতলা। যেতে যেতে ডানদিকের মাঠেব মধ্যে সেই বাড়ি, যেখানে চকচকে টিনের গায়ে সূর্যেব আলো ফেলে সিনেমার লোকেরা গ্রাম্য গল্পের শুটিং করত আর তাই দেখতে আমরা বাসসুদ্ধ লোক জানলায় হুমড়ি খেয়ে পড়তাম। বাড়িটাব দিকে গলা বাড়িযে তাকালাম। তালা ঝুলছে।

সন্তোষপুরের মাঠে আমনের চারাগুলো সবুজ হয়ে আছে। বোধ হয় বৃষ্টির ছাঁটে হাঁটুজলে কাত হয়ে পড়েছে মাথায় হ্যাট-পবা এক কাকতাড়ুয়া। দূর থেকে কী মজার দেখাচ্ছে। নালাগুলোর মুখে মাছ ধরার ঘুনী লতাপাতামাটি দিয়ে সাঁটা। বাচ্চার দল পুঁটি-মাবা ছিপ নিয়ে জলে জলে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তাহলে যা ছিল সব তেমনিই আছে।

মহেশতলা ছাড়িয়ে স্তূপাকার ছেঁড়া রবার টায়ারেব পরিচিত গন্ধ ভক করে নাকে লাগতেই হঠাৎ হুঁশ হল বাস হুড়মুড় করে ডানদিকে বাটা-নগরের প্রাইভেট রাস্তায় ঢুকছে! বাসের এ আবার কী বদ্-খেয়াল? শুনে রাগ হল ৭৭-এ বাসের এটা নাকি নতুন রুট। বসে গজগজ করতে লাগলাম। মিছিমিছি পোয়া ঘণ্টা সময় যাবে। তাও আবার একই

রাস্তায় যাওয়া আসা।

রাস্তার ওপর থেকে নীচে রেললাইন দেখতে দেখতে হঠাৎ রাগ পড়ে গেল। দূরে নুঙ্গী স্টেশন। একবার নেমে গেলে হত। স্টেশনের কাছেই থাকে এক পরিচিত বন্ধু। হাতের মুঠোয় দলা-পাকানো টিকিট আর এক সহযাত্রীর কব্জিতে ঘড়ির সময় আমাকে বাস থেকে কিছুতেই নামতে দিল না।

কী করি! বাটা কারখানার দেয়ালে লেখা ইংরিজি স্লোগানের পাশে বাংলা তর্জমাগুলো পড়ে পড়ে মেলাতে লাগলাম। তর্জমা তোফা। উপদেশগুলো সত্যিই মূল্যবান। এবং লাভজনকও বটে। তবে সম্বোধনে তুমি-র ব্যবহারটাই যা একটু বিদিকিচ্ছিরি। নিজের তৈরি জিনিস নিজে ব্যবহার করে অন্যদের দেখাও—এই উপদেশটা ভারি মনে ধরল। কথায় বলে, নেই কাজ তো খই ভাজ। আমার অবস্থাও তখন তাই।

সুতরাং এবার তর্জমা ছেড়ে সরেজমিনে তদন্ত শুরু করে দিলাম। কথার সঙ্গে কাজের কতটা মিল আছে দেখা যাক। কী আশ্চর্য! রাস্তার লোকের পায়ে বাটার জুতো ছাড়া সত্যিই আর কোনো জুতো নেই। তবে একটু ডিঙিয়ে ডিঙিয়ে নজর ফেলে দেখতে হল। কারণ কারো কারো পায়ে জুতোই নেই।

আবার সেই নেই কাজ তো খই ভাজ। দেখা যাক তো এই জুতোর শহরে কজনের পায়ে জুতো নেই? এক দুই…তিন চার…। আঙুলে গুণে শেষ করতে পারছি না। তারপর সবুজ ঘাসের দিকে তাকিয়ে চোখটাকে একটু মটকাবার চেষ্টা করছি, হঠাৎ দেখি সামনে ইংরিজিতে বড় বড় করে লেখা—'ধন্যবাদ'। অর্থাৎ, সোজা বাংলায়—এবার যেতে পারেন।

সামান্য চমকালাম। তারপর সাইজ হয়ে ব'সে ঘাড় ঘুরিয়ে বাটার বিজ্ঞাপনে দেখা খাজুরাহোর সেই খালি পায়ে কাঁটা বেঁধা নারী-মূর্তির ছবিটা খুঁজতে লাগলাম। কোথাও চোখে পড়ল না।

তারপর আবার দিগন্তবিস্তৃত মাঠের সারি। রাস্তার দুপাশে খাল-[illegible] ছাপিয়ে উঠেছে। জালতি নিয়ে মাছ ধরতে ব্যস্ত ছেলেবুড়ো বুড়ি-বেওয়ার দল।

বাস ভয়ে একপাশে সরে যায়। শেকল ঠন্ ঠন্ করতে করতে বজবজের তেল-বেওয়া লরীগুলো রাস্তা কাঁপিয়ে ঝড়ের বেগে ছুটে আসছে। তেলের দেমাকই আলাদা।

রাস্তার ধার ঘেঁষে শ্যামপুরের বাজাব। ডানদিকে ছায়া-ঢাকা চিত্রিগঞ্জের রাস্তা। এক সময়ে কত এসেছি।

দুদিকে বসতি ক্রমে ঘন হয়ে এল! মোটর মেরামতির কারখানাটা পেরিয়ে বাঁ দিকে মিশনারি ইস্কুলেব ফুলবাগান। হাসপাতাল পেবিয়ে ডানদিকে ষ্টিমার ঘাটের বাস্তা। বজবজের চৌরাস্তাব মোড়।

বজবজ। কিন্তু চড়িয়াল আরও খানিকটা দূবে। মোড়ের ওপব গম্বুজ-তোলা মন্দির। দূব থেকে তো বটে, কাছ থেকেও গুমটি বলে মনে হয়। নীচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাত-দেখানো পুলিশ।

কুইন সিনেমার মোড়ে এসে বাস এমন করে দাঁড়ায় যেন আর চলবে না। বসে বসে যদি আপনাব পা ধবে গিয়ে থাকে একটু নেমে হেঁটে-চলে পা ছাড়িয়ে নিতে পারেন। পান খান, সিগারেট খান। সামনেই দোকান। বাস কখন ছাড়বে জেনে নিলে চাই কি গরম এক কাপ চাও খেয়ে নিতে পারবেন।

অবশেষে বাস ছাড়ল। ডানদিকে বিপুলকায় তেলেব ট্যাঙ্কের ফাঁকে ফাঁকে গঙ্গার বুকের ওপব ঝুঁকে-পড়া আকাশটাকে খুব গম্ভীর, খুব চাপা বলে মনে হল।

ময়লা ডিপোর মোড়ে দুদণ্ড থেমেই বাস আবার ছেড়ে দিল। কোনো সওয়ারি ওঠে নি, নামে নি। পাঞ্জাবী ড্রাইভারের শালোয়ার-পরা ছোট মেয়েটা খাবারের পুঁটুলিটা বাপেব হাতে এগিয়ে দিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। গাড়ি ছেড়ে দিল। একদম সময় নেই। বোকা মেয়েটা কি ভেবেছিল, বাবা তার থুৎনি ধরে একটু আদর কবে দেবে?

হপ্তাবাজারের রাস্তাটা ডানদিকে রেখে কয়লাসড়কে বাস এসে থামতেই নেমে পড়া গেল।

আগে যেখানে ভাঙা টিনের একটা চালা ছিল, সেখানে পাকা এক-তলা লম্বা কোঠা উঠেছে। পাশাপাশি খানকয়েক দোকানঘর। যেটা আগে রেশনের দোকান ছিল, সেটা আর নেই।

চা-তেষ্টা পেয়েছিল। চোখ তুলতেই সামনে দেখি দালানঘরে চায়ের দোকান। কে ওখানে বসে? বিজয় না? বিজয় বলেই তো মনে হচ্ছে।

আবার ঘুরে ফিরে সেই চায়ের দোকান? বিজয় এই ক'বছরে দেখতে বড় হয়ে গেছে অনেক।

কালভার্টের ঠিক পাশেই ভাঙা টিনেব চালার একটেরে ঘরে ছিল ওর চায়ের দোকান। চলত না। এটা ওটা রাখতে পারলে, দোকানটার একটু ছিরি ফেরাতে পারলে খদ্দেরপাতি কিছু হয়ত হত। কিন্তু তার জন্যে যে পুঁজি লাগে বিজয়ের তা ছিল না। তাছাড়া বর্ষাব কটা মাস তার দোকানে খদ্দরের ইচ্ছে থাকলেও আসা সম্ভব হত না, কেননা ফুটো ছাদের তলায় বসে কার দায় পড়েছে ভিজতে?

শেষ অবধি বিজয় নেভানো উনুন কোলে নিয়ে শুধু বিড়ি বানিয়ে দোকানটা বজায় রাখার চেষ্টা কবেছিল। তাতেও হালে পানি পায় নি। মাঝে শুনেছিলাম দোকান তুলে দিয়ে বিজয় নাকি এখন এ-কলে সে-কলে বদ্‌লি খেটে বেড়াচ্ছে।

আজ দেখছি বিজয়ের আবার দোকান হয়েছে। আর আকাশে মেঘ দেখে ভয় পাচ্ছে না সে। দেখে-শুনে মনটা খুব খুশী হল।

চারদিকে আর সব ঠিক তেমনিই আছে। বন্ধ দরজার গায়ে 'বেঙ্গল চটকল মজদুর ইউনিয়নে'র সাইনবোর্ডটা ঝুলছে। শুধু অক্ষরগুলো আরও পুরনো আর রংগুলো আরও ফিকে হয়ে এসেছে।

বাঁহাতি রাস্তা দিয়ে নেমে ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামে ঢুকলাম। মোড়ে বেশ্যাদের লাইনবন্দী ঘর। তার দাওয়ার ওপর খাঁচায় যে 'হরেকৃষ্ণ-

হরেকৃষ্ণ'-বলা টিয়াপাখিটা থাকত আর সেই ষণ্ডামার্কা কুকুর- -তারা গেল কোথায় ? তারা এখনও বেঁচে আছে কিনা কে জানে ?

ডানদিকের শুকনো খানাটা এখন গঙ্গার জলে টইটম্বুর। রাস্তার দুপাশে জল পেয়ে আগাছার জঙ্গলের গায়ে রীতিমত গত্তি লেগেছে।

নমাজডাঙ্গায় পৌঁছুতে পৌঁছুতে গাঁয়ের কিছু কিছু খবরাখবর জুটে গেল। ভয়ে ভয়ে ভুবনের কথা জিজ্ঞেস করলাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ ঘোষেদের বাড়ির ছেলে—যার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল।

ভুবন ভাল আছে। একেবারে স্বাভাবিক। কলে কাজ করছে। বিয়ে হয়েছে, ছেলেও হয়েছে একটি। মাথা ভাল হয়েছে কি এমনি এমনি! ওর দিদিমা বাবা তারকনাথের পায়ে হত্যে দিয়েছিল ব'লেই না--

পড়াশুনোয় ভাল ছিল ভুবন। হঠাৎ একদিন মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারপর তার সঙ্গে আর দেখা হয় নি।

আরেকটি ছোকরা। সে ছিল খৃস্টান। টমাস না কী যেন নাম। ময়লাডিপোর কাছে থাকত। অনেক বছর আগে এই গ্রামেই তার সঙ্গে আমার আলাপ। আমাকে ধরেছিল একটা দরখাস্ত লিখে দিতে।

দরখাস্ত লিখতে গিয়ে সমস্ত শুনলাম।

দমকলে কাজ করত টমাস। কলকাতার মারামারি কাটাকাটির সময় ধর্মতলায় পুলিশের একটা হল্লার মুখে পড়ে যায়। তার অল্প কিছুদিন আগে একটি মেয়েকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছিল। পুলিশ ওর কোনো কথাই শোনে নি। ভবঘুরে ব'লে বেলেঘাটায় ওকে চালান ক'রে দেয় কোন্ এক খোঁয়াড়ে। বাড়িতে চিঠিচাপাটি পাঠাবার অনেক চেষ্টাও নাকি করেছিল। চিঠি যায় নি। পুলিশ পরে ওকে পাগল সাব্যস্ত ক'রে পাগলদের সঙ্গে রাখে। সেখানে আস্তে আস্তে সত্যিই তার মাথা খারাপ হয়ে যায়। আমার সঙ্গে যখন তার দেখা তার অল্প কিছুদিন আগে সে ছাড়া পেয়ে বাড়িতে ফিরেছে।

দরজা খুলে দিয়ে তাকে দেখে বাড়ির লোকে এমনভাবে আঁতকে

উঠেছিল যে, তারা যেন সত্যি সত্যি ভূত দেখেছে।

আস্তে আস্তে সমস্ত কিছুই সে জানতে পারল।

অনেকদিন কোনো খোঁজখবর না পেয়ে বাড়ির লোকে ধরেই নিয়েছিল কলকাতার দাঙ্গায় টমাস নিশ্চয় খুন হয়েছে। টমাস খৃস্টান ছিল বটে। কিন্তু খৃস্টান ব'লে তো আর কারো গায়ে লেখা থাকে না! সুতরাং খৃস্টান হয়েও দাঙ্গায় তার খুন হওয়াটা আটকায় না।

টমাসের বউ কিন্তু গোড়ায় গোড়ায় বিশ্বাস করে নি। ভেবেছে, মর্গে যখন লাশ পাওয়া যায় নি তখন নিশ্চয়ই রাগ ক'রে কোথাও চলে গিয়েছে। রাগ পড়ে গেলেই আবার আসবে।

কিন্তু মাস তো বটেই, যখন বছরও ঘুরে গেল তখন আর সে মনে জোর রাখতে পারে নি। টমাস মরে গেছে—এ কথা ক্রমে সে বিশ্বাস না ক'রে পারল না।

টমাসের বউ তার বাপের বাড়িতে চলে গেল। বাবা তাকে অনেক ক'রে বলেছিল আবার বিয়ে করতে। কিন্তু সে রাজী হয় নি। তাকে রাজী হতে হল বাবা মারা যাওয়াব পর। যখন সংসারে তার আপন বলতে কেউই আব রইল না।

টমাসের বউ আবার বিয়ে করেছে টমাস ফেরার মাত্র মাস ছয়েক আগে। পাত্র ভাল। মিশনারি ইস্কুলের দোজবরে মাস্টার।

টমাস আমাকে বলেছিল, 'পাগল হওয়াই দেখছি এর চেয়ে ভাল ছিল। সেরে উঠে এখনই বরং পাগল্‌-পাগল লাগছে!'

বউয়ের কথা বলতে বলতে টমাসের চোখে জল এসে গিয়েছিল।

গ্রামে এসে হঠাৎ সেই টমাসের কথা মনে পড়ে গেল। তার কথা কাকে জিজ্ঞেস করব? খৃস্টানপাড়ার খবর কেউ রাখে না।

পুকুরপাড়ে দাঁড়িয়ে আছে মোল্লাদের বাড়ির বুড়ো। বুড়ো তাহলে এখনও বেঁচে আছে! তাব বয়েস হল চুরাশি। ক'বছর আগেও কী জোয়ান চেহারা ছিল তার। ঐ বয়সেও বুড়ো সমানে কলে কাজ করেছে। সার্ভিস তোলবার কথা কানেই তুলত না।

শরীরটা ভেঙে পড়ায় গত বছর থেকে আর কলে যাচ্ছে না।

'তারপর বাবুমাশাই—' থেকে থেকে এই ব'লে অনেক রাত অবধি দাওয়ায় শুয়ে বুড়ো আমাকে সেকালের গল্প বলত। কলে কাজ হত তখন লণ্ঠন জ্বেলে। সাহেবরা বাপ-মা তুলে জুতোর ঠোক্কর মেরে কথা বলত। মজুররাও সুবিধে পেলেই শোধ নিত। শোধ নেবার কায়দা ছিল তখন অন্য রকমের। পেছন থেকে কেউ একজন সাহেবের মাথায় ছালা-চাপা দিত, তারপর পাইকারিভাবে মার। এখন বলতে বাধা নেই, এ ব্যাপারে বুড়োর বেশ হাতযশ ছিল। সাহেবরা ধরবে কাকে? কে মেরেছে কে জানে? তাছাড়া সাহেবরা ও নিয়ে আর বেশী ঘাঁটাতেও চাইত না। হাজার হোক, সাহেবদের পক্ষে সেটা খুবই বেইজ্জতির ব্যাপার কিনা।

বুড়ো পেছন ফিরে উঠোনে দাঁড়িয়ে ছিল। ঈদের চাঁদের মত তার দাড়িটা দেখা যাচ্ছে না। বুড়ো বোধহয় কানেও এখন কম শুনছে। ডাকলাম। বুড়ো শুনতে পেল না।

জহিরনদের বাড়িতে আর গেলাম না। আমার পাতানো মেয়ে আতরই যখন নেই, কার কাছে যাবো।

বাপ মা-মরা মেয়ে আতর। জহিরনই ওকে আর ওর দাদা চাঁদুকে মানুষ করেছে। জহিরন একা মানুষ। নিজের বলতে কেউ নেই। যুদ্ধের সময় ব্ল্যাকে কিছু টাকা করেছিল, সেই টাকাতেই তিনটে পেট কোনরকমে চলেছে। গাঁয়ের লোকে নানা কথা বলে। চাঁদুর বাপ নাকি কোন্ এক ডাকাতের দলে ছিল। ডাকাতি করতে গিয়ে বুকে সড়কি বিঁধেছিল। সেই অবস্থায় পালিয়ে এসে বাড়িতে মরে। অসুখ-টসুখ বাজে কথা। আর জহিরনের কাজই ছিল চোরাই মালের জিম্মা রাখা।

ডাকাতের মেয়ে আতর? হতেও বা পারে। ছোটবেলায় কী মিষ্টি দেখতে ছিল। এখন তার কতই বা বয়েস! তবু ভাল ঘর-বর পেয়ে এই সেদিন জহিরন সবেরে সবেরে আতরের বিয়ে দিয়েছে। জহিরনের জমানো পুঁজি অনেকদিন আগেই ফুরিয়েছে। মাটি বয়ে,

কয়লা কুড়িয়ে এখন তার কোনরকমে চলে। চাঁচুর মুখে গোঁফের রেখা উঠেছে। পড়া ছেড়ে অনেক আগেই তাকে মাংসের দোকানে কাজ নিতে হয়েছে। একা জহিরন আর টানতে পারছিল না।

আতর শ্বশুরবাড়িতে। কাঁচের চুড়ি এনেছিলাম। আর কি এখন দেওয়া যায়?

নমাজডাঙার মাঠ ঘুরে যাবো এখন সাজ্জাদদার বাড়ি। গোলবানু? যাকে আমি পাগলবানু বলে ক্ষেপাতাম সে কত বড় হল?

সাজ্জাদদার বাড়িটা ব্যঞ্জনহেড়িয়ার ওপাড়ায়। পেছন দিকে পুকুর পেরিয়ে মাঠ। তার ওপারে জলা জুড়ে ধানক্ষেত।

মোড় ঘুরতেই হঠাৎ কান্নার শব্দে বুকটা হিম হয়ে গেল। সাজ্জাদ-দার বাড়ির দরজার ঠিক সামনেই দু'চারজন লোক দাঁড়িয়ে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করার তখন অবস্থা নয়।

দরজার ভেতর দিয়ে দৌড়ে ঢুকতে গিয়ে খেয়াল হল কান্নার শব্দটা পাশের দরজায়। দু-বাড়ির দরজা প্রায় লাগোয়া।

আমাকে দেখে গোলবানু হাসল। ছুটে এল না। পরনে এখন তার ফ্রক নয়। শাড়ি। গোলবানু বড় হয়েছে।

একটু ধাতস্থ হয়ে নিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'কী হয়েছে রে ও-বাড়ি?'

ততক্ষণে কবিরণ এসে হাজির। বলল, 'ও-বাড়ির ময়নাটা মারা গেছে, দাদা।'

ময়না পাখি নয়, ছোট মেয়ে।

কবিরণ ভাত চড়াতে গেল, আমি বেরোলাম ঘুরতে।

বড় বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছি। রাস্তায় মুজির সঙ্গে দেখা।

সেই ছোট্ট মুজি। তখন ইস্কুলের নীচু ক্লাসে পড়ত। এবার আই-এ, দিয়েছিল। ইংরিজিতে আটকেছে।

ইংরিজিতে এ গাঁয়ের সব ছেলেই কাঁচা।

হবে না কেন? পড়াশুনোর রেওয়াজ সবে তো এক পুরুষে শুরু।

গাঁয়ের লোকে আগে বলত—মজুরের ছেলে, তার আবার লেখাপড়ার সখ কেন? মাকু ঠেলতে ঠেলতে তো জীবন যাবে।

ইমানী যে ইমানী, মিলের কর্তাদের সঙ্গে যার মামলা লেগেই আছে, যার বক্তৃতা শুনে শহরের ভদ্রলোক বাবুরাও হাততালি দেয়—তার দশা কী? এক কলম লিখতে বললে গায়ে জ্বর আসে। এইটুকু বয়েস থেকেই যাদের কলে কাজ নিতে হয়েছে, তারা পড়বে কখন? লেখাপড়া না হওয়ার কারণ সবটাই অভাব নয়। মাস্টারদের মারের ভয়ে ইস্কুল ছিল ছোট ছেলেদের আতঙ্ক।

আজ ব্যঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের চেহারাই আলাদা। আগে একটা চিঠি লিখতে হলে ছুটতে হত ফকির মহম্মদের ছেলের কাছে। লিখতে না জানার জন্যে লোকে ঠকেছেও খুব।

এখন চিঠি লেখার লোক বলতে গেলে ঘরে ঘরে আছে। এই ক'বছরে ম্যাট্রিক পাশের সংখ্যাও এ গ্রামে নেহাৎ কম হল না।

বজবজ মিলের হারাণ নস্কর একবার অতুলদার লজ্জা পাবার গল্প বলেছিলেন। একই লাইনে থাকেন, হারাণদার সঙ্গেই কাজ করেন অতুলদা। সেবার অতুলদা গিয়েছিলেন হারাণদার দেশের বাড়িতে বেড়াতে।

হারাণদার মেয়ে পাঠশালায় পড়ত। অতুলদার এমনি পোড়া কপাল যে, আর কাউকে না পেয়ে অতুলদাকেই ধরে বসল, 'কাকা, এই জায়গাটা একটু বলে দাও তো।'

অতুলদা পড়তে জানে না শুনে সোজা বাবার কাছে গিয়ে সে অবাক হয়ে বলল, 'বাবা, তোমার অত বড় বুড়োধাড়ি বন্ধু—বলছে পড়তে জানে না?'

সেবার বজবজে ফিরে এসে বুড়ো অতুলদা বর্ণপরিচয়ের পেছনে দিন কতক খুব আদাজল খেয়ে লেগেছিল।

হারাণদার সেই মিষ্টি টরটরে মেয়েটা ক'মাস আগে মারা গিয়েছে শুনলাম। কলকাতার হাসপাতালে যখন ছিল, তাকে আমি একদিন

দেখতে গিয়েছিলাম। এখনও তার মুখটা ভুলি নি।

পুকুর পাড়ে আমিনার দাদার সঙ্গে দেখা। ভুল হয়েগেল জিজ্ঞেস করতে ওদের বুড়ো বাপ আজও বেঁচে আছে কিনা।

বুড়ো দিনরাত ঠকঠকি তাঁতে গামছা বুনত। আর তার জামাই সেই গামছা হাটে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করে আসত। তাছাড়া জলপড়াটড়া ঝাড়ফুঁকটুক এ সবের জন্যেও গাঁয়ের লোক মাঝেসাঝে তার কাছে আসত। কত কী পয়সা পেত জানি না। কিন্তু গাঁয়ে আর কারো বাড়িতে অত অভাব দেখি নি। আমিনার বাবার চেয়ে আমিনার মা বয়সে অনেক ছোট। বেচারির শাড়ি এত উলিঝুলি ছেঁড়া ছিল যে, ঘরের বাইরে বেরোতে পর্যন্ত পারত না।

আমিনার দাদার যা একটু রোজগার হত শীতের সময় খেজুর গাছ কেটে। তারপর কী করত সে-ই জানে। রাত্তির বেলায় ছোট ছোট মাটির কলসি কোথায় যেন বয়ে নিয়ে যেত। যে রাত্তিরে কাজ থাকত না, অন্ধকারে চুরি করে পুকুরে মাছ ধরত।

আমিনার দাদা হেসে বলল, বিহারের কোনো এক জায়গায় এতদিন সে ছিল। কারখানায় কাজ করছিল। কাজটা চলে যাওয়ায় আবার এখন বেকার।

আমিনার বিয়ের পর থেকে ওদের আর এখন হাড়ে দুর্বো গজিয়ে যাবার মত অবস্থা নেই। দুমুঠো জুটছে।

আমিনাকে বিয়ে করেছে নোয়াখালির যে বুড়ো জাহাজী, তাকে ভাল লোকই বলতে হবে। দেশে তার বউছেলে আছে। কিন্তু এখানেও একটা দরকার বলেই আমিনাকে সে বিয়ে করেছে। আমিনাদের ঘরদোর ছাওয়া—সেই সব করিয়েছে। বুড়োর শুধু একটা দোষ। আমিনাকে কিছুতেই ঘরের বাইরে যেতে দেয় না। তাকিয়ে দেখলাম আমিনাদের খোলামেলা বাড়ির চারদিকে জেলখানার পাঁচিলের মত দেয়াল উঠেছে।

কালোকুচ্ছিত হলে কি হয়, পাড়া-পড়শীরা বলে আমিনার কপাল ভাল।

এ গাঁয়ের মেয়েদের এই এক দুর্ভোগ। বিয়ে হলেই যে মা-বাপ হাঁফ ছেড়ে বাঁচবে তার উপায় নেই। হঠাৎ একদিন বাপের বাড়িতে মেয়ে এসে কেঁদে পড়ল, স্বামী তাকে ফেলে পালিয়েছে।

এ রকম স্বামী-পালিয়ে-যাওয়া মেয়ে এ গাঁয়ে খুঁজলে অনেক পাওয়া যাবে। স্বামীরা কেন যায়? কোথায় যায়?

এই চলে যাওয়ার পেছনে যতটা না হৃদয়হীনতা, তার চেয়েও বেশী থাকে পরিবার প্রতিপালনের অক্ষমতা। এমনও আছে স্বামী-স্ত্রীতে খুব ভাবভালবাসা ছিল; নিখোঁজ স্বামীর জন্যে পরিত্যক্তা স্ত্রী শুধু কেঁদে বুক ভাসায়, কোনো নালিশই করে না। কেউ কেউ অপেক্ষা করে, কারো কারো স্বামী আবার ফিরেও আসে।

কোনো কোনো ক্ষেত্রে এটা বিবাহ-বিচ্ছেদেরই একটা ধরন। এভাবে ছেড়ে পালানোয় স্বামীর দিক থেকে বিয়ের দেনমোহরের টাকাটা ফাঁকি দেবার সুবিধে হয়।

স্বামীরা যাদের ছেড়ে পালায়, সেই মেয়েদের কী অবস্থা হয়? বাপ-ভাইয়ের সংসারে বোঝা হতে কে-ই বা চায়? আর কে-ই বা দেয়?

তখন সামনে দেহ বিক্রীর রাস্তাটাই শুধু খোলা থাকে।

হপ্তাবাজারের কাছে বড় রাস্তা থেকে নেমে বাঁদিকে যে বস্তি, সেখানে মোক্ষদাকে পাবেন। মোক্ষদাকে এখন বুড়িই বলা চলে। পান দোক্তা খেয়ে দাঁতগুলো ক্ষয়ে ঝামার মত হয়ে গেছে। হেঁড়ে গলা। চটকলে কাজ করে। যাকে জিজ্ঞেস করবেন সেই বলবে মোক্ষদা মানুষ বড় ভাল। এ-পেশার সঙ্গে তার পুরনো পেশার কোনো মিলই নেই। দেশ থেকে গরীব ভাইয়ের ছেলেটাকে আনিয়ে নিজের কাছে রেখে ইস্কুলে পড়াচ্ছে। মোক্ষদাকে দেখে মনে হবে ছেলেটা যেন তারই। ভোরে উঠে নিজে হাতে রেঁধে বেড়ে রেখে মোক্ষদা কাজে যায়। কাজ সেরে আসতে সেই সন্ধ্যে। এসেই আবার উনুন ধরিয়ে রান্না। মোক্ষদার

কথা শুনে মনেই হবে না তার কোনো কষ্ট হচ্ছে।

বুড়ো জাহাজীকে বিয়ে না করলে আমিনার কী দশা হত ?

আইসক্রিমের ফেরিওয়ালা ছেলেটাকে দূর থেকে দেখে হাঁতুদার ছেলে বলে ভুল করেছিলাম। কাছে আসতে দেখলাম সে নয়।

তাছাড়া হাঁতুদার ছেলে হবেই বা কী করে ? এই ক'বছরে নিশ্চয় সে মাথায় আরও বড় হয়েছে। এখনও কি সে আইসক্রিম ফেরি করে ?

একদিন শুনেছিলাম ওপারে বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরে হাঁতুদা কলেরায় মারা গেছে।

হাঁতুদার চেহারা ভোলা যায় না।

পরনে খাঁকির তেলকালিমাখা হাফ প্যান্ট। তার ওপর গোল-গলা ফতুয়া। পায়ে টায়ারের চটি। কোমরে গোঁজা চটকলের ধারালো চকচকে খোলা ছুরি। কতদিন বলেছি বেকায়দায় ঐ ছুরি পেটে গিঁথে গিয়েই হাঁতুদার কপালে একদিন মরণ আছে। হাঁতুদা শুনে কথাটা হেসেই উড়িয়ে দিত।

হেসে উড়িয়ে দেবার একটা ধরন ছিল হাঁতুদার। তেলতেলে টেকো মাথাটায় ঝট করে একবার হাত বুলিয়ে নিত।

হাঁতুদা মারা যাবার পর হাঁতুদার বউ পড়ল বিশ বাঁও জলে। আগে যাদের কেউ কখনও দেখে নি হাঁতুদার সেই ভাগ্নেরা হাঁতুদার সার্ভিসের পাওনা সমস্ত টাকা আইনমতেই হাত করে নিল।

কী ক'রে ?

সেই প্রথম শুনলাম। হাঁতুদার বউ নাকি বিয়ে-করা বউ ছিল না। হাঁতুদা তাকে লাইন থেকে ঘরে তুলে এনেছিল।

হাঁতুদার বউ কতদিন আদর ক'রে আমাদের নিজে হাতে চা ক'রে খাইয়েছে। ছেলেপুলেগুলো ছিল আমাদের ভারি অনুগত।

আইন যে এমন একচোখো হয়, হাঁতুদা জানত না ?

হাঁহুদা সত্যিই যাদের ভালবাসত, সেই ছেলেবউ কোথায় ভেসে গেছে কেউ বলতে পারল না। ওদের তিন কুলে কেউ ছিলও না।

গোলবান্নুদের বাড়িতে ফিরতে ঢের বেলা হয়ে গেল। ভেবে-ছিলাম একবার আবেল সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসব। একে পেট চোঁ-চোঁ করছে, তার ওপর আকাশে গুড়গুড় করছে মেঘ। আবেল সাহেবের কানের যা অবস্থা, তাতে আমিও চেঁচাতে পারব না আর আকাশও বাদ সাধবে। সুতরাং পিছু হটতে হল।

গোলবান্নুদের দাওয়াটা ভারি ঠাণ্ডা। দেয়াল জুড়ে বিদেশী পত্রিকার পাতাকাটা ছবি। হাসিখুশি গোলগাল ছেলেমেয়ে, স্বাস্থ্যোজ্জ্বল সুবেশ শ্রমিক, আদিগন্ত মাঠভরা ধান, রূপবতী মেয়ে, রূপবান পুরুষ—এমনি অজস্র ছবি। সাজাই-বাছাইয়ের মধ্যে রুচির পরিচয় আছে!

এই দাওয়ায় এককালে দিনের এই সময়টাতে মেয়েদের পাঠশালা বসত। সারা বাড়ি গমগম করত ছোট বড় মেয়েদের ভিড়ে। এখন তার পাট উঠে গেছে। পড়াতে পারে গাঁয়ে এমন মেয়ে নেই।

নাম করতে করতে সাজ্জাদদা এসে হাজির! সত্যি হয় যেন, সাজ্জাদদা যেন অনেকদিন বাঁচে।

চটকলে এখন শিফ্‌টে শিফ্‌টে কাজ। সকালে কাজ করে দুপুরটা একটু জিরেন, আবার সন্ধ্যেয় কাজে লেগে রাত তক ঘানিতে।

অনেকদিন পরে দেখছি। খাটুনির চাপে লোকটা দিন দিন শুকিয়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে। মুখে কিন্তু সব সময় হাসি লেগে আছে।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়েস হল সাজ্জাদদার। চোদ্দ বছর বয়সে মিলে ঢুকেছিল। কাজের বয়সই আজ একত্রিশ বছর। কত হপ্তা পায় সাজ্জাদদা? বিশ্বাস করুন, সত্যিই ষোল টাকা দশ পয়সা।

বাড়িতে খেতে পরতে চারজন মানুষ। স্বামী-স্ত্রী, ছেলে-মেয়ে। হপ্তায় চালই লাগে পনেরো সের। চাল কিনতেই তো প্রায় পুরো হপ্তাটা বেরিয়ে যায়। সর্ষের তেলকে পল্লীঅঞ্চলে বলে ছাঁচি তেল।

তিন ছটাক ছাঁচি তেলে হপ্তা চালাতে হয়। কাঁচা বাজার হপ্তায় এক টাকার। মাছ-টাছ হয়ই না। পান-স্থপুরি-দোক্তার খরচটা যা একটু কবিরণের বেশী। হপ্তায় আট আনা। কবিরণ যে আবার ভাল পান সাজে। ফলে, ওর আরও মরণ। বাড়িতে পা দিয়েই লোকে পান চায়। চা খায় তিনজন। তাও সারাদিনে একবার। সাজ্জাদদার বিড়ির খরচ লোক-লৌকিকতা ধরে হপ্তায় ত্ বাণ্ডিল। দিনে তিন পয়সারও কম।

এদিকে গোলবানুরও এবার বিয়ে দিতে হয়। পাড়ার লোকে তো এরই মধ্যে কথা শোনাতে আরম্ভ করেছে। গোলবানুর ভাবনায় কবিরণের এই বয়সেই চুল সাদা হয়ে যাচ্ছে।

গোলবানুর দাদা আহম্মদ স্কুল-ফাইনাল পরীক্ষা দিয়েছিল। ও-ই এখন সাজ্জাদদার ভরসা। পাশ করতে পারে নি। এ গাঁয়ের সবাই যা, আহম্মদও তাই। ইংরেজিতে কাঁচা। না বাড়িতে, না গোটা গাঁয়ে —সাহায্য করবার কেউ নেই।

আহম্মদ এখন রুটির দোকানের সাইকেল-ভ্যান চালাচ্ছে। ভোরে বেরোয়। বেলায় ফিরে রুটির দোকানেই ছুটো নাকে-মুখে গুঁজে নেয়। বিকেলে বেরোয় আর ফিরতে ফিরতে রাত দশটা। ভেবেছিল এবারেও পরীক্ষায় বসবে একবার। কিন্তু বই মুখে করবে কখন?

রেজোয়ানের রুটির দোকানে আহম্মদকে ধরব বলে বেরোলাম। ঐ সঙ্গে বিকেলে সেনপুকুরেও একটু ঘুরে আসা যাবে।

রুটির দোকানে পা দিতেই মাথায় আকাশ একেবারে ভেঙে পড়ল।

আহম্মদ সবে ফিরেছে। সেই ছোট্ট আহম্মদ। কবিরণের হাতের গুণে বেশ জোয়ান জোয়ান দেখতে হয়েছে। বাপের কাছ থেকে আর কিছু না পাক, হাসিটা পেয়েছে।

রেজোয়ান তার দুঃখের কথা শোনাল। তার এই ছোট্ট রুটি কারখানাটা মন্দ চলছিল না, কিন্তু ময়দার যা বাজার পড়েছে তাতে এখন টিঁকে থাকা যাবে বলে মনে হচ্ছে না। যে ময়দার সরকারী বাঁধা দর

একুশ টাকা আর বিশ টাকা বার আনা, সেই ময়দা আসলে কিনতে হচ্ছে সাড়ে চব্বিশ টাকা আর সাড়ে তেইশ টাকা মণ দরে। মহাজন যে বিল দেয়, তাতে ন্যায্য দরই লেখা থাকে—বাড়তি দামটা বিল লেখাবার আগেই চুকিয়ে দিতে হয়।

বড় বড় বেকারির এসব হাঙ্গামা নেই। তারা সরাসরি মিল থেকে বিশ টাকা বার আনা দরেই মাল পায়।

ছোট ছোট বেকারিগুলোরই মরণ। ফ্রী স্কুল ষ্ট্রীট থেকে রোড পারমিট নিয়ে বড়বাজারে মহাজনের আড়ৎ থেকে মাল আনতে পুরো একটা দিন চলে যায়। লরীতে মাল আনতেই তো সপ্তাহে পঁচিশ টাকা খরচ। ময়দা ছাড়াও দর সব জিনিসেরই বেড়েছে। আগে তু হন্দর সাল্ট্ বা অ্যামোনিয়াব দব ছিল উনআশী টাকা, এখন একশো টাকা। চিনির দাম মণে দশ টাকা বেড়েছে। ভেজিটেবল ঘিব সতেরো সেবী টিন পিছু দব তিন টাকার ওপব বেড়েছে। হপ্‌স বা ঈস্ট-এর প্যাকেট আগে ছিল তু টাকা বার আনা ; এখন আঠাবো টাকা। কিসমিসের দব মাঝে তো পঞ্চাশ টাকা থেকে লাফিয়ে একশো বিশ টাকায় উঠেছিল।

রেজোয়ানের ছোট কারখানা। তাবা তিন ভাই নিজেবা গতবে খাটে। সাইকেল-ভ্যান আছে তুটো। চারজন হকার। আট জন কারিগর।

দোকানে এখন দৈনিক দশ-বারো টাকা লোকসান। কারখানা বন্ধ করলে লোকসানের ভাগটা কিছু কমে। কিন্তু খদ্দের হারাবার ভয়ে বন্ধও করা যাচ্ছে না। কারণ, এমনিতেই তো বড় বড় বেকারিব পাশে ছোট ছোট বেকাবিগুলো টিঁকতে পারছে না।

এক সময়ে এই রেজোয়ানেব খুব ভাল আবৃত্তির গলা ছিল।

নজরুলের 'বল বীর, বল চিরউন্নত মম শিব' ওর গলায় শুনতে শুনতে গায়ের লোম খাড়া হয়ে উঠত।

আবৃত্তি করতে রেজোয়ান এখনও পারে নিশ্চয়।

আকাশের দিকে তাকিয়ে ভারি রাগ হল। আমি যে পুরো দিনটা

বজবজে ঘুরব বলে এসেছিলাম।

জলের একেকটা ঝাপটা চাবুকের মত সপাং সপাং করে বন্ধ দরজায় এসে লাগছে। নতুন মেশিন পিছু দুজন সহকর্মী হারানো চটকলের মজুরের মত তার রাগ ফেটে পড়ছে।

বুঝলাম মেঘবৃষ্টিতে মুখ ঢেকে বজবজ আজ সারাটা দিনই গোঁজ হয়ে থাকবে।

না, আর কখনও আসতে এত দেরি হবে না—মনে মনে এই প্রতিজ্ঞা জানিয়ে ভিজতে ভিজতে বৃষ্টির মধ্যেই চড়িয়ালের সাঁকো থেকে ফেরবার বাস ধরলাম।

ছুরি কাঁচি ট্র্যাক্টর

বর্ধমান থেকে লুপ লাইনে বনপাশ। স্টেশনে টিম টিম করছে কেরোসিনেব বাতি। নামবাব সময় অন্ধকাবে হুমড়ি খেয়ে পড়ে যেতে যেতে হঠাৎ টেব পেলাম প্ল্যাটফবমের বালাই নেই। হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে গজরাচ্ছে মালগাড়িব ইঞ্জিন। তাব নাকেব সামনে দিয়ে ধোঁয়া মাড়িয়ে হুড়মুড় করে সবাই ছুটছে ; বেল-লাইনেব কাঁধ বরাবর নীচু তারগুলো পায়ে লেগে ঝুমুর ঝুমুর শব্দ উঠছে। বেড়া টপকাতে পারলেই গুটিকয়েক সাইকেল রিক্সা ; যাদের মোটঘাট আব লোক বেশী, তারা নেবে গরুর গাড়ি।

এই স্টেশন আর তাব তিন মাইল তফাতে বনপাশ গ্রাম। মধ্যিখানে খাঁ খাঁ করছে মাঠ ; ধারেকাছে লোকালয়ের কোনো চিহ্ন নেই। স্টেশনের হাতা পেবিয়ে গেলে দু-একটা পানবিড়ি আর চা-মিষ্টির দোকান। তারপব আবার দুর্ধর্ষ অন্ধকার।

গায়ে গায়ে রিক্সা ; সওয়ারীদের নাচাতে নাচাতে নিয়ে চলেছে। সামনে একটিমাত্র আলো। রাস্তা কাঁচা না পাকা, তা ঠাহর করবার উপায় নেই।

রাস্তার দু-পাশে ছায়া-ছায়া দেখা যায় ফসলের জমি। তার কোল ঘেঁষে ক্যানেলের জল।



হাওয়ায় একটু-আধটু শীতের আমেজ। অথই অন্ধকারে অফুরন্ত রাস্তা। সামনে-পেছনে সওয়ারীদের টুকরো টুকরো কথা।

অন্ধকারে রিক্সাগুলো মোড় ঘুরতেই হঠাৎ চোখ ধাঁধিয়ে গেল। যেন সোনার টোপর মাথায় দিয়ে বন থেকে বেরিয়ে এল ইলেকট্রিকের আলো।

এরই নাম বনপাশ। লোকে বলে কামারপাড়া। বাংলার বাইরেও এ গ্রামের নামডাক।

কামারপাড়া গ্রাম কে বলবে? গায়ে গায়ে লাগাও দোতলা বাড়ি। বেশির ভাগ বাড়িই মাটির। দু-পাশে সরু সরু ঠিক যেন কাশীর গলি। ভেতরে ঢুকলে দিশেহারা হয়ে যেতে হয়। গ্রামের মধ্যে কোথাও কোনো ফাঁকা জায়গা নেই। গোল্লাছুট খেলতে গেলেও ছেলেপুলেদের গাঁ ছেড়ে বাইরে আসতে হবে।

এখানে সেখানে ভাঙা দেউলের ছড়াছড়ি। মন্দিরের গায়ে পোড়ামাটির অজস্র মূর্তি আর নক্সা। কোথাও সাবেকী বাংলা হরফে লেখা দুর্বোধ্য ফলক।

এক অবিশ্বাস্য রকমের গ্রাম এই কামারপাড়া। অলিগলির মধ্যে সাজানো দোকান। রোজকার রোজ বাজার। রাস্তায় গিজগিজ করছে লোক।

লম্বায় মাইলখানেক, চওড়ায় আধ মাইলও হবে না; অথচ এইটুকু পরিধির মধ্যে সাড়ে চার হাজার লোকের বাস। সারা ইউনিয়নে মোট যত লোক, তার বারো আনা একা এই গাঁয়ে।

নামই বুঝিয়ে দেয় এ গাঁয়ে কর্মকারদের বাস। কিছু আছে বামুন, বাগ্দী, সাঁওতাল।

এখানকার পত্তন নিয়ে এ অঞ্চলে একটা কিংবদন্তী আছে। গল্পটা মোটামুটি এই রকম:

মুর্শিদাবাদের নবাব একদিন রাজবাড়ির বাগানে বেড়াতে বেড়াতে একটি কাটা গাছ দেখতে পেলেন। গাছটা গুঁড়ির ওপর সোজা হয়ে

দাঁড়িয়ে আছে। নবাব প্রহরীকে ডাকলেন। তার কাছ থেকে জানা গেল, একজন কর্মকার এসেছিল নবাবের সঙ্গে দেখা করে একটি তরোয়াল দিতে। দরবারে ঢুকতে না দেওয়ায় রাগ করে লোকটা গাছের গায়ে একটি কোপ বসায় এবং তারপর হাতের তরোয়ালটা পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে চলে যায়। পুকুরের জলে ফেলা সেই আশ্চর্য তরোয়ালটা ডুবুরি লাগিয়ে তোলা হল।

তরোয়ালের সূত্র ধরে আসল লোককে খুঁজে পাওয়া গেল। তার নাম রামগোপাল মাথুর। মিঠাপুকুরে বাড়ি। রাম মাথুব আর অনন্ত মাথুর দুই ভাই। সেকালে তাদের মতো অস্ত্র গড়তে কেউ পারত না। নিজের দরবারে ডেকে নবাব তাদের 'রায়' উপাধি দিলেন আর সেই সঙ্গে দিলেন প্রচুর জমি—ঘোড়ায় চড়ে যতটা জমি তাবা নিতে পারে।

কিংবদন্তী হলে যা হয়, এর মধ্যে সত্যি-মিথ্যে দুই জড়িয়ে আছে। মুখে মুখে গল্পটারও নানা বদল হয়েছে। তবে এটুকু ধরে নেওয়া যায় যে, এক সময়ে রাম মাথুর আর অনন্ত মাথুর ছিলেন নামকরা অস্ত্রশিল্পী। তাঁদের তৈরি তরোয়াল নাকি আজও নবাববাড়ির সংগ্রহশালায় তোলা আছে। আর তাঁদের বংশধরদের মধ্যে আজও অটুট রয়েছে নবাবের দেওয়া 'রায়' উপাধি আব চৌদ্দ শো চুরাশী বিঘা জমি।

বনপাশ ইস্কুলের হেডমাস্টার মশাইয়ের বাড়িতে বসে কথা হচ্ছিল। রায় বংশের পার্বতীবাবুর সঙ্গে। এখানে বাড়িগুলো এত ঘেঁষাঘেঁষি হবার কারণ কি জানেন? ডাকাতির ভয়। এক সময়ে এখানকার লোকের হাতে পয়সা, ঘরে সোনাদানা ছিল।

গ্রামে বৃত্তি বদলের ইতিহাসটা ভারি মজার। কর্মকারের বাস হলেও এখন বেশির ভাগ ঘরেই হয় সোনা-রুপোর কাজ। ঝরিয়া, ধানবাদ, কাতরাসে যেমন, তেমনি আসানসোল, বর্ধমান আর কলকাতায় গিয়ে এখানকার কারবারীরা সোনা--রুপোর দোকানে গিয়ে কাজ করে। কামারের এক ঘা কী করে সেকরার ঠুকঠাকে দাঁড়িয়ে গেছে তার পুরো

ছবি এখন আর পাবার উপায় নেই। এই বদল হয়েছে ধাপে ধাপে।

লোহার হাতিয়ার থেকে সরে গিয়ে কাঁসার বাসন; কাঁসার বাসন থেকে সরে গিয়ে পিতলের গহনা আর মাত্রলি-তাবিজ; তারপর পিতল বদ্‌লে সোনা-রুপো। এমনি করে বাজারের হালচাল দেখে এখানকার লোকের পেশা বদলেছে।

বাজারের রাস্তায় ধরণী চক্রবর্তীর সঙ্গে আলাপ হল। গ্রাম থেকে বাসন কিনে শহরে বেচে আসা তাঁর কাজ। বছর পঞ্চান্ন বয়স। বললেন, ছেলেবেলায় ঠং ঠং শব্দে রাত্তিরে ঘুম হত না। কাজ যা হত সব সন্ধ্যের পর। সারা রাত কাজ করে সকালবেলায় লোকে শুতে যেত।

আগে এ-গাঁয়ে দুশো আড়াই শো ঘর লোক বাসনের কাজ করত। একেক ঘরে দু তিনটে করে কুঁদ ছিল। যুদ্ধের সময় থেকেই বাসনের কারবার ঘা খেতে আরম্ভ করে। তামার সঙ্গে দস্তা মিশিয়ে পিতল। রাং মিশিয়ে কাঁসা। পিতলের সঙ্গে মেশালের তারতম্যে হয় নকল কাঁসা বা ভরণ। তামা, রাং, দস্তা, সিসে—যুদ্ধের সময় এ সব পাওয়াই যেত না। ফলে অনেককেই কারবার গোটাতে হয়েছিল। মোক্ষম ঘা এল দেশ ভাগ হবার পর। বাসনের বড় বাজার ছিল উত্তর আর পূর্ব বাংলা। পাকিস্তান হয়ে সে বাজার [illegible] হয়ে যাওয়ায় বাসন-শিল্পীদের টি঳কে থাকা শক্ত হল।

বুড়ো বয়সে আর কিছু করবার নেই বলেই টুক টাক করে বাসনের কাজ এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন সুবলচন্দ্র রায়। দুঃখ করে তিনি বললেন, বাসনের কাজ না থাকায় গ্রামের বাউড়ী বাগ্দীদের ভারি দুর্দশা। মাটির ছাঁচ তৈরি করে তারাও দু-চার পয়সা পেত।

আগে এ গ্রামে এগারো শো ঘর কর্মকারের মধ্যে পিতলের গহনার কাজ করত প্রায় ন শো ঘর। গ্রামের সধবা-বিধবারাও কাজ পেত। কমতে কমতে এখন সাত আট ঘরে এসে ঠেকেছে। তাও যা রোজগার তাতে বছর চলে না।

ব্যাবসায় যো-সো করে টিঁকে থেকেও মুকুন্দমুরারি দে-র আজ চাষই হয়েছে একমাত্র ভরসা। বিঘে কুড়ি জমি আছে। নিজে হাতে হাল দিয়ে কোনরকমে সংসারের দশটি প্রাণীর পেট চালাতে হচ্ছে।

অথচ ওঁদের চার পুরুষের কাজ পিতল আর জার্মান সিলভারের। মুকুন্দমুরারি নিজে এগারো বারো বছর আগেও বছরে তিরিশ হাজার টাকার মাল বেচেছিল।

বগুড়ার আক্কেলপুরের কাছে গোপালনাথপুরে সে সময়ে বিরাট মেলা বসত। দোলপূর্ণিমা থেকে শুরু হয়ে অমাবস্যা অবধি ছিল মেলার সময়।

সেই মেলায় দৈনিক দশ-বিশ হাজাব টাকাব জিনিস বিক্রি হত। পিতল আর তামা। কেমিকেল আর জার্মান সিলভাবের তাবিজ। গলার তক্তি। বেশর, মাকড়ি, অনন্ত আর এমনি কত যে কি গযনা বিক্রি হত তাব ইয়ত্তা নেই। সব উচ্ছন্নে গেল দেশভাগেব পব। এখন এক আনা রকমেব কাজ।

কলকাতায় হ্যারিসন রোডের একটা বাড়িতেই আগে ছিল ছাব্বিশ সাতাশটি এইরকম গহনাব দোকান। এখন সেখানে মোটে দু-তিনটে দোকান টিম টিম করছে। বাজাবে এখন চলছে সোনাব জল দেওয়া কেমিকেলেব পোশাকী গহনা। ওসব গহনা তৈবি কবতে গেলে পড়তা পড়ে বেশী। কাজটাও ফ্যান্সি ধরনেব।

বাজারের আজ এই হালচাল দেখে মুকুন্দমুবাবি তাঁব দলনা কলটাও বেচে দিয়েছেন।

ষাটেব কাছাকাছি বয়েস দোলগোবিন্দ দে-র। তাঁব পিতলেব গহনার একটা দোকান ছিল। সেটা উঠে গেছে। জোয়ান বয়সে তাঁর ঘরে সপ্তাহে আট-দশ কাহন মাদুলি হত (১২৮০ = এক কাহন)। গাঁয়ে এমন কোনো কারখানা ছিল না যেখানে রোজ হাজার জোড়া মাকড়ি তৈরি না হত।

গোড়ায় পিতলেব গহনাব কাজ কবতেন কার্তিকচন্দ্র দাস। বাপেব

আমলের কারখানা পুঁজিপাটার অভাবে উঠে যায়। পরে কারিগর হিসেবে এ-জায়গা ও-জায়গায় ভেসে বেড়ান। তারপর পোষাতে না পেরে পিতলের কাজ ছেড়ে সোনা-রুপোর কারখানায় কাজ নেন; যার পিতলের কাজ করে অভ্যাস, বেশী বয়সে সোনারুপোর কাজ সে পারবে কেন ? ফলে কার্তিক দাসকে রুজি বদ্‌লে কিছুদিন বিড়ি বাঁধার কাজ নিতে হল। এখন তিনি মুদিখানার দোকানদার।

গাঁয়ের যে গলিতেই ঘোরা যায়, এই এক ছবি। পৈতৃক পেশাগুলো আর থাকছে না। সকলেরই মুখে এক কথা : দেশভাগ হওয়াতেই এ গাঁয়ের সর্বনাশ হল।

কথাটা পুরোপুরি মানতে পারি নি। খদ্দেরের একটা বড় অংশ পূর্ব বাংলায় এটা ঠিক ; কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা হল, কাঁসা পিতলকে টেক্কা দিচ্ছে আজ স্টেনলেস ষ্টীল, সস্তা অ্যালুমিনিয়ম আর চীনেমাটির বাসন। পেনিসিলিন আর সাল্‌ফা যে তাবিজ-মাদুলির চাহিদা কমাচ্ছে না, তারই বা ঠিক কি ? গহনার ব্যাপারেও দেশের রুচি বদলে যাচ্ছে। বাজারে সস্তায় যদি কলে-তৈরি রকমারি চকচকে হালফ্যাশানের হার আর দুল মেলে, তার সঙ্গে পিতলের সেকেলে বাজু-বেশর এঁটে উঠতে পারবে কেন ?

পরদিন ট্রেণ ধরতে না পেরে বর্ধমান অবধি সারা পথ সাইকেল-রিক্সাতেই ফিরতে হল।

আসবার সময় মনে পড়ল পৌষ-সংক্রান্তির দেরি নেই। কামার-পাড়ায় যাদের বাড়ি, তারা ঐ দিন ঘরে ফিরবে। এই উৎসবে পারতপক্ষে গ্রামের বাইরে কেউ বড় একটা থাকে না।

সবাই যখন এক জায়গায় হবে তখন নিশ্চয়ই একবার ভাববে— কেমন করে আবার কামারপাড়া গ্রামটাকে গম্‌গমে করে তোলা যায়।

কাঞ্চননগরেও কর্মকারদের বাস। মরতে মরতে কিভাবে আবার তারা বেঁচে উঠছে, তার গল্প শুনলাম নিকুঞ্জ সিং-এর কাছ থেকে।

বর্ধমান শহর থেকে কাঞ্চননগরে যেতে বাঁকা নদী পেরোতে হয়। উঁচু বাঁধের পাশ দিয়ে ডান দিকে গেছে মাটির কাঁচা রাস্তা। সাইকেল-রিক্সার চাকা আটকে যায় রাস্তায় এত ধুলো। আগে এদিকটা ছিল ঘন জঙ্গলে ঢাকা। বন হাসিল করে এখন সেখানে উদ্বাস্তুরা ঘর-সংসার পেতেছে।

আট-ন' বছর আগে উদ্বাস্তুদের একজন হয়েই নিকুঞ্জ সিং এ-অঞ্চলে আসেন। বাড়ি ছিল তাঁর চাটগাঁয়।

এখানে এসে প্রসন্ন মিস্ত্রির সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। প্রসন্ন মিস্ত্রির বয়স তখন একশো পাঁচ।

বুড়ো মিস্ত্রি বসে বসে পুরনো গৌরবময় দিনগুলোর কথা বলতেন। এক সময়ে এখানেই তৈরি হত বাংলাদেশের বিখ্যাত কাঞ্চন থালা। কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচি বিলেতের প্রদর্শনীতে কতবার যে সোনার মেডেল পেয়েছে, তার ঠিক নেই। এক সময়ে দেশ-বিদেশের লোকে জানত প্রেমচাঁদ মিস্ত্রির নাম। কাঞ্চননগরকে বলা হত এশিয়ার শেফিল্ড।

সেই কাঞ্চননগরের ছুরি-কাঁচির শিল্প অধঃপতনের শেষ সীমায় এসে পৌঁচেছিল। একটিমাত্র ঘরে তখন কাজ হচ্ছিল।

একশো পাঁচ বছরের বুড়ো মিস্ত্রির কথাগুলো নিকুঞ্জ সিংএর মনে খুব লেগেছিল। কাঞ্চননগরের কারিগরদের তখন ছন্নছাড়া অবস্থা। পেটে ভাত নেই, পরণে কাপড় নেই।

নিকুঞ্জ সিং শহরে গিয়ে একে-ওকে ধরেন। কাঞ্চননগরের কথা উঠলে লোকে তেমন গা দেখায় না। বলে ওখানে গাছে কথা কয়, ওর মধ্যে গিয়েছেন কি মরেছেন।

তবু হাল তিনি ছাড়েন না। প্রেমচাঁদ মিস্ত্রির নাতি আর নাত-

জামাইকে ধরে বৈঠক করলেন। সেই বৈঠকে কমিটি তৈরি হল। ঠিক হল, কারিগরদের নিয়ে সমবায় গড়ে তুলতে হবে।

তারপর কাগজে কাগজে লেখা হতে লাগল, যাতে কাঞ্চননগর তার হৃতগৌরব ফিরে পায়। সরকার থেকে লোক এল খোঁজখবর নিতে।

কমিটির পক্ষ থেকে দু লক্ষ বিশ হাজার টাকার একটা পরিকল্পনা পেশ করা হল। কিন্তু সে পরিকল্পনায় সরকার রাজী না হওয়ায় তখন কম করে পঞ্চান্ন হাজার টাকার একটা স্কীম দেওয়া হল।

তারপর দু-তিন বছর ধরে চলল ধৈর্যের পরীক্ষা।

চুয়ান্ন সালের গোড়ায় পনেরো জন সদস্য নিয়ে সমবায় সমিতি রেজিষ্ট্রি করা হল। তার চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই গণ্ডগোল বেধে গেল। বাঙাল অ-বাঙালের ধুয়ো আর সরকারের ভয়। এর পেছনে আসলে ছিল জনকয়েক পাইকারের কারসাজি। অধিকাংশ সভ্যই সমবায় থেকে সরে দাঁড়াল। নতুন সভ্য নিয়ে সমিতিকে টিঁকিয়ে রাখা হল।

যার বাড়িতে যা হাতুড়ি-নেহাই ছিল সব এক জায়গায় জড় করে কাজ শুরু হয়ে গেল।

বছর দুই পরে যন্ত্রপাতি কেনার জন্যে সরকারের কাছ থেকে দান হিসেবে সাড়ে আট হাজার টাকা পাওয়া গেল। পরের বছর সমবায় ব্যাঙ্ক থেকে পুঁজির জন্যে যে দু হাজার টাকা ধার করা হয়েছিল, এই ক' বছরে তা শোধ হয়ে গেছে। চলতি পুঁজি, জমি কেনা, বাড়ি তৈরি —এসব বাবদ সরকারের কাছ থেকে ধার পাওয়া গেছে সাড়ে ছত্রিশ হাজার টাকা।

গোড়ায় গোড়ায় তৈরি ছুরি-কাঁচির বাজার পেতে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। কারণ ভারতের সব জায়গার ছুরি-কাঁচিতেই কাঞ্চননগরের নাম বসানো থাকে।

ভাল বাজার পাওয়া যায় বছরে ছ মাস। বর্ষায় কাটতি যেমন কমে যায়, তেমনি মেলার মরশুমে বাড়ে।

প্রথম বছরে মাল বিক্রি হয়েছিল বারো হাজার টাকার। গতবার

হয়েছে চল্লিশ হাজার টাকার। এবারে পঞ্চাশ হাজার টাকার ওপর মাল বিক্রি হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

তিরিশ-পঁয়ত্রিশ জনকে নিয়ে শুরু করে কারখানায় এখন মিস্ত্রির সংখ্যা সত্তর-পঁচাত্তর জনে ঠেকেছে। সব কারিগরই স্থানীয়। যারা ব্লেড তৈরি করে, তাদের রোজ হয় আট টাকা ; যারা পালিশ করে তাদের এক টাকা দেড় টাকা। গড়ে কাজ আট-ন ঘণ্টা ; গড়ে রোজগার আড়াই টাকা-তিন টাকা।

সমবায় হবার আগে লোকগুলো ছিল একদম বেকার। শাক-সব্জি বেচে কোনরকমে দিন চালাত। অনেকেরই অবস্থা এমন ছিল যে, পরনের কাপড় কিনে দিয়ে তবে তাদের কাজে বসাতে হয়েছিল।

সন্দেহবশে কিংবা ভুল বুঝে গোড়ায় যারা সমিতির বিরুদ্ধে গিয়েছিল, তারা সবাই আজ সমবায়ের মধ্যে।

এ ছাড়াও বাঁকুড়ার সাহাজপুর, বর্ধমানের বেলগাঁও, বিরিটিকরি, রায়ান ইত্যাদি জায়গায় পঞ্চাশ-পঞ্চান্ন জন মিস্ত্রি সমবায়ের তত্ত্বাবধানে কাজ করে।

কাঞ্চননগরের পুরনো গৌরব সমবায়ই আজ ফিরিয়ে আনছে। কিন্তু এখনও মুশকিল আছে অনেক।

বাজারে কাঁচা মালের দাম বহুগুণ বেড়েছে। দু বছর আগে যে ক্যানিং লাস্টারের ডজন ছিল কলকাতায় পনেরো টাকা, এখন তার দাম পঞ্চাশ টাকা। বর্ধমান থেকে কিনলে আরও ছ টাকা বেশী পড়ে। ইস্পাত তো পাওয়াই যায় না। সুতরাং বাজার থেকে বাজে ইস্পাতের ছাঁট কিনতে হয়। তার অর্ধেকই বাদ যায়। দামও আবার আগের চেয়ে আড়াই গুণ বেশী। যে ফাইলের দাম ছিল এক টাকা দেড় টাকা, এখন তার দাম পাঁচ টাকা। তাও ভাল ফাইল পাওয়াই যায় না।

তিন-চার বছর আগে যেখানে এক ডজন ছুরির পড়তা পড়ত সাড়ে তিন টাকা-তিন টাকা বারো আনা, এখন সেখানে পড়তা পড়ছে চার টাকা বারো আনা। আগের চেয়ে দাম বাড়াতে হয়েছে। তার ওপর

সেলস্ ট্যাক্সের ঝামেলা। ব্যক্তিগত ব্যাবসাদারদের গা বাঁচানোর যেসব চোরাগোপ্তা উপায় আছে, সমবায় সেদিক থেকে নিরুপায়। ফলে তাকে অসমান প্রতিযোগিতায় মারা পড়তে হচ্ছে।

নিকুঞ্জ সিং ঘুরে ঘুরে কারখানা দেখালেন। মেশিনের ঘর্ঘর শব্দে মনে হচ্ছিল যেন কাঞ্চননগরেব প্রাণের স্পন্দন শুনছি।

গেটের সামনে দাঁড়িয়ে দুজন মিস্ত্রির সঙ্গে কথা হল। দুঃখের দিনগুলো তাঁদের সারা শরীরে দশ আঙুলের দাগ রেখে গেছে। দুঃখের খানিকটা আশান হয়েছে এখন। আশা হয়, ভবিষ্যতে হয়ত এর চেয়ে আরও ভাল দিন আসবে।

বর্ধমান থেকে কালনার বাসে হাটগোবিন্দপুর। সেখান থেকে সাইকেলে সড্যা। মাঝে একটি বড় গ্রাম বড়শুল। মাঠের মধ্যে সরু সুতোর মত মায়া নদী।

সড্যায় চাষীদের নামকরা সমবায়। এত ভাল সমবায় নাকি খুব কম আছে।

খুঁজে বার করলাম মৃত্যুঞ্জয় কোঙারকে। গ্রামের মধ্যে ছোট্ট মুদিখানার দোকান। তখনও তাঁর স্নানখাওয়া হয় নি। বাড়িতে নিয়ে গিয়ে বসালেন।

যে ঘরে বসলাম, সে-ঘরে আপাতত এসে আছেন সরকারের শিল্প বিভাগের একজন ট্রেণার। বছর খানেক হল এ-গাঁয়ে তাঁতের একটি কর্মকেন্দ্র খোলা হয়েছে। সেই সূত্রেই তাঁর এখানে আসা।

পাচটা তাঁত নিয়ে শুরু হয়েছিল, এখন সে জায়গায় এগারোটা তাঁত। কাজ শিখতে দু-তিন মাস লাগে। কাজ শিখে গেলে ছেলেরা দিনে ছ-সাত ঘণ্টা খেটে মাসে চল্লিশ থেকে ষাট টাকা রোজগার করতে পারে। মেয়েরা দিনে দু-তিন ঘণ্টা খেটে রোজগার করতে পারে মাসে পনেরো থেকে তিরিশ টাকা। যারা কাজ করে সবাই চাষীর ঘরের ছেলেমেয়ে। দুজন পূজারী ব্রাহ্মণও কিছুদিন কাজ শিখেছিল। কিন্তু

শেষ অবধি কাজটা ঠিক পছন্দ করে উঠতে পারে নি।

গ্রামের যারা ছোট জাত, তাদের বাড়ি থেকে তাঁত শিখতে কেউ আসে না। একে সারাক্ষণ পেটের ধান্ধা, তার ওপর সমাজে ছোঁয়াছুয়ির বিচার। গোড়ায় গোড়ায় সাধারণ চাষীর ঘরের মেয়েদেরও সহজে কর্মকেন্দ্রে আনা যায় নি। যেসব পরিবারে রাজনীতির চর্চা আছে, তাদের বাড়ির মেয়েরাই কর্মকেন্দ্রে যাওয়ার চক্ষুলজ্জাটা প্রথম ঘুচিয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয় কোঙারকে নিয়ে গ্রাম দেখতে বেরোলাম। মাটির বাড়ি যে এত সুন্দর হতে পারে, আগে ধারণাতেই ছিল না। ঝক ঝক করছে দেয়াল, নিকোনো পরিপাটি উঠোন। কোথাও একটু কুটো পড়ে নেই। দরজায় মণিপদ্মের রঙীন আলপনা।

যেতে যেতে সমবায়ের কথা হচ্ছিল। গ্রামে দুশো ঘর লোকের মধ্যে মোটে চৌত্রিশ ঘর এই সমবায়ের মধ্যে। সমবায়ের জমি হাজার বিঘার কাছাকাছি। চব্বিশ একরের বেশী এবং দু একরের কম কারো জমি নেই। অধিকাংশের জমিই সাত থেকে আট একরের মধ্যে।

চব্বিশ হাজার টাকা দিয়ে সমবায় দুটো ট্র্যাক্টর কিনেছে। গোয়াল-ঘরের সামনে টিনের চালের নীচে ট্র্যাক্টর দুটো দেখলাম। গোড়ায় ছ-সাত টাকা রোজ আর খোরাকী দিয়ে বাইরে থেকে ড্রাইভার আনতে হয়েছিল। এখন ট্র্যাক্টর চালায় গ্রামেরই লোক। তাদের চারজনকে বছরে মাথা-পিছু পাঁচশো টাকা করে দিতে হয়। বছরে গড়ে চার মাস কাজ।

ছড়ানো ছিটানো জমি বলে সমবায়ের সব জমিতে ট্র্যাক্টর দিয়ে চাষ করা যায় না। এসব অসুবিধে সত্ত্বেও জমির ফলন বেড়েছে, চাষের খরচও কিছু কমেছে।

কিন্তু মেরামতির খরচ বছরে তিন-চার হাজার টাকার কম নয়। কোম্পানীর কাছ থেকে মেকানিক আনাতে হয়। তাতে আনুষঙ্গিক খরচও বেশী পড়ে, সময়ও বেশী যায়। অথচ এ-জেলায় ট্র্যাক্টরের সংখ্যা যখন ত্রিশ-পঁয়ত্রিশের কম নয়, তখন সদরে ট্র্যাক্টর মেরামতের

সরকারী একটা ব্যবস্থা রাখলেই তো হয়।

এত কিছু দেখানো শোনানোর পর সমবায়ের একজন সভ্য বললেন, এখন আমরা সমবায় তুলে দিতে পারলে বাঁচি। শুনে অবাক হয়ে তাকালাম। কারণ, একটু আগেই তাঁরা বলছিলেন, সমবায় করে লাভ হয়েছে।

মৃত্যুঞ্জয় কোঙার ব্যাপারটা ভেঙে বললেন। আলাদা আলাদাভাবে ধরলে সমবায়ের কোনো সভ্যই কৃষি-আয়করের গণ্ডীর মধ্যে পড়েন না। কিন্তু মোট জমি প্রায় হাজার বিঘা হওয়ায় সমবায়ের ঘাড়ে গোড়ার বছরে আট হাজার এবং পরেকার বছরগুলোতে ষোল হাজার টাকা করে আয়কর দেবার দায় এসে পড়েছে। এ টাকা দিতে গেলে সমবায়ই শুধু উঠবে না, চাষীদের ভিটেমাটি ধরে টান পড়বে। এ পর্যন্ত অনেক লেখালেখি, অনেক দরবার করেও কোনো ফল হয় নি। আইন না বদলালে সমবায়ের চাষীদের বাঁচবার কোনো রাস্তা নেই।

অনেক উৎসাহ নিয়ে গিয়েছিলাম। ফেরবার সময় মনটা খারাপ হয়ে গেল।

সন্ধ্যের সময় হাটগোবিন্দপুর থেকে বর্ধমানে যাবার শেষ বাস। মাঠের ভেতর দিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে সাইকেল চালাচ্ছি। অন্ধকার ঘনিয়ে ওঠার আগেই পৌঁছতে হবে।

যেতে যেতে ভেতর থেকে অনেক দিনের পুরনো একটি বিশ্বাস হঠাৎ মাথা-চাড়া দিয়ে উঠল। মানুষকে অত সহজে মেরে ফেলা যায় না।

হাটগোবিন্দপুরে আলো জ্বলতে জ্বলতে আমি পৌঁছে গেলাম।

মানচিত্র ও মানহানি

বেথুয়াডহরীর মাঠরাস্তায় এসে সাইকেল থেকে নেমে পড়তে হল।

দহ থেকে ডহর। অগাধ জল যেখানে। যেমন বেতোয়া, তেমনি বেথুয়া কি বেত্রবতী থেকে? বেথুয়াডহরী কি বেত্রবতীর দহ?

অসম্ভব নয়। ন'টা দ্বীপ নবদ্বীপ। নদীয়া তো নদীনালারই দেশ ছিল। হাজার দুয়েক বছর আগেকার সে ছবি মিলবে টলেমির মানচিত্রে। গাঙ্গেয় উপত্যকার দক্ষিণে কত না দ্বীপ—সেখানে জলে-জালে-বাঁধা জেলেমাঝিরা থাকত।

মরুভূমিতে মরীচিকার মত আজ সে সব স্মৃতি।

বালিতে চাকা আটকে যাচ্ছে। সাইকেল ঠেলে ঠেলে নিয়ে চলেছি। কাছে কিংবা দূরে কোথাও জলের কোনো নিশানা নেই। চারিদিকে শুকনো ঠন ঠন করছে ডাঙা। যতদূর দৃষ্টি যায়, শুধু ক্ষুরের মত ধারালো কুশের বন। মাঝে মধ্যে পাটকিলে রঙের মেস্তার ছিটে-ফোঁটা। মাঠের বুকের ওপর দিয়ে গট গট ক'রে চলে গেছে বিনা বাঁধের রেল-রাস্তা। এখানে বর্ষায় পায়ের পাতা ডোববারও ভয় নেই।

বিশ্বাস মশাই ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখাচ্ছিলেন।



রাস্তার জন্যে মাটি কাটা হয়েছিল, এক জায়গায় তার গর্ত। বিশ্বাস মশাই গর্তটার পাশে উবু হয়ে বসলেন।

—এই দেখুন, ওপরের এক ফুট বাদ দিয়ে কালো কালো দোআঁশ মাটি। পাথরের মত শক্ত। কোদাল বসালে ঠং ক'রে উঠবে। তার ফুটখানেক নীচে দেখুন ঝুর ঝুর করছে বালি। তারপর যত খুঁড়বেন তত বালি। বালির তল খুঁজে পাবেন না। মাঠে জল দাঁড়াতে পারে না, ঐ বালিই সব শুষে নেয়। আর এই দেখুন কিভাবে গেছে কুশের শেকড়—

খবরগুলো খুব নতুন নয়। বেলেমাটির অভিশাপে এ জেলার এ চেহারা অনেকদিনের।

একেই জমির উর্বরাশক্তি কম, জল সেচের ব্যবস্থা নেই, তার ওপর স্বত্বস্বাবি আব উটবন্দী প্রথায় প্রজা-বিলি—ফলে এখানকাব গাঁয়েব মানুষ অনেকদিন থেকেই দেশছাড়া হচ্ছিল। চাষ-কবা লোকেব সংখ্যা এ জেলায় লোকসংখ্যার অনুপাতে কমই ছিল।

দশ বছব আগে যা ছিল, নদীয়ায় লোকসংখ্যা এখন প্রায় তার দেড়া। কারণটা বোঝা শক্ত নয়। প্রতি দুজন অন্তর একজন করে বাইরে থেকে আসা উদ্বাস্তু। যেমন বাইরে থেকে এসেছে, তেমনি জেলা ছেড়ে চলে গেছে অনেক লোক।

বেথুয়াডহরী, চকহাতীশালা আর যুগপুব—এই তিন মৌজা মিলিয়ে উদ্বাস্তুদের এক সরকারী কলোনি। বিশ্বাস মশাই সেই কলোনিতেই থাকেন।

বাড়ি ছিল তাঁর ফরিদপুরের গোপালগঞ্জে। চাষবাস ক'রে সংসার চলত। কবিরাজি ক'রেও দু-চার পয়সা আয় হত।

দেশ ভাগ হয়ে কপাল সেই যে ভাঙল, আর জোড়া লাগল না। স্ত্রী-পুত্র নিয়ে কিছুদিন কেটেছিল এক সরকারী আশ্রয়-শিবিরে। তারপর সেখান থেকে চালান হয়ে এলেন এই কলোনিতে। সংসারে সাতটা মুখ খেতে। একার রোজগার। বড় ছেলেটা ইস্কুলে পড়ছিল। পড়া

ছাড়িয়ে তাকে এক ঠিকেদারের কাছে কাজ করতে পাঠানো হয়েছে। কুলিগিরি করে অন্তত নিজের পেটটা তো সে চালাতে পারবে।

জিজ্ঞেস করলাম, কবিরাজি করেন না?

বিশ্বাস মশাই হাসলেন: রুগীর চেয়ে এখানে কবিরাজ বেশী।

যেখানে এখন কলোনি বসেছে, সে অঞ্চলটা আগে এক চিনিকলের নেওয়া ছিল। বেশ ঘটা ক'রেই তারা কাজ শুরু করেছিল। আখ-ক্ষেতে জল দেবার জন্যে ন'টা গভীর নলকূপ বসেছিল। মাটির তলা দিয়ে পাইপ। কিন্তু যা নিয়ে এত কাণ্ড, সেই আখ চলে গেল উঁইয়ের পেটে। ফলে চিনিকল আর হল না। মাঝের থেকে দেড় লক্ষ টাকা জলে গেল।

সে জায়গায় ধ'রে এনে বসানো হল উদ্বাস্তুদের—যারা এক ফোঁটা জমির জন্যে মরে যাচ্ছিল।

সাড়ে চার শো ঘর লোক নিয়ে গড়ে উঠল বিরাট এক কলোনি। বারো আনা পরিবার চাষ করবে আর বাকি সবাই দোকানপসার ক'রে খাবে।

যারা চাষী পরিবার তারা চাষের জন্যে ন' বিঘে আর ভিটের জন্যে পেল এক বিঘে ক'রে জমি। ব্যবসায়ী পরিবারদের দশ কাঠা ক'রে বসতের জায়গা। ঘর তুলবার জন্যে সকলেই পেল পাঁচ শো টাকা ক'রে ঋণ। এ ছাড়া চাষবাস আর ব্যাবসার পুঁজিপাটার জন্যে আরও কিছু টাকা কর্জ দেবার ব্যবস্থা হল।

কথা বলতে বলতে আমরা বড় রাস্তার নীচে শীলদের দোকানে গিয়ে বসলাম। এটা যে দোকান, সেটা ব'লে দিতে হয়। চেহারা দেখে ধরা মুস্কিল। ঘরের ভেতরটা এক রকম ফাঁকা।

গোড়ায় কিন্তু এখানে পাশাপাশি পঞ্চাশটা দোকান বসেছিল। কেনাবেচার কী ধুম। লোকের হাতে তখন লোনের কাঁচা টাকা। হাতে টাকা থাকতে পেটে কিল মেরে কে আর ব'সে থাকে। সময় বুঝে বাজারে চালের দরও তখন পঁয়তাল্লিশে উঠল। ফলে ঘর তৈরির ঋণের

টাকা চাল কিনতেই বেরিয়ে গেল।

তাও যদি ঋণের টাকা এক বারে মিলত! তা নয়, পাওয়া গেল অনেকদিন পরে পরে একটু একটু ক'রে—যখন চাষীদেব নুন আনতে পান্তা ফুরোবার দশা।

সরকার ট্র্যাক্টর এনে জমি ভেঙে দেবে—প্রথম এক বছর তো সেই আশায় ব'সে ব'সেই কাটল। তাবও এক বছর পরে এল সরকারী বীজ। চাষীদের মনে আনন্দ হল। তবু যা হোক অনেকদিন পর এবার দুটো ধানের মুখ দেখবে। মাটিতে সবুজ রং ধরল। আস্তে আস্তে গাছও বড় হল। কিন্তু ধান ফলল না। পরে জানা গেল, আউশের ক্ষেতে ভুল করে এসে গেছে আমনের বীজ। এমনি করে বৃথা চলে গেল তিন তিনটে নিষ্ফল বছর।

তিন ভাগের এক ভাগ চাষী পরিবার লাঙলগরু বেচে সর্বস্বান্ত হয়ে এখান থেকে চলে গেছে। কেউ গেছে পাকিস্তানে, কেউ গেছে এদিক-ওদিকের আশ্রয়-শিবিরে।

যাদের উপায় নেই, তারাই এখনও মাটি কামড়ে কোনোরকমে পড়ে আছে। জল নেই, চাষ হবে কোথা থেকে? গত বছর এক মণ ক'রে বিঘে-ভুঁই ফলন হয়েছে। তাও শুধু আউশ। ভাল জমিতে বড় জোর দেড় থেকে দু মণ ফলন হতে পারে।

মাঠময় কুশগাছ। সেও এক জ্বালা। ট্র্যাক্টর চালিয়েও কুশের মূলোচ্ছেদ করা যায় নি। মাটির অনেক গভীরে ওদেব শেকড়। এ মাটিতে মেস্তা ছাড়া আর কিছু হওয়া শক্ত। চীনেবাদাম লাগিয়ে দেখা হয়েছিল প্রথম বছর; উঁইয়ের মুখ থেকে সে আর মানুষের মুখ পর্যন্ত পৌছোয় নি।

কলোনিতে চুরাশী ঘরের এক সমবায় হয়েছিল। জলের অভাবে দু'বছরের মধ্যে উঠে যায়। সাড়ে তেরো হাজার টাকায় কেনা সমবায়ের ট্র্যাক্টব শেষ অবধি নিলামে আট শো টাকায় বিক্রি হয়ে গেল।

দোকানঘবেব একপাশে এসে বসেছিল এক আধবুড়ো চাষী। তার

বুকের হাড় গোণা যায়।

সে বলল, সরকার শুধু টাকা দিয়েই খালাস, চাষের দিকটা দেখে নি। সাত মণ তেল পোড়ানোর পর এখন জলের কল বসছে। শেষ হতে লাগবে তিন মাস। তারপর রাধা নাচবে। ততদিন জমি আভাঙা ফেলে রাখলে এ বছর চাষ হবে কী ক'রে? কল হলেও তো জল সেই টাকা দিয়েই কিনতে হবে। এদিকে চাষীর হাত খালি। চাষ করবে কে? লোকে তো পেটের ধান্ধায় বাইরে বাইরে ঘুরছে। এরপর টেস্ট রিলিফের কাজ জুটতে পারে। তাতে মাঠে ধান হবে না, বড় জোর একটা দুটো রাস্তা হবে।

কথাটা সত্যি। চার পাঁচ বছর আগেও যদি জলের এই ব্যবস্থাটুকু হত, তাহলে আর এখানকার লোকের আজ এ অবস্থা হত না।

শুধু চাষী নয়, ছোট ছোট ব্যবসায়ী পরিবারদেরও আজ একই অবস্থা। ছিল পঞ্চাশটা দোকান, এখন তিনটেতে এসে ঠেকেছে। তাও বিক্রিপাটা নেই।

এই প্যারী শীলের দোকানটাই ধরুন না। তবু তো এরা রেশনের চালের ডিলার। দৈনিক বিক্রি ছ টাকা থেকে দশ টাকার। তাও বেশির ভাগ বাকিতে। জিনিসের মধ্যে তেল-নুন। পুঁজির অভাবে আর কিছুই বিশেষ আসে না। লোকে একসঙ্গে বড় জোর কেনে এক এক ছটাক তেল আর দু দু পয়সার নুন। তার বেশী কেনবার ক্ষমতা কোথায়?

প্যারীবাবুর ছেলে সুশীল তখন দোকান দেখছিল। ফার্স্ট ক্লাসে পড়ে। ইস্কুলে তার এক বছরের মাইনে বাকি। এবার আর পরীক্ষা দেওয়া হবে না।

কলোনির লোকজন ধ'রে বসল—আমাদের ইস্কুল ঘরটা একবার দেখে যান।

মাঠের মধ্যে একটা ঘর দাঁড়িয়ে আছে। বারান্দার মাথাটা খালি, শুধু কয়েকটা কড়িবরগা বার হয়ে আছে। মেঝেটা এবড়ো-খেবড়ো।

অবাক হয়ে তাকালাম। এই ইস্কুল?

একজন বলল, প্রথম বছরেই দমকা হাওয়া লেগে বারান্দার চালটা উড়ে গেছে। কণ্ট্রাক্টর দিয়ে ঐ ঘর করতে সরকারের কত খরচ হয়েছে, জানেন? সাড়ে পাঁচ হাজার টাকা।

এবার আর খুব বেশী অবাক হলাম না।

রাস্তার ওপাশে সরকারী জঙ্গল ছিল।

জঙ্গলটা বাঁদিকে রেখে একটু এগোলেই ডানদিকে সার সার ইঁট-বার করা অনেকগুলো বাড়ি। মাঝখানে মাঝখানে খানিকটা ক'রে খোলা জায়গা।

দেখেই বোঝা যায়, বাড়িগুলো তৈরি হতে হতে হঠাৎ কাজ বন্ধ হয়ে গেছে।

ঢাকা কলোনির দত্ত মশাইয়ের কাছে এ জায়গার পুরো বৃত্তান্তটা শুনলাম।

মাঠ-রাস্তা দিয়ে অনেকটা ভেতরে ঢুকে গেলে জঙ্গলের ঠিক গায়েই যে কলোনি পড়বে, তার নাম ঢাকা কলোনি। এ কলোনিটা সরকারের নয়, উদ্বাস্তুদের নিজেদের।

একেবারে জঙ্গলের গায়ে হওয়ায় এ কলোনিতে থাকার নানা অসুবিধে। শেয়াল শুয়োরের ভারি উৎপাত। কলোনির লোকজন অনেকদিন থেকেই ভাবছিল, রাস্তার ধারেকাছে যদি তারা একটু জায়গা পায় তো উঠে আসে।

এদিকে সরকারী কলোনির পাশে রাস্তার ধারে সরকারী দখলের প্রচুর জমি খালি পড়ে ছিল।

কলোনির লোকজন কপাল ঠুকে একটা দরখাস্ত ক'রে দিল। সরকারের খালি জমিতে তারা একটা আদর্শ পল্লী গড়ে তুলতে চায়। একষট্টিটা ঘর হবে। ওপরে টিন, তার নীচে ইটের দেয়াল। পার্ক, লাইব্রেরী, রাস্তাঘাট, জলের ব্যবস্থা সবই থাকবে। আর এ সমস্ত কিছুই হবে নিজেদের শ্রমে।

প্ল্যান মঞ্জুর হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আদর্শ পল্লীর ছবি এঁকে সে খবর দেশময় রাষ্ট্র ক'রে দেওয়া হল।

গোড়ার কাজ গোড়ায়। সুতরাং কলোনির লোকজন মহা উৎসাহে ঘর তৈরির কাজ লেগে গেল। যেমন যেমন কাজ হবে তেমনি তেমনি সরকারী সাহায্যও মিলবে।

মাটি কাটতে কাটতে সরকারের কাছ থেকে ইঁট-পোড়ানোর কয়লা এসে গেল। ইঁট কিন্তু তেমন ভাল হল না। কারণ যে কয়লা এল, সেটা অন্য জাতের কয়লা—তাতে মেশিন ভাল চলে, ইট ভাল হয় না। মেশিনের কয়লা ব'লে পরিমাণেও ছিল কম।

সকলেরই মন একটু খুঁতখুঁত করল বটে, কিন্তু ঘর তোলার উৎসাহে ও নিয়ে কেউ মাথা ঘামাল না।

ইঁট তো তৈরি হল। ইঁট তৈরির পর ঘরপিছু পঁচিশ টাকা ক'রে দেবার কথা। যাদের পরিবারে গতরে খাটবার লোক নেই, তারা পঁচিশ টাকা পাবার আশায় জন খাটিয়ে ইঁট তৈরি করিয়েছিল। টাকা না পেয়ে তাদের একটা দল ব'সে পড়ল।

দেড় হাত ইঁট যারা গাঁথতে পারল, তারা পেল এবার জানলা দরজার কাঠ আর এক বস্তা ক'রে সিমেণ্ট। কিন্তু ইট তৈরির টাকা তখনও পাওয়া গেল না। যারা এতদিন কোনোরকমে ধৈর্য ধ'রে ছিল, এবার তারা হাত গুটিয়ে ব'সে পড়ল।

শেষ অবধি যারা টিঁকে থাকল, তারা ছাদ তৈরির জন্যে টিন পেল—কিন্তু বাড়ি শেষ করবার বাবদ পঞ্চাশ টাকা পাওয়া দূরের কথা, ইট তৈরির গোড়ার পঁচিশ টাকাও পেল না। ঘর তোলার জন্যে পাড়া-পড়শীদের যারা টাকা ধার দিয়েছিল, এখন তারা মাথা চাপড়াচ্ছে।

বাড়ি তৈরির কাজ যারা শেষ করেছে, তাদেরও উভয়সঙ্কট। জলের অভাবে নতুন বাড়িতে উঠে যেতে পারছে না। এখনও কলোনির কুঁড়েঘরেই তাদের মাথা গুঁজে থাকতে হচ্ছে। অথচ পুরনো ঘর ভেঙে পড়ছে—সারাবার উপায় নেই। এ এক হয়েছে বিষম জ্বালা।

সরকার থেকে বলা হচ্ছে, আসলে স্কীমটাই ছিল ভুল। অত কম টাকায় যা বাড়ী হয় তা নিতান্ত খেলো। সামান্য ঝড়বৃষ্টিতেই ভেঙে পড়ে যাবে। সুতরাং এবার ঘরপিছু আড়াই হাজার টাকা ক'রে দেওয়া হবে।

কলোনিতে যাদের দৌড় ইঁট পোড়ানো অবধি, এখনও পঁচিশ টাকার শোক ভুলতে না পেরে তারা বলছে---মোটে মা রাঁধে না, তার আবার তপ্ত আর পান্তা! কিছুই না দিয়ে পেছনে আরও ছুটো শূন্য বসিয়ে দেওয়া--ও আমরা জানি।

আরও একটু হেঁটে গেলে বেথুয়াডহরী স্টেশন।

স্টেশনটাকে সামনে রেখে গঞ্জের বাজার। আশে-পাশে পাটের ব্যাপারীদের বড় বড় গুদাম। সন্ধ্যেবেলায় ইলেক্‌ট্রিক আলোয় রাস্তাঘাট মন্দ দেখায় না। পাটের মরশুমে লোকজন, লরী, গরুর গাড়ীর ভিড়ে জায়গাটা জমজমাট হয়ে ওঠে।

এবারেই তো পাট বিক্রি হয়েছে লাখ তিনেক মণ—এক এই গঞ্জ থেকে। কলকাতার দালাল কিনেছে ষোল-সতেরো টাকা মণ দরে। বলতে গেলে প্রায় পঞ্চাশ লক্ষ টাকার লেন-দেন। টাকাগুলো কোথায় যায়?

চাষী যে দরে বেচে আর মিল যে দরে কেনে, তার মধ্যে মণে টাকা পাঁচেকের ফারাক। টাকাটা ছু তিন হাতে ভাগ হয়। যার যেমন টাকার জোর সে তেমন ভাগ পায়।

গঞ্জের আড়তদাররা পায় মোটা দালালি। চাষীদের দাদন দিতে যায় তার একটা অংশ। দাদন ছাড়াও চাষীদের বেঁধে মারার আরও নানা ফন্দিফিকির আছে। সে সব মহাজনী প্যাঁচ-পয়জারেই আড়তদাররা এখন নতুন নতুন জমির মালিক হচ্ছে।

স্টেশনে ভিড়। জঙ্গলে বাঘ শিকার করতে এসেছিল একটা বড় দল। সঙ্গে বন্দুক, কোঁচ, তীর-ধনুক। সারাদিন শিকারের পেছনে ঘুরেও কিছু পায় নি। এখন খালি হাতে ফিরছে।

বাঘ খুঁজতে জঙ্গলে যাওয়া কেন ?

ট্রেন এসে গেল। ভালই হয়েছে—কৃষ্ণপক্ষের রাত। যেতে যেতে আর মাঠময় কুশগাছ চোখে ফুটবে না।

এখন বয়স যাদের সত্তরের ওপর, ছেলেবেলায় তারাও কৃষ্ণনগরে রেল দেখে নি। এগারো মাইল রাস্তা ভেঙে বগুলায় গিয়ে তখন ট্রেণ ধরতে হত। তাও মাঝখানে নৌকোয় চূর্ণী পেরিয়ে।

এখন ট্রেণ দূরে থাক, বাসে চড়েই সারা জেলা টহল দেওয়া যায়।

ঘোড়ার গাড়ি তো প্রায় উঠেই গেছে। সাইকেল-রিক্সার দিনও শেষ হয়ে আসছে। স্টেশন থেকে বাসে দু আনা ছ পয়সায় শহর। কেউ আগে ভাবতে পারত ?

মিউনিসিপ্যালিটির সামনে দিয়ে ঘূর্ণীতে যাবার যে-রাস্তা, সেখানেই যত বাসের আড্ডা। চায়ের দোকান সেখানে একটা নয়, অনেক। তারই একটাতে বসে আছি। লাঠি ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে এক ভদ্রলোক এসে পাশে বসলেন। পরনে তেলচিটে খাঁকি প্যান্ট। শুকনো উস্কোখুস্কো চেহারা। চোখের চাউনিতে একটা দিশেহারা ভাব।

জিজ্ঞেস করলাম, পায়ে কী হয়েছে ?

ভদ্রলোক তাঁর দুঃখের কথা শোনাবার একটা লোক পেয়ে গেলেন।

যারা এ-রাস্তায় ঘোরাফেরা করে তারা বাস-লরীর ড্রাইভার-কণ্ডাক্টর কিংবা মেকানিক-ক্লীনার। হরদম এসব শুনে শুনে তাদের কান পচে গেছে।

খুব ছোট্ট ঘটনা। কলকাতা থেকে জলঙ্গী, জলঙ্গী থেকে কলকাতা—রোজ তিন শো মাইল রাস্তা ডিজেল লরী চালাতে হত। মাস মাইনে একশো চল্লিশ টাকা। ঘরে আসন্ন-প্রসবা স্ত্রী আর ছোট্ট মেয়ে। এক বছর সমানে চালিয়েছেন, গাড়ির গায়ে কোনোদিন একটু আঁচড় অবধি লাগে নি। একদিন হঠাৎ লাগল ধাক্কা। বদ্রী সিং-এর

লরী আসছিল। তার সঙ্গে। জাগুলিয়া আর কালীবাজারের ঠিক মাঝখানে। ডান পা-টা ভেঙে গেল। তারপর মাস কয়েক হাসপাতালে। এখন লাঠি ভর দিয়ে উঠে হেঁটে বেড়াতে হয়। না বেরিয়ে উপায় নেই যে। লরীতে যখন ধাক্কা লাগে, মালিকের কাছে তখন ছ মাসের মাইনে পাওনা। ছ মাসের মাইনে অতিকষ্টে আদায় হয়েছে, তাও লরী টেনে আনার খরচটা মালিক দেয় নি। টাকাটা কম নয়, পনেরো দিনের মাইনে। এখনও চার মাসের মাইনে বাকী। বারো বছরের ড্রাইভারি জীবন আজ এক ধাক্কায় শেষ হয়ে যেতে বসেছে। খোঁড়া পা নিয়ে সে এখন করবেই বা কী, আর কে-ই বা তাকে নেবে!

বাস-লরীর মালিকদের যে খুব টাকার অভাব, ড্রাইভার-কণ্ডাক্টরদের কথা শুনে তা মনে হল না। গড়ে এক-একটি বাসে নীট লাভই নাকি পাঁচ শো টাকা। বাস-লরীর যারা বড় বড় মালিক, শহরে এখন তাদের হাতেই পয়সা। সে পয়সা নানা খাতে খাটছে। যে বাসের মালিক, সেই কণ্ট্রাক্টর, সেই আবার ঘাটেরও ইজারাদার। উপরন্তু কারো আছে পেট্রল পাম্প আর স্পেয়ার পার্ট্‌স্‌-এর দোকান। তাছাড়া কেউ আবার গাড়ি কেনা-বেচার এজেন্ট, ভাড়াটে বাড়ির বাড়িওলা, সেইসঙ্গে আছে জোত-জমি, ভুষিমাল আর বন্ধকীর কারবার।

এ জেলায় চৌত্রিশটি বাস-রুট। রুট পিছু প্রায় চারটে করে বাস। যত বাস তার প্রায় আড়াই গুণ লরী। ড্রাইভার, কণ্ডাক্টর, ক্লীনার, কুলি, টাইমকীপার, চেকার, ইনচার্জ, মেকানিক, গ্যারেজবয়—সব মিলিয়ে মোটর শ্রমিকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়।

মাইনে ড্রাইভারদের সবচেয়ে বেশী। মাগ্‌গী ভাতা নিয়ে এক শো থেকে এক শো পাঁচ। রাত্তিরে কোথাও হল্ট করলে বারো আনা থেকে আড়াই টাকা খোরাকি। গ্যারেজবয়দের মাইনে তিরিশ টাকায় শুরু।

একজন কণ্ডাক্টর বলল, এও যা দেখছেন ইউনিয়ন হবার পর। আগে আমাদের চাকরির কোনো মা-বাপ ছিল না।

চা শেষ করে উঠে পড়তে হল। যাব ঘূর্ণী। বেলাবেলি ফিরে আসতে হবে।

বাঁদিকে খড়ে নদী। ডানদিকে বাঁক নিয়েছে রাস্তা। ঘূর্ণীতে ঢোকবার মুখে অবাক হয়ে দাঁড়াতে হল। শো-কেসে পুতুল সাজানো। সারি সারি দোকানকোঠা। তার মাথায় বড় বড় সাইনবোর্ড ঝুলছে। কে কার ছেলে, কে কার নাতি—রংচঙে অক্ষরে তার বিজ্ঞাপন। দেখে ভয় হয় তুদিন বাদে কালীঘাটের পাণ্ডাদের মতো খোদ পুতুল-গুলোই খদ্দেরদের হাত ধরে না টানাটানি করতে শুরু করে। বিশ বছর আগে একেবারে অন্য রকমের ছিল। দেখে শহর-ছাড়া গাঁ বলেই মনে হত। শহর এখন হাত পা ছড়িয়ে গায়ে হুমড়ি খেয়ে এসে পড়েছে।

কুমোরের ঘুর-চাকার শব্দ থেকেই হয়ত ঘূর্ণী নাম হয়েছিল। শোনা যায়, রাজা কৃষ্ণচন্দ্র নাকি রাজবাড়ির প্রতিমা গড়বার জন্যে নাটোর থেকে কারিগর এনে এখানে বসিয়েছিলেন। সেই ঘরোয়ানা থেকেই পরে পুতুলের জন্ম।

ঘূর্ণীতে এখন মৃৎশিল্পী বলতে পাঁচিশ-তিরিশ ঘর। তার মধ্যে মাটির কাজ করে মোটে বারো চোদ্দ ঘর। বাকি সবাই চাকরি-বাকরি কিংবা অন্যান্য পেশা নিয়ে আছে। এখন আর শুধু মাটির নয়, পাথরেরও কাজ হচ্ছে। পাথরের কাজ হয় তুটো ঘরে। পাড়ায় গোটা সাতেক দোকান।

রাস্তা দিয়ে ঢুকতেই গুদামঘরের মতো একটা দোকান। বাইরে বড় বড় অক্ষরে সাইনবোর্ড। ভেতরের দেয়ালে দোকানের মালিকের এনলার্জ-করা কয়েকটি ছবি—একা এবং গণ্যমান্য লোকের সঙ্গে। বড় বড় আলমারিতে রাশীকৃত পুতুল। মেঝের ওপর ডাঁই হয়ে আছে ছাঁচে-ঢালা গঙ্গাফড়িং, তেলাপোকা, লবঙ্গ, এলাচ, বুড়ো-বুড়ি আর যীশুখৃষ্ট।

এমনি এক দোকানের শিল্পী মুক্তি পালের সঙ্গে আলাপ হল।

বয়েস বেশী নয়। হাতের কাজ খুব ভাল। পাথরের কাজও শুরু করেছেন আজ তিন-চার বছর।

মুক্তি পালের খুব ইচ্ছে বিদেশে গিয়ে কাজ শিখে আসার। ইতালিতে যেতে পারলে পাথরের কাজ আর ফ্রান্সে যেতে পারলে ব্রোঞ্জ কাস্টিং-এর কাজ ভাল মতন শিখে আসতে পারা যায়। নিজে পয়সা খরচ করে তো যাবাব ক্ষমতা নেই, সরকাব থেকে যদি জাত-কারিগরদের বাইরে পাঠাবার তেমন কোনো ব্যবস্থা থাকত তো হত।

দোকানে সবই প্রায় তাঁর নিজের কাজ। পুজোপাবণে কারিগর বেখে কাজ হয়। ষোল সর্তেরো ঘণ্টা খেটেও দিনে রোজগার ছুটাকা আড়াই টাকার বেশী নয়।

মাটি, লোহার শিক আর বং—এই নিয়েই কাজ। মাটি অঢেল। নদীর ধার থেকে যত ইচ্ছে তুলে আনলেই হল। লোহাব শিক নিয়েও ভাবনা নেই। আসলে যত মুস্কিল বং নিয়ে।

দেশী বঙে কাজ হয় না। আবাব বিলিতি ব‚ পাওযা ভাব। যাও বা পাওয়া যায়, দাম আগুন। আগে জার্মান বঙের যেখানে ভরি ছিল ছ আনা, এখন তার দর ডবল তিন ডবল। এক নম্বব খড়িমাটি তো বাজারে পাওয়াই যায় না। সবকাবেব কাছ থেকে নিলে আট টাকা সাড়ে আট টাকা মণ—কিন্তু সবকাব দিলে তো! অগত্যা চোরাবাজারেই কিনতে হয়—কলকাতায় মণকরা বিশ-বাইশ, আর এখানে ছাব্বিশ-আটাশ। তাও একসঙ্গে বেশি দেয় না। খুব চেনা-জানা থাকলে সের দশেক, নইলে পাঁচ পোয়া আড়াই সের। বিলিতি রঙের বদলে পার্শিয়ান ব্লু বা দেশী তেলা নীল কিনতে পারা যায়। কিন্তু তার রং পাকা হয় না। বিলিতি তুলির দামও হয়েছে ডবল।

পুতুলের বাজার আগের চেয়ে একটু বেড়েছে। সরকারী এম্পোরিয়াম থেকে মাটির পুতুল আজকাল মন্দ বিক্রি হচ্ছে না। কিন্তু ওদের শর্তগুলো ভাল নয়। জিনিস বিক্রি হলে তবে দাম। ভেঙে গেলে কোনো গচ্চা নেই। এক বছর পড়ে রইলে ফেরত। এমনি শর্ত।

কারিগরদের নিয়ে এখানে একটা সমবায় হয়েছিল। এখন সেটা না থাকার মত। ঠিক মতো টাকা পয়সা পাওয়া যায় না। অনেকেরই নিজস্ব দোকান। ফলে, সমবায় দাঁড়াতে পারল না।

একটু এগিয়ে গিয়ে সাজানো-গোছানো একটা নতুন দোতলা বাড়ি। খবর পেয়ে বাষট্টি বছরের বৃদ্ধ কর্তা নেমে এলেন। রোগা পোড়-খাওয়া চেহারা। দেয়ালের দিকে তাকালাম। এনলার্জ-করা কোনো ফটো চোখে পড়ল না। বাইরের বারান্দায় কাঁচের আলমারিতে পুরোনো ধাঁচের কয়েকটি মূর্তি—হাল-গরু নিয়ে চাষী চাষ করতে চলেছে, একতারা হাতে গান গাইছে বৈরাগী, রাগে গরগর করছে ডোরাকাটা বাঘ। তার পাশে হালফ্যাশানের রংচঙে মণিপুরী-কথাকলি নাচের নর্তকী পুতুল।

বারান্দায় বসে বুড়োর ছেলে ছাঁচ থেকে মূর্তি গড়ছিল। বুড়োকর্তা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললেন—আর দেখবেন কি, সব এখন ছাচেরই পুতুল। শিল্পীর জাত গেছে। আমার বাপ-ঠাকুদা ছিলেন বড় কারিগর, তাঁদের নাম ছিল। ভাল জিনিস আজ হবেই বা কেমন করে, আর নেবেই বা কে! আগেকার আমলে খদ্দের ছিল সাহেব-সুবো আর রাজা-মহারাজা। তারা চাইত ভাল জিনিস, তা সে যে দামই হোক। ফলে সময় দিয়ে মনের মত জিনিস করা যেত।

এই দেখুন না, ঘূর্ণীর সবচেয়ে নাম ছিল মানুষের আর জীবজন্তুর মূর্তির। এখন আর সেসব কাজের কেউ নামই করে না। একটা মূর্তি গড়তে আট-দশ দিন সময় লাগে। অথচ লোকে চাইছে শস্তার জিনিস। কাজেই তাড়াহুড়ো-ক'রে-করা কমা কাজেরই এখন কদর বেশী। ফলে, আনাড়ী শিল্পীতে বাজার এখন ছেয়ে গেছে। অভাবের দরুন লোকে শেখবারও সময় পাচ্ছে না। ঘূর্ণীর এখন আর সে নামডাক নেই। বেশির ভাগ পুতুলেই এখন কাঁচা হাতের ছাপ।

বুড়ো এখন কাজ করা ছেড়ে দিয়েছেন। ছেলেরাই ছুটি দিয়েছে। এ বাজারে প্রকৃত শিল্পীর টে'কা সম্ভব নয়। বুড়োর তৈরি মূর্তিগুলো

আলমারিতে পচছে। ছেলেদের কাঁচাহাতের তৈরি ছাঁচের পুতুলই এখন ডজন হিসেবে চলছে।

আর এক বিপদ সাধারণের রুচি নিয়ে। কখন যে কোন্ জিনিস কাটবে, তা বলা মুস্কিল। এখন যেমন, দেবদেবীর মূর্তির চেয়ে শ্রীরামকৃষ্ণ ও শ্রীমা-র মূর্তির চাহিদাই বেশী। ভদ্রঘরের খদ্দের এসে বলে, কেষ্ট ঠাকুরের মুখ যেন হয় অমুক সিনেমা-অ্যাক্টরের মত। রাধিকার বেলায়ও তাই। কলেজের ছেলেরা এসে ফরমাস করে, নাইলনের শাড়ি-পরা আধুনিকার মত যেন মা সরস্বতী দেখতে হয়।

এসব যে একেবারে অজানা, তা নয়। তবু শুনে টুনে কেমন যেন হতভম্ব হয়ে গেলাম।

কৃষ্ণনগর থেকে রাণাঘাটের বাস। ভেতরে তিলধারণের জায়গা নেই। হাড়-জিরজিরে একটা লোক পায়ের কাছে ব'সে। কণ্ডাক্টর টিকিট চাইল। লোকটা সাড়া দিল না। খানিক পরে জড়িয়ে জড়িয়ে বলল সে টি-বি রুগী, হাসপাতালে গিয়েছিল ওষুধ আনতে। কণ্ডাক্টর ধমক দিল, এই নিয়ে দুদিন হল। ফের যদি ওঠো পয়সা লাগবে। লোকটা বাসের ভিড় ঠেলে টলতে টলতে দিগনগরে নেমে গেল।

দেখতে দেখতে শান্তিপুরে এসে গেলাম। কাছেই সাহাপাড়া। তাঁতীদের বাস। পুরনো যাদের চিনতাম খোঁজ করলাম। অনেকেই নেই। কেউ কাজ নিয়ে চলে গেছে বাইরের কাপড়-কলে, কেউ তাঁত ছেড়ে রিক্সা চালাচ্ছে, কেউ মাঠে কাজ করছে।

রোয়াকে ব'সে রোদ পোয়াচ্ছেন ভূষণ প্রামাণিক। এক সময়ের নামকরা কারিগর। চুরাশী বছর বয়স এখন। বয়ে সকালে দুশো নম্বর সুতোর মিহি কাপড় বুনতেন।

ভূষণ প্রামাণিক তাঁর ছেলেবেলার গল্প শোনালেন।

তাঁর ছেলেবয়সে যখন চালের মণ দু টাকা ছিল, তখনও তাঁতীদের অবস্থা খারাপ। তখন সবই ছিল খড়ো ঘর। দালানকোঠা ছিল না

বললেই চলে। থাকলেও দুটো চারটে। সে সময়ে এক টাকা মজুরিতেও লোকে একজোড়া কাপড় বুনেছে। এখন শুধু তাঁতী নয়, ধোপা, কলু, কামার, বামুনেও তাঁত বুনছে। আগে হাতে মাকু চালাতে হত—কাজ ছিল শক্ত। জ্যাকার্ড মেশিনে এখন কাজ তাড়াতাড়ি হয়, কিন্তু গায়ে জোর লাগে বেশী। আগেকার মত সরেস কাজ এখন আর হয় না। লোকে কাজ শিখবে, তার সময় কই? ছোটবেলা থেকেই রোজগারের ভাবনা। আগে তাঁতীদের অঙুল ছিল মর্তমান কলার মত। টাকায় ছিল ষোল সের দুধ—একেবারে বটের আঠার মত। এখনকার ছেলেপুলেরা দুধ পায় না। চোখও খারাপ। কম বয়সেই পট পট করে মরে যাচ্ছে।

শান্তিপুর শহরে হাজার দশেক তাঁত। শতকরা আশীজনই কাজ করে পরের তাঁতে। তারা তাদের মজুরিটুকুই পায়।

শান্তিপুরের তাঁতীদের ভাল অবস্থা দেখেছে ভূষণ প্রামাণিকের ঠাকুর্দা। ইংরেজরা তখন এক শান্তিপুর থেকেই বছরে দেড় লক্ষ পাউণ্ড দামের সূতীর কাপড় কিনত। তারপর এল ম্যাঞ্চেস্টারের সস্তা কলের কাপড় আর সেই সঙ্গে বিলিতি সুতো। সেই থেকে শান্তিপুরের কপাল পুড়ল।

আগে এ অঞ্চলে সবই ছিল হাতে-টানা ঠকঠকি। তারপর এল মাকু-টানা দোক্তি তাঁত। পাড়-বোনার জ্যাকার্ড মেশিনের চলন হয়েছে পঁচিশ-ত্রিশ বছর আগে। প্রথম যখন সর্বনন্দীপাড়ায় জ্যাকার্ড মেশিন এল, তাঁতীদের ভয় ধরে গিয়েছিল। অতবড় লোহার জিনিস পা দিয়ে টানলে শরীর থাকবে না। দুধ খেতে হবে, ঘি খেতে হবে। আজ তো ঘরে ঘরে জ্যাকার্ড মেশিন। কেননা তাতে একসঙ্গে পঞ্চাশ থেকে হাজার হুকের পর্যন্ত কাজ হয়।

যুদ্ধের সময় মিলের উৎপাদন কমে যাওয়ায় বাজারে যখন কাপড়ের খুব টানাটানি, শান্তিপুর তখন পুরোদমে কাপড় বুনেছে। অন্য সব জায়গায় তাঁতে হত তখন প্যারাসুটের কাজ। এখন সব জায়গাতেই

কাপড় হচ্ছে। ফলে, বাজারে তাঁতের কাপড়ের যোগান বেড়েছে পঞ্চাশ গুণ। খদ্দেরের হাতে পয়সা কম, কাজেই যে যত শস্তায় দিতে পারে।

কলকাতায় এখন খুব চলেছে বাংলার বাইরের মৌশালী কাপড়। শান্তিপুরের ডিজাইনের নকল। বুটিগুলো কলে তৈরি, স্থতোনাতা কম। ফিনিশিং ভাল, কিন্তু টেঁকে কম। ফলে শান্তিপুরের নাম খারাপ হচ্ছে। আবার শান্তিপুরের তাঁতীরাও দেখছে বেগমবাহারের নকল করতে পারলে বাজারের খানিকটা সুবাহা হয়।

নিজের তাঁত আছে, শান্তিপুরে এমন তাঁতীর সংখ্যা আজ খুব বেশী নয়। পরের তাঁতে খাটা দিনমজুরেব সংখ্যাই বেশী। তাও মাসে বিশ বাইশ দিনের বেশী কাজ পায় না। গড়ে তুদিনে একটা কাপড় বুনে কাপড় পিছু মজুরি পায় দেড় টাকা।

নিজেব তাঁতে যে কাপড় বোনে, তার অবস্থাও বিশেষ সুবিধের নয়। আশী স্থতোর জ্যাকার্ড কাপড়ে লাগে আড়াই মোড়া তানা স্থতো। পাড় লাগে গড়ে পাঁচ ফেটী। আব লাগে বুটি স্থতো। তা ছাড়া আছে রং, নলী পাকানো, তানা হাঁটা, স্থতো পাড়ি, শানা বাঁধা, বার্নিশ, বোয়া কাটা, তেল ইত্যাদিব খরচ। সব মেলালে গড়ে সাড়ে সাত টাকা আট টাকা পড়তা পড়ে। দোকান থেকে সেই কাপড় বিক্রি হয় বারো টাকা সাড়ে বারো টাকায়।

যে তাঁতী কাপড় বুনছে, সে পাচ্ছে কত? মহাজনের ঘরে কাপড় দিয়ে দেড় টাকা থেকে তু'টাকা। মাটা পাড়ের শাড়িতে আর কিছু বেশী। তাঁত থাকা না থাকার মধ্যে খুব বেশী তফাত থাকছে না।

তাঁতীর হাত থেকে বেরিয়ে গিয়ে তাঁত জমা হচ্ছে খোদ মহাজনদের হাতে। কাপড় তৈরি আর বিক্রি—তুটোকেই কব্জায় এনে তাঁতীকে তারা তাঁতে খাটা দিনমজুর করে আনছে।

এই অবস্থাটাকে সামাল দেবার চেষ্টা করছে তাঁতীদের কয়েকটা সমবায়। সরকার বিনা স্থদে কিছু কিছু টাকা সমবায়গুলোকে ধার

দিয়েছে। সমবায়ের কাপড় সরকারী দোকান থেকে বিক্রি হয়। সমবায়ের কাপড় ভালো, কারণ তাঁতীরা মজুরিও পায় ভাল।

কিন্তু পুঁজির অভাবে সমবায়গুলো মহাজনদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় দাঁড়াতে পারছে না। শান্তিপুরের সাতটা সমবায়ের যা পুঁজি, একেকজন মহাজনের পুঁজি তার চেয়ে ঢের বেশী। ফলে, তাঁতীদের পেটের দায়ে মহাজনদের কাছে ছুটতে হয়।

পুঁইপাড়ায় ঘুরতে ঘুরতে ডিজাইনার গোরাচাঁদ প্রামাণিকের সঙ্গে আলাপ হল। নিজের হাতে তিনি তৈরি করেছেন নক্সা কাটার কল। সমস্ত পার্টস স্থানীয় কামারদের দিয়ে তিনি তৈরি করিয়ে নিয়েছেন। খুব সূক্ষ্ম মাপের জটিল কাজ এই কলে হয়। গোরাচাঁদের বাবাও ছিলেন একজন নামকরা ডিজাইনার। তিনি কাজ করতেন হাতে। গোরাচাঁদ কলে করছেন সেই কাজই ঢের তাড়াতাড়ি।

যে নক্সার জন্যে শান্তিপুরেব কাপড়ের এত নাম, সেই নক্সাও এখন তৈরি হচ্ছে নিছক বাজাবের দিকে তাকিয়ে। কোন্ নক্সা বাজারে চলবে মহাজনই তা বলে দেয়।

শিল্পের সঙ্গে বাজাবের এই বিরোধের কিভাবে নিষ্পত্তি হবে, তারই ওপর নির্ভর করছে কারিগরদের ভবিষ্যৎ।

তাল-বীথি লাল-মাটি



তাল-দীঘি লাল-মাটি

'মালপত্তর সব সাবধান। চোর এই কামরাতেই আছে।'—পোস্টাপিসে দশটা-পাঁচটা কলম পিষে, দু জায়গায় ছেলে পড়িয়ে, বৈঠকখানার বাজারে বাস্তুপুজোর বাজার সেরে স্টেশনে পা দিতেই শেষ লোকাল ছেড়ে যাওয়ায় সাতাশ-আটাশ বছরের যে ছোকরাটি অগত্যা আমাদের ট্রেণে উঠে পড়ে ঘুমে ঢুলছিল, হঠাৎ চেকারবাবুর গলা শুনে সে ধড়মড়িয়ে উঠে বসল।

'অন্যমনস্ক হয়েছেন কি ঐ-য্-যাঃ হয়ে যাবে'—চেকারের বক্তৃতা শুনে সবাই একটু সামলে-সুমলে বসল। ওপরের বাঙ্কে এক মোটা ভদ্রলোক তুড়ি দিয়ে সশব্দে হাই তুলতে তুলতে বললেন, 'এর নাম গয়া প্যাসেঞ্জার।'

ট্রেণে ভিড় ছিল না। বেঞ্চির ওপর জুতোসুদ্ধ পা তুলে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। মাঝরাত্তিরে মাঝরাস্তার কোনো স্টেশনে লোকজনের ঠেলাঠেলিতে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি কামরার মধ্যে গিজগিজ করছে লোক।

ট্রেণটা নড়ে উঠতেই দরজা খুলে ভেতরে লাফ দিয়ে পড়ল এক বৈরাগী। বয়েস বেশী নয়। কুচকুচে কালো দড়িপাকানো চেহারা।

মুখের মধ্যে চকচক ঝকঝক করছে এক জোড়া চোখ আর দু পাটি দাঁত। কিছুক্ষণ ধরে সমানে সে গজগজ করতে লাগল। আজকালকার ভদ্রলোকদেরও বলিহারি। এতক্ষণ সে পাশের কামরাতেই ছিল, সঙ্গে টিকিট না থাকায় চেকার ডেকে প্যাসেঞ্জাররা তাকে ধরিয়ে দিয়েছিল। ফলে তাকে ষোল-আনা পয়সা খামোখা দণ্ড দিতে হল। এ অন্যায় ধর্মে সইবে না, কিছুতেই নয়। লোকগুলো ওলাউঠো হয়ে মরবে।

চোখ ঘুমে ঢুলে আসছিল। হঠাৎ একতারার আওয়াজ শুনে তাকালাম। বৈরাগীর চোখদুটো বন্ধ। ভয় দেখাবার আঙুলটা দিয়ে তারের ওপর সে এখন মিষ্টি সুর তুলছে আর সেইসঙ্গে তন্ময় হয়ে গাইছে—

হরি, তোমায় ডাকিবার
আমার সময় কই ?
কোথা কে দিবানিশি
আমি থাকি দিবানিশি কাজে মত্ত
আমি তোমার তত্ত্ব ভুলে রই।

হরি, সকালবেলায় মন করিলাম
জপিব এখন,
গোপাল এসে কোলে বসে
জুড়িল ক্রন্দন।...

দুপুর বেলায় স্নান করে যখন
উঠিলাম ডাঙায়
নাগরীগণ কলসী কাঁখে
সম্মুখে দাঁড়ায়।
দেখে ঐ রূপের বর্ণ

হয়ে জ্ঞানশূন্য
আপনা আপনি ভুলে রই।

সন্ধ্যেবেলা আচমন করে
গিন্নি এসে গর্জন করে...
ক্রমে ক্রমে রাত্রি হল
দ্বিতীয় প্রহর।
ক্ষুধার চোটে অঙ্গে ধরে কাঁপুনি—
বলে লক্ষ্মীকান্ত, চাল বাড়ন্ত
কে আনিবে তুমি বই।...

শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বোলপুরে যখন নামলাম, তখনও বেশ অন্ধকার। স্টেশনের হাতায় পোঁ পোঁ শব্দে হর্ন বাজাতে বাজাতে কণ্ডাক্টর চেঁচাচ্ছে : জয়দেব-কেঁদুলি। জয়দেব-কেঁদুলি।

চায়ের লোভ ছাড়তে না পেরে প্রথম বাসটা ছেড়ে দিতে হল। দ্বিতীয় বাস ছাড়ল কড়া লিকারে দুধ পড়বার মতো করে যখন রাত ফরসা হল। বাসে ঠাসাঠাসি ভিড়। জয়দেব অবধি এমনিতে বাস চলে না। মেলা বলেই চলছে।

সুপুর, রায়পুর পেরোতে দুধারে খোয়াই আর তালডাঙা। রামনগরের পর চৌপাহাড়ি জঙ্গল। অফুরন্ত শালের বন। জঙ্গলের মধ্যে ছোট্ট গ্রাম বল্লা। বন শেষ হলে সুখবাজার। তারপর এক দমে ইলামবাজারে এসে বাস একটু দাঁড়াল। বড় বড় বাড়ি। পুরনো মন্দির। বেশ বর্ধিষ্ণু জায়গা। ডানদিকে ঘুরে গেছে রাস্তা। বাস চলতে লাগল। পায়ের, হরিষা, সুনমুড়ি ছাড়িয়ে উত্তরকোণা। সর্ষেক্ষেতে সবুজ হয়ে আছে মাঠ। বাস এবার বাঁ দিকে বাঁক নিল। মাঠরাস্তায় ধুলো ওড়াতে ওড়াতে খানিক পরে এসে থামল টীকরবেতায়।

নদীর ওপারের গ্রাম বেতা। এপারে টীকরবেতা। টীকর মানে

উঁচু। কেঁদুলির সঙ্গে এ গ্রামের শুধু গোটা কয়েক মাঠের ফারাক।

আমার তেমন মোটঘাটের বালাই নেই। কিন্তু আমার বন্ধুটির আধমণী স্যুটকেস আর হোল্ড্‌অল। দুজনে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে যেতে হল। আমাদের কপাল ভাল, যে বাড়িটা চাইছিলাম সেটা হাতের কাছেই পেয়ে যাওয়া গেল। কড়া নাড়তেই বাড়ির কর্তা বেরিয়ে এলেন। আমাদের দিকে একটু অবাক হয়েই তাকালেন—'আপনারা ?'

মনে মনে দমে গেলেও খানিকটা সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে বললাম, 'আজ্ঞে হ্যাঁ, কলকাতা থেকে।' যে অনুপস্থিত বন্ধুটির পরিচয়ের সূত্র ধরে আমাদের আসা, তাঁর নাম করে বললাম, 'চিঠি পান নি ?'

'কই, না তো।'

—শুনে আরও মিইয়ে গেলাম।

অবশ্য আতিথেয়তার কোনো ত্রুটি হল না। প্রথমে এল হাতমুখ ধোওয়ার জল, তারপর লোভনীয় চা-জলখাবার। কিন্তু আমাদের তখন হে-ধরণী-দ্বিধা-হও গোছের অবস্থা। ভাবছি একটা ছুতো করে দুপুরের আগেই অন্য কোথাও সরে পড়তে হবে। শুধু আধমণী স্যুটকেস আর ঢাউস হোল্ড্‌অলটার দিকে তাকিয়ে ঘাবড়ে যাচ্ছিলাম। ঠিক সেই সময় ডাকঘরের পিওন এসে বাড়ির কর্তাকে চিঠি দিয়ে গেল। চিঠিটাতে চোখ বুলিয়েই তিনি বলে উঠলেন, 'দেখুন কাণ্ড, কবেকার লেখা চিঠি কবে এসে পৌছুল।' শুনেই বুঝলাম সেই চিঠি, যার অভাবে আমরা এতক্ষণ মরমে মরে ছিলাম।

সুতরাং খোশমেজাজে বেরিয়ে পড়া গেল মেলা দেখতে।

মাঠের আলরাস্তা ধরে গেলে কেঁদুলি মোটেই দূর নয়। কামার-পাড়ার ভেতর দিয়ে রাস্তা গিয়ে পড়েছে মাঠে। হাতুড়ির ঠুক-ঠাক আর হাপরের কাঁপা-কাঁপা আওয়াজে গমগম করছে গোটা পাড়া। ঘরে ডাঁই হয়ে আছে বাসন। দাওয়ায় মহাজনের লোক ব'সে।

আলরাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখা যায় বাঁ দিকে খানিকটা দূরে সদর রাস্তা

বরাবর সার দিয়ে চলেছে গরুর গাড়ি, মধ্যে মধ্যে বাস-লরি আর তিন চাকার টেম্পো। দুপাশে খেজুর গাছগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে ধুলো খাচ্ছে।

সামনে আধডজন ধানকাটা মাঠ। তারপরই অনেকখানি জায়গা নিয়ে সিনেমার তাঁবু। জেনারেটরের শব্দে মাত হয়ে আছে সারা তল্লাট। লাউডস্পীকারে চলছে অবিরাম হিন্দী গান। কাঁটাতারের বেড়ার ধারে দাঁড়িয়ে একজন দাঁতন করছিলেন। বেড়ার এধারে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দুটো চারটে কথা হল।

ভ্রাম্যমান সিনেমা কোম্পানি ওঁদের। বর্ষার কয়েকটা দিনই যা বসে থাকতে হয়। বছরের বাকি সময়টা মফস্বলে সিনেমা দেখিয়ে বেড়ান। হিন্দী নাচগানের ছবি হলে তো কথাই নেই। বাংলা ছবিও চলে। তবে সুচিত্রা-উত্তমের বই হওয়া চাই।

'তবে আর বলছি কী? গ্রাম কি আর সে গ্রাম আছে, মশাই!'

যেখানে আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম, তার ঠিক পাশেই প্রকাণ্ড একটা পোস্টারে এক রংদার মেয়ে বুক চেতিয়ে আড়নয়নে চেয়ে হাসছিল। তাকিয়ে দেখি বেড়াটার গায়ে লোক ভেঙে পড়েছে।

দু পা এগোতেই একেবারে মেলার আওতার মধ্যে এসে গেলাম। দোকান-পাট উপ্‌ছে এসে পড়েছে মাঠে। স্তূপাকার হয়ে আছে দরজা-জানলার পাল্লা, গরুর গাড়ির চাকা, মাটির হাঁড়িকুঁড়ি, পাতকুয়োর পাটা।

রাস্তার দুপাশে সারি সারি দোকান। এক জায়গায় সাইকেল-রিক্সায় বসে কোনো এক বিড়ি কোম্পানির লোক মাইকে জোর বক্তৃতা দিচ্ছে। তার পাশে পর পর দুটো হোটেল। উনুনে চায়ের জল ফুটছে। তার ঠিক পরেই টিম টিম করছে একটা হুঁকোর দোকান। হুঁকোর খোল আসে কোচিন থেকে। আগে ছিল জমজমাট ব্যাবসা। এখন গ্রামদেশে বিড়িটাই বেশি চলছে। বাইরে চলতে ফিরতে হুঁকো নিয়ে বড় ভজোকটো!

মোহন্ত বাবাজীর কাছ থেকে মেলার ডাক হয়েছে এবার হাজার তিনেক টাকায়। দোকান করতে গেলে হাত হিসেবে ভাড়া। জায়গা

বিশেষে তিন টাকা থেকে আট আনা হাত।

সংখ্যায় কাপড়ের দোকানই বেশী। খদ্দের বলতে বেশির ভাগই গাঁয়ের চাষী। এখন তারা ভালমন্দ বাছাই করতে, দরদস্তুর করতে শিখেছে। বলে, 'অমুক ধরনের শাড়ি।' ছাপা শাড়ির খুব চাহিদা। আগেকার দিনে? যা দেওয়া যেত তাই নিত। সাঁওতালরা আগে কিনত নিরেস ধরনের ছাপা রুমাল। এখন কেনে ভাল ক্যালিকো।

মনিহারি দোকানগুলোতে সাবান-পাউডার-পমেটম থেকে আরম্ভ করে নানা রকমের শৌখিন জিনিস। দেখে বোঝা যায় গ্রামের গায়ে শহরের হাওয়া লাগছে। খেলনার দোকানে যত খেলনা সবই প্লাস্টিকের —কাঠের নয়, টিনের নয়, মাটিরও নয়।

অ্যালুমিনিয়মের দোকান দেখে মনে হল, লোকের কাছে এখন অ্যালুমিনিয়ামের বাসনপত্রের চাহিদাই বেশী। এ চাহিদা সাধ করে নয়, দায়ে পড়ে। কাঁসাপিতলের দাম যা! অবশ্য সুবিধেও আছে। খোয়া যাওয়ার ভয় কম।

মেলায় দোকান দেখতে হয় মিঠাইয়ের। থরে থরে ছাদ পর্যন্ত উঁচু ক'রে সাজানো। রঙেরও বা কত বাহার। শ' তিনেক দোকান। গড়ে পাঁচ থেকে দশ হাজার টাকার বিক্রি। রসটুকুও ফেলা যায় না। তাই দিয়ে বোঁদে আর জিলিপি হয়।

নদীর ধারের রাস্তা জুড়ে কাতারে কাতারে বসে আছে কুষ্ঠরোগী। ভন্ ভন্ করছে মাছি। দেখে গায়ের ভেতর কেমন করে ওঠে। আরও একটু এগিয়ে গোটা দুই বইয়ের স্টল। বটতলার বই। লক্ষ্মীচরিত্র। প্রেমের গোপন পত্র। রোজা হইবার সহজ উপায়। ভৈরবীতন্ত্র। যাদুবিদ্যা। লতাপাতার গুণ। সেইসঙ্গে কৃত্তিবাসী সপ্তকাণ্ড রামায়ণ, কাশীদাসী মহাভারত। আরও কত কী। যারা বই কিনবে তাদের এর ভেতর থেকেই পছন্দ করতে হবে। কেননা সব দোকানেই এই এক বই। কেন তারা শুধু বটতলার বইই রাখে? বটতলার বই-ওয়ালারা ওদের মোটা কমিশন দেয় যে।

পেণ্ট করা সিনের সামনে কালো কাপড়ে ক্যামেরা ঢাকা দেওয়া ফটোর দোকান। এসেছে চিৎপুর থেকে। মেলায় মেলায় ছবি তুলে বেড়ানোই এদের কাজ। রোজগার? তা রোজগার না হবে তো আসবে কেন? আজকাল তো মরলে ফটো, বিয়ে হলে ফটো, বিয়োলে ফটো। কাল রাত্তিরেই তো এক গাঁ থেকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। টাকাও পেয়েছে ভাল।

তার পাশেই একজন পয়সা নিয়ে ম্যাজিক শেখাচ্ছে। তার পাশে কাটামুণ্ডু; মৃত্যুকূপ; বিদ্যুৎকন্যা; আজব চিড়িয়াখানা।

চব্বিশ পরগণা থেকে এসেছে মাছ-ধরা জাল। নদীয়া থেকে আড়ি বা ধান মাপাব ধামা। বর্ধমান, বৌবাজাব, চালভাজা, খাঁপুব থেকে মাটির জিনিস।

মেলার শেষ প্রান্তে গিয়ে চক্ষু স্থিব। গোটা পঞ্চাশেক কলার দোকান। জীবনে একসঙ্গে এত কলা কখনও দেখি নি। কলা নিয়ে এসেছে সতেরোটা ট্রাক। চন্দননগর থেকে, ব্যাণ্ডেল থেকে, কাটোয়া থেকে। একেক ট্রাকে গড়ে চাব শো কাঁদি। একেক কাঁদিতে তিন পণ। বলতে গেলে এ মেলায় প্রায সাড়ে ষোলো লক্ষ কলা বিকোবে। খবরের মতো খবর বৈকি। আগে এ অঞ্চলে কলা হত না; এখন বাজাব আছে দেখে চাষীরা করছে।

পৌষ-সংক্রান্তিব দিন আজ। গরস্থবা লক্ষ্মীপূজো, পিঠেপরব নিয়ে ব্যস্ত। সাঁওতালদের বাঁধ্না পরব, পয়লা মাঘ ডোমহাড়িদের এখ্যান-পুজো। মেলা কাল থেকে জমবে। লোকে জিনিস কিনবে ভাঙার মুখে। এখন দাম বেশির ভয়।

দুপুরটা গড়িয়ে নিয়ে বিকেলে চা খেতে খেতে টীকরবেতায় আড্ডা বেশ জমল। পাড়ার এক বৃদ্ধ জয়দেবের মেলার গল্প বলছিলেন।

আগে দু-তিনটে জেলার বিত্তবানেরা মিলে কেঁদুলিতে মচ্ছব করতেন। আখড়াও ছিল শতখানেকের ওপর। এখন বিশ পঁচিশটায় এসে ঠেকেছে। নতুন আখড়া বলতে শিরসা-র পশুপতি নায়কের।

তিন দিন ধরে খাওয়ানো ; দিন ছুশো লোক খায়। দিনে একবার খাওয়া। সব আখড়া মিলে পাঁচ সাত হাজার লোক খায়। এর খরচ ওঠে কিছুটা জমিদারের দেবোত্তর সম্পত্তি থেকে, কিছুটা বারোয়ারি চাঁদা থেকে, কিছুটা গুরুর দৌলতে।

বৈষ্ণবদের মেলা তিন দিন। কিন্তু বছর চল্লিশ আগে একমাস ধরে বাজার থাকত। তখনকার দিনে বাজারে প্রধানত বিক্রি হত মশলা-পাতি, তামাক, কাপড়, মনিহারি জিনিস আর চাষের যন্ত্রপাতি। এখন আর তামাক আসে না।

সে সময়কার জিনিসের দাম ?

এখন শুনলে হাসি পাবে। দশ টাকায় সম্বৎসরের তামাক, মশলাপাতি কেনা যেত। টাকায় জিরে পাওয়া যেত আট সের, গোলমরিচ ছ সের, সুপুরিও ছ সের। একটা লাঙল চার আনা, জোয়াল ছ আনা। তৈরি দরজা-জানলা তখন আসত না।

আমোদপ্রমোদ বলতে ছিল বৈঠকী গান। আসরে বসে কালোয়াতী গান গাওয়া ভাগ্যের কথা ছিল। আর হত বাউল গান। পরে বৈঠকী গান উঠে যায়। সে সময়ে আসত কীর্তনীয়াদের দলের মূল গায়েনরা।

মেলায় ডিম মাংস বিক্রি হত না। এখন ব্যাবসাটাই প্রধান হওয়ায় বৈষ্ণবেরা আড়ালে পড়ে গেছে। বৃন্দাবনী ছাপের কাপড় আসত জয়পুর, বৃন্দাবন থেকে। এখন সে সব বন্ধ। কাপড় আসে এখন হাওড়ার হাট থেকে।

তেপাতি (তিন তাস), তেসুঁটি, ছক—এই নিয়ে সেকালে জুয়ো খেলা হত খুব। এখন উঠে গেছে।

জয়দেবের মেলার সময় দেওয়ানী আদালত বন্ধ থাকত। নানা জেলা থেকে বাবাজী মাতাজীরা আসত। দূরদূরান্তর থেকে আসত যাত্রীর দল।

আর শুনলাম খোটবে-বাবার গল্প। শ্মশানের বটগাছের কোটরে

থাকত ; সেই থেকে নাম হয়ে গেছে খোটরে-বাবা। অন্য জেলার লোক ; মন্বন্তরের বছরে এ গাঁয়ে এসে প্রথম যখন আস্তানা গাড়ে, তখন তার ছোকরা বয়েস। কোটরে থাকতে থাকতে ভোলা ডোম তাকে একটা তালপাতার কুঁড়ে তৈরি করে দেয়। মেলার যাত্রীরা এসে তাকে খাবারদাবার পয়সা দিত। তার কোনো জাতবিচার ছিল না। একবার হল কী, খোটরে-বাবার জড়িবড়িতে মোহন্তের অম্লশূল সেরে গেল। খুশী হয়ে মোহন্ত তাকে সোনার তাগা গড়িয়ে দিলেন। আর সেইসঙ্গে শ্মশানে তৈরি হয়ে গেল খোটরে-বাবার আশ্রম। এখন তার বিস্তর বিষয়সম্পত্তি। ফি বছর চব্বিশ প্রহর হরিনামসঙ্কীর্তন করে। চাষীরা সেই উপলক্ষে ঢেলে টাকা দেয়। সেই টাকায় আজ তার বিঘে চল্লিশ জমি। এখন সে ঘোর বাবু। সেবাদাসী আছে।

আখড়ায় আখড়ায় এখন পাল্লা চলেছে কে বেশী চেলাচামুণ্ডা পাকড়াতে পারে।

রাত্তিরে মেলায় গিয়ে তা বিলক্ষণ টের পেলাম। বছর কয়েক হল এক বাবাজী রীতিমতভাবে আসর জাঁকিয়ে বসেছেন। মাথার ওপর বাহারে চাঁদোয়া। রঙীন তাকিয়ায় ঠেসান দিয়ে বাবাজী বসে। পরনে তাঁর দামী সিল্কের গেরুয়া। বেশ গোলগাল চেহারা। চতুর্দিকে টাঙানো তাঁর ফটো। বেশির ভাগ ফটোই তাঁর সমাধি অবস্থায় তোলা। সেই সঙ্গে বিলি হচ্ছে ছাপানো হ্যাণ্ডবিল। টেবিলের ওপর বিক্রির বই রয়েছে—বাবাজী কথামৃত। লাউডস্পীকারে কীর্তন হচ্ছে। ওপাশে পর্দাঘেরা জায়গায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কড়াই। স্তূপাকারে কুটনো কোটা। উনুনগুলোও যেন রাবণের চিতা। মাঝবয়সী হালফ্যাশনের কিছু মহিলা ঘোরাঘুরি করছেন। বাবাজী মাঝে মাঝে উঠে গিয়ে দেখেশুনে সবদিক বজায় রেখে আসছেন। চারিদিক আলোয় আলো হয়ে আছে।

এদিক ওদিক ছোটবড় আরও অনেক আখড়া। যার যেমন ট্যাঁকের জোর তার তেমন জৌলুশ। কোথাও গান হচ্ছে লাউডস্পীকারে,

কোথাও খালি গলায়। কোথাও ডে-লাইট, কোথাও হারিকেন।

বাউল এসেছে হাজারের ওপর। নানা জেলার নানা জায়গায় তাদের আখড়া। কাজ বলতে শুধু ভগবানের নাম।

আমাদের সঙ্গে ছিলেন ফ্রয়েড-পড়া হেল্‌থ সেণ্টারের এক ডাক্তার। বিন্দুসাধনের সঙ্গে গাঁজার এবং আখড়ার সঙ্গে ভক্তদের সম্পর্ক নিয়ে তিনি বিস্তারিত ব্যাখ্যা করছিলেন। হঠাৎ দেখলাম বোষ্টম-বোষ্টমিদের দঙ্গলের দিকে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রয়েছে আমার এক পরিচিত ছোকরা। 'কখন এলে—' শুনে সে কেমন যেন থতমত খেয়ে তাকাল। অন্যমনস্ক থাকায় আমাকে চিনতে তার এক মুহূর্ত লাগল। তারপর একটু রহস্যের মতো করে আমাকে একপাশে 'শুনুন' বলে ডেকে নিয়ে গেল।

বলল : বেশ কয়েক বছর আগের কথা। আমার এক কাকা নতুন বিয়ে করেছিল। কাকিমা লেখাপড়াও একটু আধটু জানতেন। সেই সময় গ্রামে এক সাধু এসে গাছতলায় আস্তানা গেড়েছিল। একদিন দেখা গেল গাছতলা খালি। সাধু চলে গেছে। এদিকে কাকিমাকেও পাওয়া গেল না। সেই থেকে কাকিমা নিরুদ্দেশ। আজ এই একটু আগে হঠাৎ কাকিমাকে দেখলাম। গলায় কণ্ঠি, কপালে রসকলি। আমি এগিয়ে যেতেই ভিড়ের মধ্যে কোথায় যে মিশে গেলেন কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছি না।

কথাটা শেষ করেই কাউকে বোধহয় দেখে হন্তদন্ত হয়ে সে এগিয়ে গেল। ফ্রয়েড-পড়া ডাক্তার ভদ্রলোকের কাছে ব্যাপারটা বেমালুম চেপে গেলাম।

পেছন থেকে কে একজন হঠাৎ আমার কনুই ধরে ফেলল। মুখ ঘুরিয়ে দেখি একজন চেনা লোক। নীচু গলায় বলল, গান শুনবেন? সেরা বাউলদের গান।

এক কথায় রাজী হয়ে আমরা তার পেছন পেছন চললাম। রাস্তাটা একটু অন্ধকার-অন্ধকার। খানিকটা এগিয়ে একটা পাঁচিল। পাঁচিলের মাঝখান দিয়ে দরজা। ভেতরে ঢুকে মনে হল কোনো আশ্রম।

উঠোনের একপাশে একটা শানবাঁধানো বেদী। টিম টিম করছে একটা ফুটো হারিকেন। মধ্যিখানে আগুন। চারদিকে কিছু লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে। একতারা বাজছিল। উঠোনে জুতো খুলে রেখে আগুনের কাছে উঠে বসলাম। বেশ শীত। রাতও হয়েছে মন্দ নয়।

আগুনটাকে প্রায় কোলের মধ্যে নিয়ে বোম হয়ে বসে ছিল এক বুড়ো থুত্থুরে বাউল। হাতে তার ন্যাকড়া জড়ানো একটা কল্কে। কাঁপা কাঁপা হাতে চিমটে দিয়ে কল্কেতে আগুন চড়িয়ে সামনেই এক-জনের হাতে দিল। একতারাটা নিয়ে এতক্ষণ সে শুধু টুং-টাং করছিল। স্বর আসছিল না।

পেছন থেকে কে একজন খুরিতে করে চা এগিয়ে দিল। শীতের মুখে গরম চা বেশ জমল। খুরিটা নামিয়ে রাখতে কানে এল এবার গবগবিয়ে একতারা বাজছে। বাউল এবার উঠে দাঁড়িয়েছে। গানও শুরু হয়ে গেল :

ওগো নাগরি,
জাত গেল পেট ভরল না গো
গাগরী।···
গোসাঁই কবির চাঁদে কয় :
মোদের নাইক লাজ ভয়,
সবাই মিলে বল
মোদের গৌরহরির জয়।

আসর দেখতে দেখতে জমে উঠল। টিমটিমে আলোয় ভাল করে কারো মুখ দেখা যাচ্ছে না। ছায়াগুলো মাঝে মাঝে নড়ে নড়ে উঠে কেমন একটা রহস্যের জাল বুনে চলেছে। গান একজন শেষ করে তো আরেকজন ধরে :

মানুষে কী আছে,
মানুষ আসতেছে আর যাইতেছে।
মানুষে কী আছে।

আমার আমায় রেখে আসছে মানুষ,
ভবের হাটে মানুষ বসে তার কাছে।
মানুষে কী আছে।
হৃদয় মাঝে কল আছে।
নীচে কলের যোগ আছে,
চারদিকে চার ডাল আছে—
মানুষ পাতায় নড়তেছে।
…মানুষে কী আছে!

উঠে আসব আসব করছি। দরজা ঠেলে কে একজন ঢুকতেই আসরটা কলবলিয়ে উঠল। তার হাতেও একতারা। মুখ দেখতে পাচ্ছিলাম না। পৈঁঠের ওপর ঝুলি রেখে বসতেই কল্কেটা এগিয়ে গেল। তারপর কষে কয়েকটা টান। ঠিকরানো আলোয় লোকটার মুখের ওপরদিকটা বারকয়েক ঝিলিক দিয়ে উঠল। কোথায় যেন দেখেছি-দেখেছি মনে হল।

একতারায় একটা চেনা সুর বেজে উঠল। তারপরই শুরু হল গান :

হরি, তোমায় ডাকিবার
আমার সময় হল কই…

গলাটা খুবই চেনা। সঙ্গে সঙ্গে গয়া প্যাসেঞ্জারের কথা মনে পড়ে গেল। সেই বিনা-টিকিটের যাত্রী বাউল—পাশের কামরার ভদ্রলোক-দের যে শাপমুক্তি দিয়েছিল।

আধো-আলো আধো-অন্ধকারে লোকটা সুরের এমন এক মায়াজাল বিছিয়ে দিল যে, কিছুতেই উঠে আসতে পারলাম না।

বাইরে বেরিয়ে বাউলদের ভিড় ঠেলে আসতে আসতে একজন বলল, 'ঐ দেখুন, এক বোষ্টম বোধহয় এক বোষ্টুমীকে ভাংচি দিচ্ছে।'

মেলায় নাকি আকছার হয়।

তার বোধহয়টা মেলার ভিড়ে ঢাকা পড়ে গেল !

পরদিন ভোরে উঠে বন্ধু ফিরল কলকাতায়। আমি চললাম মল্লারপুর। সেখান থেকে হাঁটাপথে যাব নিমপাহাড়ি।

মল্লারপুরের এক বাড়িতে স্নানখাওয়া সেরে, বেলাবেলি রওনা হওয়া গেল। শুনেছিলাম ঝুমুরের দল আছে এখানে। খোঁজ নিলে মন্দ হত না। কিন্তু কথাটা তুলতেই গাঁয়ের লোকেরা এমনভাবে মুখ বিষ করে তাকাল যে, ও নিয়ে আর এগোবার সাহস হল না। স্পষ্টই বুঝলাম গাঁয়ের লোক ওদের পাড়ায় যাওয়াকে ভাল চোখে দেখে না। ওদের নাকি সব নোংরা ব্যাপার-স্যাপার।

রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে যেদিকেই তাকাই, সেইদিকেই দেখি দীঘি। আর সব দীঘিই তালদীঘি। এই একটা গাঁয়েই নাকি শ-দুই দীঘি! চোখে যা দেখলাম শুনে খুব অবিশ্বাস হল না। গরুর গাড়ির চাকা-বসা লম্বা রাস্তা। অনেক দূরে আকাশের গায়ে মেঘ-মেঘ পাহাড়। রাজমহল।

ক্রোশখানেক যাওয়ার পর গাড়ির রাস্তা ডানদিকে বাঁক নিল। বাঁদিকে ঘাগার বন। বনের পায়ে-চলা রাস্তা ধরে আমরা চলতে লাগলাম। কথায় বলে, নদীর কূল আর শালের মূল—যেমন গরম তেমনি ঠাণ্ডা। লাল কাঁকর-মেশানো অদ্ভুত মাটি। জায়গায় জায়গায় উঁচু হয়ে আছে ঝামা-পাথর। পায়ের দিকে না তাকিয়ে চললে হোঁচট খাওয়ার ভয়। বনের ভেতর এঁকে বেঁকে গেছে রাস্তা।

যেতে যেতে গাছ দেখি আর নাম জিজ্ঞেস করি। পাতা দেখেই বুঝতে পারি কোন্‌টা শাল, কোন্‌টা সেগুন। মহুয়াও পারি। আম জাম কাঁঠালের তো কথাই নেই। কিন্তু পিয়াল গাছ আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ল না। জেওলা আর চাকল্‌তাও নয়। ধোয়া আর মুরগা তো নয়ই। মুরগা গাছের ভালো কাঠ হয়। আর আছে গাব, করমচা, বৈঁচি, বনফুল, বকুল, অনন্তমূল, শতমূলী, হরিতকী, আমলকি,

বহেড়া। ঘাগার বনে পাওয়া যায় প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড খাম আলু— একেকটার আধমণ, তিরিশ সের ওজন।

খরগোশ আর বেজী ছাড়া কোনো জন্তু চোখে পড়ল না। শুনলাম বনে সাপ তো আছেই, বাঘ আর শুয়োরও আছে। খরগোশকে এখানকার লোকে বলে 'শশা'; নখীর চেয়ে খুরীর মাংসে স্বাদ বেশী।

পাখির মধ্যে এ বনে পাওয়া যায় ময়না, টিয়া, ট্যাশকোনা, শালিখ, কোকিল, কাকাতুয়া, চোখ-গেল, বউ-কথা-কও। শিকারের পাখির মধ্যে তিতির, গেরুল, ডাহুক, ঘুঘু। গেরুল পাখিকে মুরগাভিও বলে।

হাঁটতে হাঁটতে বেশ মালুম হচ্ছিল ক্রমশ উঁচুর দিকে উঠছি। খানিকটা খানিকটা ফাঁকা জায়গা। আবার হয় গাছের জটলা, নয় কাঁটা বন। কাঁটা একবার কাপড়ে বিঁধলে ছাড়ানো মুস্কিল।

হঠাৎ তাকিয়ে দেখি সামনে এঁকে বেঁকে গেছে একটা খাল। খাল পেরোবার সাঁকোয় পৌঁছুতে আরও বেশ খানিকটা হাঁটতে হল। পশ্চিমে সূর্যের বেশ চোখ-ঢুলুঢুলু অবস্থা।

খাড়া রাস্তায় বেশ খানিকটা উঠতে হল। উঠেই নিমপাহাড়ি। সামনে কয়েকটা টোপাকুলের গাছ। তার আড়ালে টুকুঁদার বাড়ি। তেষ্টাও পেয়েছিল খুব। কিন্তু সব উৎসাহ জল হয়ে গেল যখন শুনলাম টুকুঁদা বউ নিয়ে শ্বশুরবাড়ির গাঁয়ে গেছে পরব করতে। বউ থাকবে। টুকুঁদা রাত্তিরে ফিরবে খাওয়াদাওয়া সেরে।

নিমপাহাড়ির টুকরো টুকরো কিছু খবর পরে টুকুঁদার কাছে পেলাম। টুকুঁদারা অনেক পুরুষ ধ'রে এখানে। এ গাঁয়ে আগে দুশো আড়াই শো ঘর লোকের বাস ছিল। টুকুঁদার ছেলেবেলাতেই তো এ গাঁয়ে একশো ঘর লোক ছিল। এখন পঁচিশ ঘর লোকে এসে ঠেকেছে। এ গাঁয়ে হাঁসদা, টুডু আর বেস্‌রাদের বাস। মুরমু, মারডি, কিস্‌কু, হেমব্রম, সোরেন, চঁড়েরা থাকে অন্য অন্য গাঁয়ে। টুকুঁদার বিয়ে হয়েছিল দশ বছর বয়সে; টুকুঁদার বউ গীছার বয়স তখন পাঁচ কি ছয়। টুকুঁদার শ্বশুরদের পারিশ্ হল মারডি।

টুর্কুদার কর্তাবাবা শালকুর ছিল তিন কুড়ি বিঘে জমি। তার সাত বেটা, দুই মেয়ে। খরার বছরে পাঁচ মণ ধান কর্জ করেছিল বলে আট দশ বিঘে জমি মহাজনের পেটে চলে যায়। এ গাঁ ছেড়ে যারা আসামের চা-বাগানে কিংবা বর্ধমানে পালিয়ে গেছে, তারা সবাই গেছে অজন্মায় জমিহারা হয়ে। টুর্কুদারা পাঁচ ভাই : রেঙা, মোড়ল, টুর্কু, রাকদা, লুস্থু। শুধু সেজো আর ছোটই এখন বেঁচে। পাঁচ ভাইয়ের ছিল পাঁচ বিঘে পৈতৃক জমি। এখানে জমি বলতে সবই প্রায় ডাঙা জমি। বৃষ্টি হলে তবে ফসল হয়। ভাল বৃষ্টি হলে বিঘেতে পাঁচ ছ মণ হবে। জষ্ঠি মাসে বুনলে ভাদ্দরে ওঠে কডু ঘাস। বিঘেয় এক মণ। কডুতে চাল হয় তিরিশ সের।

পাশেই কলাইপাহাড়ি জঙ্গল। জঙ্গলটা আগে ছিল মোহন্ত ভগবানদাসের। জমিদারি উচ্ছেদের পর এখন সরকারী বন। এই বনের কিছু কিছু জমিতে সাঁওতালরা আগে মকাই চাষ করত। জমিদার তার ভাগ নিত। বন সরকারী হওয়ার পর সাঁওতালদের চাষ বেবাক বন্ধ।

এ জমিতে ভাল হয় বরবটি-কলাই। ভাল করে সার দিলে বিঘেতে চার-পাঁচ মণও হতে পারে। সয়াবিনের চাষও হতে পারে। এ জমিতে আর ভাল হয় কাঁঠাল গাছ। আশপাশে পতিত জমিও কিছু আছে যেখানে চাষ হতে পারে। কিন্তু সেচের সমস্যাই আসল।

এদিকে ক্যানেলটা যেভাবে কাটা হয়েছে, তাতে ডাঙা জমির জল ডামড়ার মাঠে যেতে পারছে না। ক্যানেলের বাঁধে সে জল আটকে যাচ্ছে। আগে বনের পাতা-ধোয়া জল জমিতে সারের কাজ করত। এখন ডামড়ার মাঠে ক্যানেলের জল না নিলে চলে না। সে জলে আগেকার মতো ফসল হচ্ছে না। আবার ক্যানেলের জলও ফি বছর পাওয়া যায় না।

এ অঞ্চলে কাঁদরের জল আসে পাহাড়ের ঝর্ণা থেকে। দু দোণ, তিন দোণ জল। বারো মাসই কিছু না কিছু থাকে। বাঁধ দিয়ে জল

জমিয়ে রাখলে এ অঞ্চলের চেহারা বদলে যায়। চার-পাঁচটা বাঁধ হলেই হয়। নিজেরা চাঁদা তুলে করবে সে উপায় নেই। খাজনাই দিয়ে উঠতে পারে না, চাঁদা দেবে কোত্থেকে? তবে তারা গতরে খেটে দিতে রাজী।

টুর্কুদারা বাড়িতে কেউ নেই দেখে, দূর থেকে মাদলের শব্দ শুনে ঝোলাঝুলি রেখে আমরা গেলাম নামালের দিকে গ্রাম দেখতে।

সূর্য ডুবে গেলেও বাইরে তখনও আলো। দূরে ধোঁয়া-ধোঁয়া দেখা যাচ্ছে একটানা রাজমহল পাহাড়। জায়গায় জায়গায় তার একেকটা করে নাম। কোথাও বলে শালবনী, কোথাও মনসা, কোথাও বেনাগুড়িয়া, কোথাও বাঁশপাহাড়ি, কোথাও কাঠপাহাড়ি, কোথাও বলে কাঁড়াকাটা।

সবচেয়ে উঁচুতে নিমপাহাড়ি গ্রাম। তার আশপাশে ছড়ানো রায়পুর, পলাশবনী, ধরমপুর, হুচুকপাড়া, উলপাহাড়ি, বড়জোল, গড়িয়া, আগুইয়া, হামিরপুর, ডামড়া। রায়পুরে বেশির ভাগ জোলার বাস; ডামড়ায় তেলী আর ঘোষ—আর আছে বাউড়ি, লেট, বাগ্দী, শুঁড়ী, ব্রাহ্মণ, বেণে, নাপিত।

ধরমপুর যেতে বেশ খানিকটা নামতে হয়। রাস্তার দুপাশে মজার মজার পাথর। দেখে মনে হবে কাঠের টুকরো, হাতে নিলে দেখা যাবে পাথর হয়ে গেছে।

উপরপাড়া আর নামালপাড়া মিলিয়ে ধরমপুরে একশো ঘর লোক। পুরোপুরি সাঁওতালদেরই গ্রাম। উপরপাড়া গরীব—কিষাণ, মাহিন্দার আর ভাগচাষীরা থাকে; এদের বলে রাঙাই হড়। আর নামাল-পাড়ায় থাকে কিষণ হড়—তাদের ঘর-গৃহস্থি আছে।

মাদলের আওয়াজ হচ্ছে নামালপাড়ায়। আমরা সেইদিকেই ছুটলাম। কাল এ গাঁয়ের বন-ঝাড়ার দিন। সবাই তাই নেচে গেয়ে তৈরি হচ্ছে। বাঁধনা পরবের শেষ হয় বন-ঝাড়া দিয়ে। গাঁ-সুদ্ধ লোক জঙ্গলে শিকারে যায়—তারই নাম বন-ঝাড়া।

বনে সারা দিন ঢুঁড়েও একটা দুটো খরগোশের বেশী কিছু মিলবে

না। গোটা গাঁয়ের তাতে কী হবে? একেক দিন একেক গাঁয়ের বন-ঝাড়বার পালা। তাও আগেকার সেই জঙ্গল আর সেই জঙ্গলে আগের মতো শিকার থাকলে কথা ছিল। সারাদিন বন ঠেঙিয়ে সন্ধ্যেবেলা যার যার বাড়ির শুয়োর-মুরগী মেরে পরবের ভোজের ব্যবস্থা হবে। কিন্তু শিকার না মিলুক, বন-ঝাড়ার দিন আরও নানা মজা হয়—জোড়ায় জোড়ায় শিকার যতটা নয়, শিকারের ভান ক'রে তার চেয়ে বেশী মজা। এই রং-তামাসায় ঘর বাঁধেও, ঘর ভাঙেও।

চাল কুটতে কুটতে এসব কথা বলছিল গাঁয়ের এক বুড়ি। বুড়িকে বললাম, গান শোনাও। প্রথমে গাঁইগুঁই করল, তারপর কাঁসার বাটিতে গরম চা এগিয়ে দিয়ে একটার পব একটা গান শোনাল। সোজা বাংলায় গানগুলো এই:

অনেক কুটুম এসেছে
ছোট ছোট মুবগী আব শুয়োর
আমি ভাগ করতে পাবব না, বাবা -
তুমিই কুলিয়ে দাও, বাবা।

—

এতদিন বাঁধ্‌না কোথায় ছিলি?
পৌষ মাসের
কুড়ি দিন পুরতেই
আমি আস্তে আস্তে চলে এলাম

—

যেমন যেমন
পৌষ মাস ফুরোচ্ছে
আমিও তেমনি
এগিয়ে এগিয়ে আসছি

—

আজ তো স্নান হল
দলমাদল পুকুরে ;
ঘরে কাল শুয়োর-মুরগীর পুজো হবে ।

—

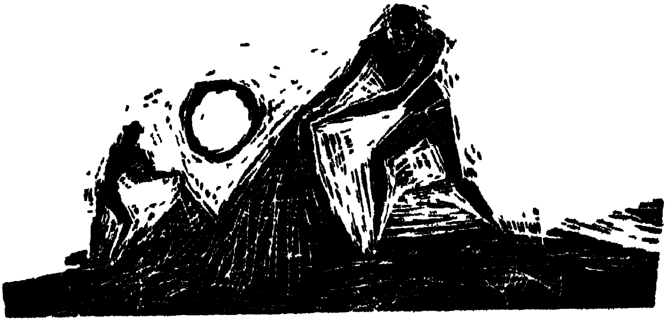
ঘর তো বড় বটে,
লোক মেলাই ।
জলকলসী তো নেই,
লোক মেলাই ।
কলসী কী হবে ?
ঘরে তো আছে পাঁচ ঘড়া
ঘড়া দিয়ে পুকুর থেকে জল আনো ।

মামালপাড়া থেকে যখন উঠলাম, সঙ্গের হারিকেনটা জ্বালতে হল

জ্যোতির্ময়ী দেবী

এপার গঙ্গা —

ওপার গঙ্গা —



এপার গঙ্গা ওপার গঙ্গা

সুন্দরবনে যাব বলে বেরিয়েছিলাম। ফিরলাম কোলাঘাট থেকে। শুনলে লোকে হাসবে।

যখন মোমিনপুরের মোড়ে বাস ধরব বলে দাঁড়ালাম তখন গরমের ঠিকদুপুর। গলা পিচের ওপর ঠিক্‌রে পড়ছে রোদ। চোখ চাওয়া যাচ্ছে না। মোমিনপুরের আকাশকেও বলিহারি। আকাশ তো নয়, যেন আদেখলের ঘটি। ৬৬ নং বাসটাও এল রোদ্দুরে বেজায় মাথা গরম ক'রে। যাবে ডায়মণ্ডহারবার। সেখান থেকে বাস বদ্‌লে কাকদ্বীপ।

বাসের যাত্রীদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়, এ রোদ্দুরে সবাই বেরিয়েছে নেহাৎ দায়ে পড়ে। কেউ রুগীর জন্যে ওষুধ কিনতে, কেউ সওদা করতে, কেউ মামলা লড়তে শহরে এসেছিল। গাঁয়ের তালেবর লোকগুলোকে দেখলেই চেনা যায়। দশ আঙুলে আংটি, কিন্তু কাপড়টা ঠিক হাঁটুর ওপর তোলা। যেসব গঞ্জ-মতো জায়গায় বাস বেশীক্ষণ থামে, সেখানে ডাব নিয়ে দরাদরি করবে, তারপর গজর গজর করতে করতে ডিবে থেকে বিড়ি বার করে উল্টোমুখে বারকয়েক ফুঁকে তারপর পাঁচসিকের লাইটার জ্বেলে ধরাবে।

একটা লোক আমার ঠিক পাশেই সিটের ওপর পা উঠিয়ে বসে ছিল। খানিকক্ষণ পর আর থাকতে না পেরে একটু রুক্ষভাবেই বললাম পা-টা নামিয়ে নিতে। লোকটা কাঁচুমাচু হয়ে পা-টা নামিয়ে আধ-তোলা

করে থাকল। প্রথমটা বুঝিনি, খালি পা মেঝেয় ছোঁয়াতেই তার পা তোলার কারণটা পরিষ্কার হয়ে গেল। মেঝেটা তেতে আগুন হয়ে আছে। আর যাকে আমি পা নামাতে বলেছিলাম, আমার পাশের সেই লোকটির পায়ে জুতো নেই।

বেলাবেলি কাকদ্বীপে পৌছুব বলেই এমন ঠিকদুপুরে বাড়ি থেকে বেরুনো। বেলাবেলি! কাকদ্বীপে পৌছুনো। আশ্চর্য! বছর পনেরো আগেও কথাটা কেউ ভাবতেই পারত না। কাকদ্বীপ তখন ছিল অনেক দূরের রাস্তা। নৌকোয় করে ছাড়া যাওয়াই যেত না। আসতে যেতে জোয়ার-ভাঁটার জন্যে বসে থাকতে হত। শহরে বন্দরে রাতটুকু অপেক্ষা করতে গিয়ে কত যে সব বিশ্রী বিশ্রী রোগ হত। খালের ওপর পুল আর সটান পাকা রাস্তা হওয়া অবধি কাকদ্বীপ তো এখন কলকাতার কোলের কাছে চলে এসেছে। ঘড়ি ঘড়ি বাস। এখন হুস্ করে গিয়ে হুস করে চলে আসা যায়।

আমতলা ছাড়াবার পর পেছনেব একটা বাস হুস্ কবে এগিয়ে যেতে একটা কাণ্ডই শুরু হয়ে গেল। রাস্তা এমন কিছু চওড়া নয়। পাশে হয় বড় বড় গাছের গুঁড়ি, নয় খাদ। আমাদের বাসের ড্রাইভারের মাথায় তখন রোখ চেপে গেছে সামনের বাসটাকে পেছনে ফেলতে হবে। বাসের অমন স্পীড জন্মে দেখি নি। রীতিমত ভয় করতে লাগল। সামনের বাসটা রাস্তা আট্কে আট্কে চলেছে। একটা গরুর গাড়ি সামনে পড়ায় আগের বাসটা যখন একটু থমকে দাঁড়িয়েছে, তখন আমাদের বাসটা পাশের গড়ান জমিতে কাত হয়ে কি ভাবে যে এগিয়ে গেল সে যে না দেখেছে সে বুঝতে পারবে না। ড্রাইভারের ওপর কী রাগ যে হচ্ছিল বলবার নয়। এতগুলো মানুষের (বিশেষ করে আমার) জীবন নিয়ে এমন ছেলেখেলা করবার কী অধিকার আছে তার? আগের বাসটাকে পিছিয়ে পড়ে যেতে দেখে খানিক পরে আবার ভালও লাগল। মোট কথা, প্রাণ হাতে করে শেষ পর্যন্ত ভালোভালি ডায়মণ্ডহারবারে পৌঁছে গেলাম।

কাকদ্বীপের বাস ছাড়তে তখনও খানিকটা দেরি ছিল। সেই ফাঁকে গঙ্গার ধারটা ঘুরে এলাম।

গঙ্গা না বলে হুগলী বললেই ঠিক বলা হয়। নাম যাই হোক, নদী এখানে প্রকাণ্ড চওড়া। মাঝগাঙের নৌকোগুলো এইটুকু এইটুকু দেখাচ্ছিল। পুরনো একটা কথা মনে পড়ে গিয়ে খুব হাসি পাচ্ছিল। ছেলেবেলার কতকগুলো ধারণা থাকে, বড় হয়েও মন থেকে কিছুতে যেতে চায় না। ডায়মণ্ডহারবারে সমুদ্র আছে, এ কথাটা ছেলেবেলা থেকেই শুনে আসছি। বন্ধুবান্ধবেরা গাড়ি নিয়ে ডায়মণ্ডহারবারে যেত ফুর্তি করতে, বোধহয় তাদেরই কাছ থেকে শুনে থাকব।

খুব ছেলেবেলায় আমাদের লালবাজারের বাসার সামনে থাকত আমার এক ইস্কুলের বন্ধু। জাতে সুবর্ণবণিক। তাদের ছিল লোহা-লক্করের বেশ ফলাও ব্যাবসা। গরমের সময় দু-চারদিন তাদের গাড়িতে সন্ধ্যেবেলায় ময়দানে হাওয়া খেতে গিয়েছি। তাদেব মুখ থেকে শুনতাম দক্ষিণের হাওয়া আসে ডায়মণ্ডহারবার থেকে। ময়দানে তখন ফেবি করে তপ্‌সে মাছ বিক্রি হত। শুনতাম তপ্‌সে মাছ নাকি মাছের রাজা। সাহেবসুবোরা খায়। এই তপ্‌সে মাছও নাকি ডায়মণ্ডহারবারের সমুদ্র থেকে আসে। আর যুদ্ধের সময় জাপানী গুপ্তচররা বঙ্গোপসাগর থেকে তো সটান ডায়মণ্ডহারবারেই নেমেছিল। আসলে মানচিত্রে যাই থাক, মনে মনে আমরা বরাবরই সমুদ্রকে ডায়মণ্ডহারবারের কোলে বসিয়ে এসেছি।

এককালে বাইরের জাহাজগুলো আসতে যেতে ডায়মণ্ডহারবারেই নঙ্গর ফেলত। সে আজ দেড়শো বছরেরও আগের কথা। আসতে মাল খালাস আর যেতে মাল তোলার কাজ প্রধানত এখানেই হত। তখন এখানে ছিল সারবন্দী মালগুদাম। গ্রামে খাবারদাবার জিনিসপত্র মিলত। পাশেই ছিল সাহেবসুবোদের কবরখানা। ডায়মণ্ডহারবার ছিল তখন খুব এক রংদার ফুর্তির জায়গা। দমদম নিয়ে পুরনো সেই একটা গান আছে না :

দেখো মেরি জান
কোম্পানী নিশান।
বিবি গিয়া দমদমা
উড়ি হ্যায় নিশান।
বড়া সাহেব, ছোটা সাহেব
বাঁকা কাপ্তান,
দেখো মেরি জান,
লিয়া হ্যায় নিশান।

এ গান সে সময়ে ডায়মণ্ডহারবার সম্পর্কেও খাটত।

জলপথে ডায়মণ্ডহারবার উনপঞ্চাশ মাইল হলেও, গাড়ির রাস্তায় বত্রিশ আর ট্রেণে আটত্রিশ মাইল। এককালে যে ডায়মণ্ডহারবাবের নাম ছিল হাজিপুর, সে কথাটা লোকে এখন ভুলেই গেছে।

ভিড়ে ঠাসাঠাসি হয়ে কাকদ্বীপের বাস ছাড়ল। পুলটা পার হতেই দেখলাম জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে ঝুঁকে পড়ে লোকে কী সব দেখছে। 'এইখেনে হ্যাঁ, এইখেনে'—কে একজন আঙুল দিয়ে দেখাল। পরে শুনলাম আগের দিন একটা বিশ্রী রকমেব দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। একটা লরি খালে পড়ে গিয়েছিল। জল থেকে লাস তোলা হয়েছে আজ সকালে।

বেশ কিছুক্ষণ সারা বাস থমথম করতে লাগল।

বাইরে পড়ন্ত রোদে খাঁ খাঁ করছে মাঠ। মাঝে মাঝে বেড়া-দেওয়া উঁচু উঁচু ডাঙা জমি। বেড়ার গায়ে ঘুর ঘুর করছে ছাগল। এক জায়গায় মাঠেব মধ্যিখানে একটা নিঃসঙ্গ শকুন।

এ রাস্তায় আগেও একবার এসেছিলাম। বাস তখনও চলতে আরম্ভ করে নি। তখন এ রাস্তায় যানবাহন বলতে ছিল একমাত্র ট্যাক্সি। শুধু ট্যাক্সি বললে ঠিক বলা হয় না, বলা উচিত বিশ্বম্ভর ট্যাক্সি। যেখানে গায়ে গা দিয়ে ছ-জনের বসবার জায়গা হয়, সেখানে

যে কেমন করে ভেতর-বাইরে তিরিশ চল্লিশটা লোক এঁটে গেল—না দেখলে বিশ্বাস হত না।

ট্যাক্সি ড্রাইভারটার কথা মনে আছে। সারা রাস্তা তার সঙ্গে কত কী সুখদুঃখের গল্প করতে করতে গিয়েছিলাম। লোকটা ছিল নেপালী। কিন্তু দ'খ্‌নো ভাষা বেশ রপ্ত ক'রে ফেলেছিল। স্বভাবটা ভারি মিষ্টি। গালের ওপর প্রকাণ্ড একটা কাটা দাগ। যুদ্ধের সময় মিলিটারিতে ট্রাক চালাত। কোহিমার কাছে এক পাহাড়ে বাঁক নিতে গিয়ে খাদে পড়ে যায়। কী করে যে বেঁচে গিয়েছিল সেটাই আশ্চর্য। মিলিটারি থেকে ছাড়া পাওয়ার পব পেটের ধান্ধায় অনেক জায়গায় ঘুরেছে। বছর দুই দেশে যায় নি। ছোট মেয়েটাব জন্যে মন কেমন করে। বাস হওয়ার পব থেকে এ বাস্তায় ট্যাক্সির আর কদর নেই। আবার কোথায় গেল সেই লোকটা?

মুকুন্দপুর, কাঁটিবেড়ে, মশামাবি, কুলপি, ট্যাংরাব চড়া, কবঞ্জলি পেবিয়ে সন্ধ্যে হব-হব সময়ে কাকদ্বীপে পৌছুলাম। সামনে নামখানাব বাস দাঁড়িয়ে। বনবিভাগের আপিস নামখানায়। যেতে কতক্ষণ লাগে, কত ভাড়া, সব জেনে নিলাম।

বাসস্টপ থেকে ডায়নামোর ভটর ভটর আওয়াজ শুনছিলাম। বুঝলাম এ আওয়াজ বরাবর গেলেই কৃষক সম্মেলনের মণ্ডপ পেয়ে যাব। ক'দিন ওখানেই আস্তানা গাড়া যাবে। তারপর ঠিক করা যাবে কোথায় যাব।

সম্মেলনে বিস্তর চেনা লোক মিলে গেল। সব জেলা থেকেই প্রতিনিধিরা এসেছে। আমার মত রবাহূতের সংখ্যাও বড় কম নয়। যাদের সঙ্গে দেখা হবে ভেবেছিলাম তাদের সকলের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সভা, মিছিল, সম্মেলনে যাওয়ার মধ্যেও একটা নেশা আছে। না যেতে পারলে মন খুঁতখুঁত করে। অথচ বক্তৃতা হলে যে মন দিয়ে শুনি, তা মোটেই নয়। আসলে নেশা। পুরনো বন্ধুদেব সঙ্গে দেখা হওয়া। একসঙ্গে ব'সে চা খাওয়া। দুনিয়ার হালচাল নিয়ে কথার

ভুব্ড়ি ছোটানো। খুব তেমন কাজের কাজ কিছু হয় না। কিন্তু মন বেশ হালকা হয়।

কাকদ্বীপে এই আমার প্রথম রাত কাটানো। হাটতলার কাছে একটা ছিটেবেড়ার ঘরে আমরা শোবার জায়গা পেয়েছিলাম। আলো ছিল না। মাটির মেঝেতে ঢালাও মাদুর। ঝোলাটাকে বালিশ করে শুলাম। শুয়ে শুয়ে অনেক রাত্তির পর্যন্ত গল্প। বেশির ভাগই চেনা মানুষদের খোঁজখবর নেওয়া। অমুক এখন কী করছে? সে কি! দালাল হয়ে গেছে? ভাবাই যায় না। কী গরম গরম কথা বলত সে! শুনলে ভারি মন খারাপ হয়ে যায়। অথচ জীবনে এমন তো আকছার ঘটছে। খুব ভাব ছিল, এমনও কেউ কেউ ছিট্‌কে গেছে। দূরের স্বপ্নটা হঠাৎ মুছে গিয়ে আপাত সুখে থাকার চিন্তাটা নাকের ডগায় চলে আসে। তারা গরম গরম হাতে কিছু পেলেও, হারায় তার চেয়ে ঢের বেশী। নইলে চোখে চোখ রেখে তাকাতে পারে না কেন? দেখা হলে মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে পালায় কেন?

সকালে সম্মেলনে বসে নানা জেলার অবস্থা শুনলাম। চাষীর হাত থেকে অচাষীর হাতে জমি চলে যাচ্ছে। বেনামে জমি রেখে সিলিংকে কলা দেখানো হচ্ছে। নালিশ করেও সুবিচার নেই। এ অবস্থা বেশীদিন চললে লোকে মরীয়া হয়ে উঠবে। সমস্যা যেমন জটিল, লড়াইও তেমনি জটিল। সোজা রাস্তায় হবার নয়। সমিতিতে সবাইকে জড়ো করতে না পারলে এর বিহিত হওয়াও শক্ত।

ফ্রেজারগঞ্জের একজনের সঙ্গে চায়ের দোকানে দেখা।

যাকে আমার ফ্রেজারগঞ্জ বলি, তার স্থানীয় নাম নারায়ণতলা। ফ্রেজারগঞ্জের গায়েই বঙ্গোপসাগর। জায়গাটা সম্বন্ধে আগে থেকেই আমার খবর নেওয়া ছিল। দেড়শো বছর আগে বাংলার ছোটলাট সার এণ্ড্রু ফ্রেজার এই জায়গাটা খুব পছন্দ করেছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল এখানে একটা স্বাস্থ্যনিবাস গড়ে তোলবার। লোকে এসে এখানে যাতে বসবাস করতে পারে, তার জন্যে মাটি ফেলা আর জঙ্গল কাটার

ব্যবস্থা হয়েছিল। তাছাড়া রাস্তাঘাট আর বাঁধও তৈরি করা হয়েছিল। নারায়ণতলা জায়গাটা সত্যিই খুব ভাল ছিল। দক্ষিণে ধু-ধু করছে বালিয়াড়ি, তারপর সমুদ্র। উত্তরে আর পশ্চিমে পাত্তিবুনিয়া খাল। পুবে সপ্তরমুখী নদী আর পুকুরবেড়িয়া খাল। দুই বালির পাহাড়ের মাঝখানে মিষ্টিজলের প্রকাণ্ড ঝিল। কিন্তু ফ্রেজারসাহেবের পরিকল্পনা শেষ পর্যন্ত ধোপে টিঁকল না। বহু টাকা ঢালবার পর বোঝা গেল খরচ পোষাবে না। জঙ্গল পরিষ্কার আর মাটি খোঁড়াখুঁড়ি করতে গিয়ে এই সময় কিছু বাড়ির ভিত পাওয়া গিয়েছিল, ভিতগুলোর কাছেই ছিল তেঁতুল আর মনসা গাছ। তাছাড়া এ জায়গার দক্ষিণপুবে পাওয়া গিয়েছিল চারটে ইঁটখোলার চিহ্ন আর কিছু ছড়ানো ইঁট। আগে কোনো এক সময়ে এখানে যে লোকালয় ছিল তাতে সন্দেহ থাকে নি!

সুতরাং ও অঞ্চলে অনেকদিন থেকেই আমার ঘোরবার সাধ। কিন্তু ফ্রেজারগঞ্জের লোকটি বললেন, 'সুন্দরবনে এখন যাওয়ার কোনো মানেই হয় না। খালবিল সব এখন শুকনো। কোথাও ঘুরতে পারবেন না। সুন্দরবনে ঘোরবার সময় হল বর্ষা। নৌকোয় করে তখন যেখানে খুশি যত দূরে খুশি যেতে পারবেন।'

শুনে খুব দমে গেলাম। আসবার সময় সবাইকেই বলে এসেছি সুন্দরবনে যাচ্ছি। সুন্দরবন যাওয়া মানেই তো প্রায় ডোরাকাটা বাঘের সামনে পড়া। ফিরে গিয়ে জায়গাটি শেষে খানিকটা বানিয়ে না বললেও তো মান থাকবে না। কাজেই সুন্দরবনের একটা মোটামুটি চেহারা পাঁচমুখে জেনে নিতে হল।

যা শুনলাম তাতে সুন্দরবন খুব একটা সুন্দর জায়গা ব'লে বোধ হল না। আসলে ভাটির দেশ। চারিদিকে শুধু সরুমোটা নদী, খাল, খাঁড়ি, জলা আর চড়া। কোনো চরে শুধুই জলকাদা, ছোট ছোট গাছ-আগাছার জঙ্গল। উত্তরের যেসব চরে বাঁধ আছে, সেখানে ভাল ধান হয়। সুন্দরবনের বন বলতে একটানা ছোট গাছের জঙ্গল। বড় গাছ ক্বচিৎ চোখে পড়ে। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ ফুটের চেয়ে লম্বা গাছ খুব কমই

আছে। আগে যদি কোথাও বন হাসিল করা হয়ে থাকে, তাহলে সেখানে দেখা যাবে এখন খুব ভাল বড় গাছ হয়েছে। জঙ্গল ঘন আর মাটি নোনা বলেই সুন্দরবনে গাছ ছোট। আগেকার হাসিল করা জায়গায় আগাছা কম, বেতবন আর কাঁটাঝোপই বেশী। বর্ষার সময়েই যা গাছে ফুল ফুটতে দেখা যায়। নদীর ধারে ধারে একরকমের হলুদ ফুলের বিচিত্র গাছ হয়, যার ফুলগুলো ঝরে পড়ে গেলে রং হয় লাল। জোয়ারের জলে এই লাল লাল ফুল যখন ভেসে যায়, তখন তার ওপর রোদ পড়ে ভারি সুন্দর দেখায়। আর আছে ঢোলা পাতাওয়ালা গোলপাতার গাছ। নদীর একেবারে ধার ঘেঁষে হয় সবুজ কেয়াগাছের ঝাড়। পাতাগুলো জলে নুয়ে পড়ে।

যেখানে কাকদ্বীপের বাসস্ট্যাণ্ড, তার পাশেই খালপুলের নীচে সারি সারি নৌকো বাঁধা রয়েছে ক'দিন থেকেই দেখছি। নৌকোর ওপর লাল রঙের নিশান দেখেই বোঝা যায় তারা সম্মেলনের লোক নিয়ে এসেছে। ওদের খাওয়া-থাকা সবই নৌকোয়।

সম্মেলন ভাঙবার দিন হঠাৎ একটা প্রস্তাব এসে গেল: 'যাবেন আমাদের সঙ্গে নৌকোয় মেদিনীপুর?'

আমি তো তক্ষুনি রাজী। ঠিক হল, রাত দশটায় আমি যেন খাওয়া-দাওয়া সেরে সটান নদীর ঘাটে চলে যাই। জোয়ারের মুখে হলদিয়ার নৌকো ছাড়বে।

আমরা সবাই ঠিক সময়েই পারঘাটার মুখে এসে জড়ো হয়েছিলাম। খানিক পরে 'এসো গো' বলে খালের মুখে হাঁক শোনা গেল। অন্য সকলের দেখাদেখি আমিও ছুটলাম। খানিকটা যাওয়ার পরই জুতো খুলতে হল। বেজায় কাদা। নৌকোর কাছে হাঁটুজল। অত কাণ্ডকারখানা ক'রে যাওয়ার পর শুনলাম নৌকো ছাড়তে এখনও ঢের দেরি। সামনে একজনের হাতে হারিকেন। সামনে সমস্তই ছায়া ছায়া। অনেকক্ষণ কাদাজলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে কে একজন বলল, 'এসব জলে বড় কাঙট, ডাঙায় ওঠো হে, হ্যাঁ—।'

নৌকো ছাড়ার ব্যাপারটা কিন্তু বোঝা যাচ্ছিল না। ঘাটে চাঁদের আলো ছাড়া কোনো আলো নেই। দলের একজনই আমার চেনা। তাকেও ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে ফেললাম। একজন যেন মনে হল আমাদেরই দলের। তাদের সঙ্গে সঙ্গে যেখানে এসে উঠলাম তার পাশেই লঞ্চ-ষ্টিমারের জেটি। বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারলাম না। আঁশটে গন্ধে বেশ বুঝলাম এটা মাছ-ওঠাব ঘাট। আবছা অন্ধকারে মাছের খালি চুপড়িগুলো এতক্ষণে ঠাহর করতে পারলাম। যে দলটাকে ছেড়ে এসেছিলাম, ফিরে গিয়ে তাদেব পাশেই একটা খালি জায়গা বেছে নিয়ে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসলাম। তারপর সারাদিনের ক্লান্তিতে কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছি জানি না। হঠাৎ মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে দেখি বারান্দায় আমি একা। দলের সবাই উঠে চলে গিয়েছে। ভারি রাগ হল। আমি তো এখানেই ছিলাম, ডাকল না কেন? উঠে এখন যাবই বা কোথায়? রাতটুকু এখানেই কাটিয়ে দিই। তারপর সকালে উঠে বাড়িব ছেলে বাড়ি।

রাত তিনটে সাড়ে তিনটের সময় হঠাৎ একটা বিকট আওয়াজে ঘুম ভেঙে গেল।

'হলদিয়া যাবে গো, হলদিয়া।'

তড়াক ক'রে লাফিয়ে উঠলাম। আমি তো হলদিয়াতেই যাব। আর এক মিনিটও দেরি করা নয়। জুতোজোড়া হাতে নিয়েই খালমুখে ছুট লাগালাম। কাদার ভেতর দিয়ে থপ থপ করে এগিয়ে নৌকোর কাছে গেলাম। নৌকোর মাথার ওপর থেকে একজনের গলা পেলাম। 'আসুন, আসুন—থপ ক'রে আসুন। ছিলেন কোথায় এতবেলা? আমি তো ভাবতে ছিলাম আর এলেনই না।' দড়ির মই বেয়ে ওপরে উঠে গেলাম। চোখে ভাল ক'বে ঠাহর হচ্ছিল না। ওঠবার পর বুঝলাম নৌকোটা প্রায় দোতলা সমান উঁচু।

নৌকো যখন ছাড়ল, তখনও অন্ধকার। ঘাটের যে আলোগুলো দেখতে পাচ্ছিলাম, আস্তে আস্তে সেগুলো চোখের আড়ালে চলে গেল।

একটা বন্ধ ভাব। হাওয়ায় রীতিমত শীত-শীত করছে। ডানদিকের আকাশে ছেঁড়া-ছেঁড়া আলো। এবার আমরা উত্তরমুখো চলেছি। আরো খানিকক্ষণ পর আলো যখন আরো স্পষ্ট হল, তখন চেয়ে দেখলাম কোনো দিকে কোথাও মাটির কোনো চিহ্ন নেই। জলের এত বড় ঢেউ জন্মে দেখি নি।

কোথায় এসে পড়লাম? এ নদী, না এ সমুদ্র? নদীতে কখনও এত উঁচু ঢেউ হয়? এতক্ষণে পুরো নৌকোটা নজরে পড়ল। একে বলে বোটনৌকো। এ নৌকোয় করে লোকে সাগরে যায়। পালে পুরো হাওয়া লাগছে। নৌকো চলেছে সাঁই সাঁই বেগে। একটা ধার একেবারে কাত হয়ে গেছে। আমরা সেই দিকটায় ব'সে। ঢেউয়ের ফেনাগুলো লাফিয়ে লাফিয়ে গায়ে এসে লাগছে। জলে গড়িয়ে পড়ার ভয়ে মাঝে মাঝে উঠে বসতে হচ্ছিল। নৌকোর মাঝখানটায় হঠাৎ একটা খোদল চোখে পড়ল। উঁকি দিয়ে দেখলাম সরু একটা সিঁড়ি নেমে গেছে। একজন লোক ওপর থেকে উঠে সেই সিঁড়ি দিয়ে খোলের মধ্যে নেমে গেল। তারপরই শুনতে পেলাম খোলের মধ্যে কে একজন বমি করছে। নৌকোর ছুলুনিতে যাদের গা পাকিয়ে ওঠে, শুনলাম তারা খোলের মধ্যে বসে যায়।

ঢেউয়েব ছিটে আর ঝিরঝিবে হাওয়া খেতে খেতে নৌকোর টঙে বসে যেতে আমাব বেশ ভাল লাগছিল। ভয়টাও আস্তে আস্তে গা-সওয়া হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে চলেছে কমবয়সী একটা ছেলে। বছর বাইশ বয়স। মেছেদায় পানের বরজ আছে। নিজে হাতে চাষ করে। এটা ওটা তাকে জিজ্ঞেস করছিলাম।

আছিপুর জানেন তো? গঙ্গা যেখান থেকে বাঁক নিয়েছে। দামোদর আর রূপনারায়ণের জল পড়ে হুগলী পুবে আট মাইল বেঁকে গেছে। ডায়মণ্ডহারবারের পর থেকে হুগলী আবার দক্ষিণবাহিনী। সাগরে পড়বার আগে মোহানাটা প্রায় ষোল মাইল চওড়া। এই মুখকে লোকে বলে বুড়া মন্ত্রেশ্বর। সাগরে পড়বার আগে হুগলী দুভাগে ভাগ হয়ে

গেছে। এরই জোড়ের মুখে সাগরদ্বীপ। সাগরদ্বীপের পুবে যেটা গেছে সেইটাই বারতলার মোহানা। লোকে বলে মুড়িগঙ্গা। নানা খাঁড়ির জল নিয়ে এই ধারাটা ধোবলাটের পুবে সমুদ্রে পড়ে।

সাগরদ্বীপের কথা বলতে বলতে ছেলেটা মজনতালি সঈফের গল্প বলল। মজনতালি সঈফ গঙ্গাসাগরের এক পীর। একদিন নাপিতের কাছে খেউরি করতে করতে পীর হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়। নাপিত তো ক্ষুর হাতে নিয়ে বসেই আছে। বেশ খানিকক্ষণ পরে পীর এসে হাজির হল। গা দিয়ে তার দর দর করে ঘাম ঝরছে। নাপিত জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ হাওয়া হয়ে গেলে কোথায়? পীর বলল, চড়ায় আটকে গিয়েছিল জাহাজ; খালাসীরা তাই ডেকেছিল। কী আর করি, টানতে টানতে জাহাজটাকে ভাসিয়ে দিয়ে এলাম। নাপিত কিন্তু পীরের কথা বিশ্বাস করে নি। ফলে, তার কী শাস্তি হল জানেন? সেইদিনই সে আর তার বাড়ির সবাই শিঙে ফুঁকল।

ব'লে ছেলেটা হো হো করে অবিশ্বাসীর হাসি হাসতে লাগল।

কিন্তু তার পরের প্রশ্নটা শুনে আমি থ হয়ে গেলাম।

'পাতালে-এক-ঋতু পড়েছেন আপনি?' পড়ি নি শুনে খুব অবাক হল। বলল, লেখক দীপকবাবু আমাদের ওদিকে এসেছিলেন একবার একটা মিটিঙে। আমার সঙ্গে খুব তর্ক হয়েছিল।

খানিকক্ষণ কথা বলেই বুঝলাম হালের কোনো উপন্যাসই তার না-পড়া নয়।

মাঝে মাঝে একেকটা চর যায় আর ছেলেটা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেখিয়ে বলে, বুঝলেন এটা ঘোড়ামারার চর, এটা লোহাচর। কোনো কোনো চরে নাকি পোস্টাপিস আছে, সেভিংস্ ব্যাঙ্ক আছে, তাও ওর মুখ থেকেই শুনলাম।

যেতে যেতে আকাশে রোদ বেশ ভালভাবেই উঠে গেল। কিন্তু জলো হাওয়া থাকায় একটুও কষ্ট হচ্ছিল না। সামনে একঘেয়ে জল নেই আর। দু-পা গেলেই একটা ক'রে চর। জেমস্-অ্যাণ্ড-মেরী

চড়ার নাম শোনেন নি? বহুকাল আগে সেই চড়ায় আট্‌কে একটা জাহাজ ডুবেছিল। জাহাজটার নাম ছিল রয়াল জেমস্ অ্যাণ্ড মেরী।

ডেকে দেখাল বাঁদিকে হল্‌দি এসে হুগলীতে পড়েছে। রোদ পড়ে ভারি সুন্দর দেখাচ্ছিল। দেখতে দেখতে হল্‌দিয়া এসে গেল। নতুন বন্দর হচ্ছে হল্‌দিয়ায়। চারদিকে তার তোড়জোড়ের চিহ্ন। নদীর বেশ খানিকটা ভেতরে জেটি। জলের ওপর বড় বড় বয়া ভাসছে।

ডাঙায় নেমে অনেকের সঙ্গেই ছাড়াছাড়ি হল।

বাঁধের ওপর দিয়ে রাস্তা। আমরা যাব রানীচক। সন্দিয়ার চক হয়ে দক্ষিণ রানীচকে যখন পৌঁছলাম, তখন বেশ বেলা হয়েছে। এ গাঁয়ে থাকে পতিতদার এক মামাতো ভাই। ভুবন জানা। চায়ের জন্যে তখন মরে যাচ্ছি। ভুবন জানার মা কিন্তু নাছোড়বান্দা। দুধচিঁড়ে খাইয়ে ছাড়লেন।

গাঁয়ে যার সঙ্গেই কথা বলি এক কথা। হল্‌দিয়ার বন্দর হবে। আটষট্টিটা মৌজার ওপর নোটিশ হয়েছে উঠে যেতে হবে। আস্তে আস্তে রাস্তায় যতটা চোখ পড়ল, মনে হল এদিককার বসতি খুব ঘন। দক্ষিণ রানীচকে দুশো ঘর লোকের বাস। পাঁচমিশেলী গ্রাম। পাঁচভাগের একভাগ মুসলমান। পঞ্চাশ ঘর ধোপা। একঘরই শুধু কাপড় কাচে। বাকি সবাই ঘরগেরস্তি করে। জাতব্যাবসার পুরনো পরিচয়টাও এখন আর তারা দিতে চায় না। নিজেদের তন্তুবায় বলে। বলে, শুক্‌নি তাঁতী।

ব্রাহ্মণ আছে তিন ঘর। চাষবাস করেই খায়। তবে একটু নল্‌চে আড়াল করার ব্যাপার আছে। তাই জমিতে লাঙল দেওয়ার কাজটা অন্যদের দিয়ে করিয়ে নেয়। বাকি সবই—ধান রোয়া, ধান কাটা—নিজেরাই করে। তাছাড়া গ্রামে পুজো-পার্বণ বিয়েশ্রাদ্ধে টাকাটা সিকিটা মেলে।

দু-ঘর নাপিত আছে, তাদের উপজীবিকা চাষবাস।

গ্রামের আর যারা, তারা সবাই মাহিষ্য। কৈবর্ত কথাটা অনেক-

দিন আগেই উঠে গেছে। এদিকের গোটা তল্লাটই মাহিষ্যপ্রধান। চাষবাসই তাদের জাতের জীবিকা।

জীবিকা চাষ হলে হবে কি, গ্রামের প্রায় অর্ধেকই জমিহীন ক্ষেত-মজুর। নিজেদের বাস্তুটুকুই তাদের সম্বল। তাদের বেশির ভাগই ভাগচাষী।

ঘর পিছু একশো পঁচিশ থেকে একশো ত্রিশ একর জমি আছে, এমন জোতদার গ্রামে তিন ঘর। গ্রামে আর আছে দু-ঘর রায়ত চাষী। তাদের দু-এক একর করে নিজস্ব জমি আছে। অভাব-অভিযোগ থাকলেও তারা ভাগে চাষ করে না। দায়ে অদায়ে ধারদেনা হায়হাবাক্ত করে চালায়। ভাগচাষীদের মধ্যে বারো আনা অংশের কিছুটা রায়ত-জমি, কিছুটা ভাগচাষ। অন্যদের ছিটেফোঁটাও জমি নেই। মুসলমান পাড়ার দশ আনা লোক দিনমজুরি ক্ষেতমজুরি করে পেট চালায়। কয়েক জনের সঙ্গে আলাপ হল। নামগুলো এখনও মনে আছে শেখ তালেব, শেখ দেবু, শেখ কানাই, শেখ এক্তার, শেখ রাখাল।

বিকেলে বেরিয়ে পড়লাম রানীচক থেকে। রাতটুকু রত্নার চকে থেকে সকাল বেলায় রওনা দেব। রত্নার চকে পৌঁছে দিতে সঙ্গে এল গুণধর। মাঝখানে অনেকগুলো গ্রাম। সাউতান চক, হাতিবেড়ে, চক তাড়ুয়ান, বিশ্বনাথ দত্তের চক। তারপর রত্নার চক। কমখানি রাস্তা নয়। গোটা তল্লাটের ওপরই উচ্ছেদের খাঁড়া ঝুলছে।

মন্বন্তরের বছরগুলোতে এ অঞ্চলে কিছুটা কিছুটা ঘুরেছিলাম। সে আমলে হিন্দু চাষীর বাড়িতে মুরগি পুষতে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ে না। এবার দেখলাম ঘরে ঘরে মুরগির চাষ। কেউ কেউ আছে ডিম খায়, মাংস খায় না। কারো কারো দুটোই চলে। রাস্তায় কোনো চায়ের দোকান দেখলাম না। মুদির দোকান ময়রার দোকানও চোখে পড়ল না।

অনেকগুলো বাড়ির দেখলাম জীর্ণদশা। গুণধর বলল লোকে এখন আর বাড়িঘর সারাচ্ছে না। উঠেই যখন যেতে হবে তখন আর ডোবা-

পুকুর সংস্কার করিয়ে, ঘরবাড়ি সারিয়ে কী লাভ ? ফলে, ঘরামীরা ঠায় ব'সে। কেউ আর উলু কাটছে না। খড়েরও দাম পড়ে গেছে। সূতা-হাটা থানার আটষট্টিটা মৌজা জুড়ে এখন একটা থমথমে ভাব। জমির ভালোমন্দ হিসেবে জমির দাম এখানে চার পাঁচশো টাকা থেকে হাজার দেড় হাজার টাকা বিঘে। সে দর আর থাকছে না। হু হু করে পড়ে যাচ্ছে।

কেউ কেউ এই মওকায় জলের দরে জমি কেনবার মতলব ভাঁজছে। সরকার যে দরে জমি নেবে সে দরটা অবশ্য সুবিধের নয়। তিন বছরে শোধ করার শর্তে বিঘে পিছু তিনশো টাকা। যাদের জমি আছে, তারা সকলেই মাথায় হাত দিয়ে বসে আছে। উঠে তো যেতেই হবে। কিন্তু যাবে কোথায় ? ও-দামে এমন জমিই বা পাবে কোথায় ? তার ওপর মানুষের ভিটে ব'লে কথা। বাপদাদার স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেই ভিটেমাটিতে। কেউ কেউ গ্রামের মায়া কাটিয়ে আগেভাগে কোথাও ভালো জমিজায়গা দেখে উঠে যাচ্ছে। এর পরে সে-সব জায়গার জমির দর আরও বেড়ে যাবে। যারা থেকে যাচ্ছে, তারা উপায় নেই বলেই থাকছে। নতুন জায়গায় গিয়েই কি শান্তি আছে ? জমি হলেই তো হয় না। এ জমির সঙ্গে কতদিনের চেনা-জানা খিদমত-খাতির। এইটুকু বয়েস থেকে। নতুন জমির ভাবগতিক বুঝতে, তার সঙ্গে ভাব করতেই তো ঢের দিন যাবে। পাড়াপড়শী সবই হবে নতুন। এ তো উঠে যাওয়া নয়, একেবারে যাকে বলে জলে-পড়া।

এ অঞ্চলের ছেলের বাপদের হয়েছে আরেক মুস্কিল। বিয়ের বাজারে ছেলের দর সাংঘাতিক পড়ে গেছে। ছেলের বিয়ে দিয়ে যারা মেয়ের বিয়ের দেনা শুধবে ভেবেছিল, তাদের এখন মহা অশান্তি। তার ওপর উঠন্ত সংসারে মেয়ে দিতেও মেয়ের বাপেরা এখন কিন্তু-কিন্তু করছে।

কথা বলতে বলতে যখন রত্নার চকে এসে পৌছলাম, বাড়িতে বাড়িতে তখন সন্ধ্যে জ্বলে গেছে। সটান উঠলাম শ্রীহরি দিন্দার বাড়ি। উঠোনে

আমকাঁঠালের গাছ। মাচার ওপর লতানো লাউগাছ তুলসীতলায় পিদিম জ্বলছে।

রত্নার চক গ্রাম খুব বড়ো নয়। মোট বিয়াল্লিশ ঘর লোক। দু-পাঁচ ঘর ক্ষেত মজুর; থাকার মধ্যে শুধু বাস্তু। একঘর রায়তচাষী, তাদের বিঘে চল্লিশ জমি। বাকি সবাই ভাগচাষী। পীতাম্বর চকের বেরা আর পাড়ুইদের জমি তারা ভাগে করে। ছ-সাত ঘর বাগ্দী, এক ঘর বামুন, দু ঘর করণ; বাকি সবাই মাহিষ্য।

এদিককার গাঁয়ের অবস্থা আগে যা ছিল, এখন তার চেয়ে ভালো। আগে যাদের বছরে ন-মাস উপোষ করতে হত, এখন তারা বছরে ন-মাস দু-মুঠো খেতে পায়। আগে বেশির ভাগ বাড়িতেই চৈত্র বৈশাখেই খোরাকি ফুরিয়ে যেত। তখন তারা দাদন আনতে যেত বেরাদের বাড়িতে। বেরারাও সেই মওকায় তাদের বেগার খাটিয়ে নিত—ঘাস নিড়োনো, জ্বালানির কাঠ চেলা করার কাজ করিয়ে নিত। দাদন এক বারে দিত না। দেদার ঘোরাত।

বছর পনেরো ষোল আগে এখানে বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষা তুলে ধর্ম-গোলা করা হয়। ধর্মগোলায় জমার পরিমাণ এখন বেড়ে হয়েছে সাড়ে তিনশো মণ। ফলে, আজ আর কাউকে মহাজনের বাড়িতে দাদন নিতে যেতে হয় না।

ধর্মগোলা থেকে ধান নেবার সাধারণ নিয়ম হল, এক মণ ধান নিলে এক মণ দশ সের ফিরিয়ে দিতে হবে। তবে ফসল ভাল না হলে সুদ মাপ হয়ে যাবে। কিন্তু আসলটা শুধতেই হবে। তা ছাড়া ধর্মগোলার হাতে আছে নগদ এক হাজার টাকা। মাসে টাকায় এক পয়সা সুদে এই টাকা অভাবগ্রস্তদের মধ্যে বিলি হয়। টাকাটা ওঠে এইভাবে: ছেলের বিয়ে হলে ন টাকা, আর মেয়ের বিয়ে হলে এক টাকা গ্রামকে মান্য দিতে হয়—তাকে বলে 'বাপ' দেওয়া। বাইরের বরপক্ষ বা কন্যাপক্ষকেই এ টাকা দিতে হয়। তা ছাড়া গ্রামে যে বিচার-আচার হয়, তাতে যে জরিমানার টাকা ওঠে, তাও এই ধর্মগোলার তহবিলেই

জমা পড়ে। এ ধরনের ধর্মগোলা এ-দিগরে শুধু এই গাঁয়েই আছে।

শ্রীহরির বয়স বেশী নয়। বছর পঁয়ত্রিশ হবে। চোখেমুখে বেশ একটা তাজা ভাব। বাপ-মা মারা গেছে ছেলেবেলায়। তিন ভাইয়ের মধ্যে সেই শুধু এখন বেঁচে। শ্রীহরি মেজো। দাদার তিন মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে। বড়দার সম্পত্তি ভাগ করে নিয়ে বিধবা বৌদি আছেন তাঁর এক মেয়ে-জামাইয়ের কাছে। ছোট ভাইটা বছর চারেক আগে কলেরায় মারা যায়। ছোট ভাইবৌ আছে বাপের বাড়ির সংসারে। দুই ছেলে, এক মেয়ে আর বউ—এই নিয়ে এখন শ্রীহরির সংসার। নিজের আছে তিন বিঘে আর ভাগে বিঘে চারেক জমি। তাইতে কোনোরকমে বছরের খোরাক হয়ে যায়। দুটো আছে হালগরু, দুটো গাইগরু আর দুটো বাছুর।

বাড়িতে লোক এসেছে শুনে পাশের বাড়ি থেকে এলেন শ্রীহরির জেঠিমা প্রভাবতী দিন্দা। বিধবা মানুষ। বয়স কম। মেয়েদের নিয়ে সমিতি করেছেন। ঐসব নিয়েই থাকেন। লেখাপড়া জানেন না বলে খুব দুঃখ। পড়বেন বলে একবার বইও কিনেছিলেন। পড়ানো দূরে থাক, সবাই এমন ঠাট্টা শুরু করে দিল যে বইখাতা কুলুঙ্গিতেই তোলা থাকল। রাত্তিরে দল বেঁধে অনেকক্ষণ পর্যন্ত গল্প হল। গ্রামের লেখাপড়া নিয়ে।

রানীচক গাঁয়ে এবার এই প্রথম কৃষকের ঘরের চারজন ছেলে বি-এ পাশ করেছে। গোটা থানায় আগে হাইস্কুল ছিল দুটি। একটা এখান থেকে বারো মাইল দূরে, আরেকটা আট মাইল দূরে। পঞ্চাশ একান্ন সাল পর্যন্ত এই ছিল অবস্থা। এখন সেখানে পাঁচটা হাইস্কুল। সবচেয়ে কাছেরটা দু মাইল দূরে—ভবানীপুর গ্রামে। থানায় জুনিয়র হাইস্কুল তিনটি। সবে দু এক বছর হল হয়েছে। কাছেরটা মাইল-খানেকের মধ্যে। সবচেয়ে দূরেরটা এখান থেকে দশ মাইল। এই ইউনিয়নে ইউ-পি স্কুল চারটি। এখন প্রায় প্রত্যেক বাড়িতেই কেউ না কেউ ইস্কুলে পড়ে। এ পর্যন্ত এ গাঁয়ের মোটে একটি ছেলে ম্যাট্রিক

পাশ করেছে। সে, এখন মহিষাদল কলেজে পড়ছে। বড় ভাই লেখাপড়া করে নি, চাষের কাজ করে। নিজেদের বিঘে তিনেক জমি, ভাগে নিয়েছে বিঘে পাঁচেক।

এ অঞ্চলে মেয়েদের স্কুল হয়েছিল পীতাম্বর চকে যুদ্ধের গোড়ার দিকে। ইউ-পি স্কুল। একশো দেড়শো মেয়ে পড়ত। তিনজন মাস্টারনী, একজন মাস্টার। গিবীশ জোতদার ছিলেন সেক্রেটারী। তিনি ইংরিজি জানতেন না। স্কুলেব তবু পাকা বাড়ি হয়েছিল। কিন্তু সেক্রেটারী হওয়া নিয়ে এমন গোলমাল লাগল যে শেষ পর্যন্ত স্কুলই উঠে গেল। ইস্কুলের অমন সুন্দব পাকা বাড়িটা মাটিব সঙ্গে মিশে গেল। এখন মেয়েদের ইস্কুল থানায় তিনটি। তার মধ্যে দুটি হাইস্কুল আর একটি মাইনর। হাইস্কুল এখান থেকে আট মাইল আর মাইনর স্কুল তিন মাইল দূবে। সোলাট গ্রামেব মাইনব স্কুলে এ গাঁয়ের মোটে একটি মেয়ে পড়ে। মেয়েটি বোর্ডিংএ থাকে। থাকা আব পড়ার কোনো খবচ নেই। খাওয়া বাবদ লাগে মাসে আধ মণ চাল আর পাঁচটা কবে টাকা।

সকালে উঠে মনটা খাবাপ হয়ে গেল। এমন একটা আত্মীস্বয় গ্রাম আর কদিন পব বাংলা দেশ থেকে মুছে যাবে। ধর্মগোলাটা ভেঙে যাবে। মানুষগুলো এখানে সেখানে ছিটকে যাবে। শ্রীহরির সঙ্গে কথা বলে দেখলাম, সে তেমন ঘাবড়ায় নি। বলল, দেখুন এই উঠে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে বুড়োদেব সঙ্গে আমাদের একেবারেই বনিবনা হচ্ছে না। বুড়োরা চাইছে অন্য কোথাও জমিজায়গা আর পারলে মোটা রকমের খেসারত। আমরা চাইছি বন্দরে চাকরিবাকরি নিয়ে কিংবা স্বাধীন কোনো ব্যাবসা ফেঁদে এখানেই থাকতে। আর কিছু না হোক, লরি চালানোটাও তো জোয়ান ছেলেরা শিখে নিতে পারবে।

তখন আমার বেরিয়ে পড়বার সময় হয়ে গেছে। জেঠিমাকে ডেকে বিদায় নিলাম। জেঠিমা বললেন, 'এখন তো আমরা পাখির মত খাঁচার কাঠি গুনছি। একটু সোয়াস্তি হলে আবার এস।'

আসব ব'লে সকলের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লাম। যেতে যেতে শ্রীহরির কথাটা কিন্তু আমাকে সারা রাস্তা ভাবাল। রাস্তায় প'ড়ে ক্যাঁচর ক্যাঁচর আওয়াজে ঘাড় তুললাম। দেখি গাছের ডালে একটা মাছরাঙা। তারপরই কোথায় যেন একটা কোকিল ডেকে উঠল।

নতুন রাস্তা হচ্ছে। আর কিছুদিন পরে এসব জায়গা গমগম করবে। শীতের ক'টা মাস এখনই তো বাস চলে। রাস্তা হচ্ছে বলে এখন বাস বন্ধ। অনেকখানি রাস্তা এখন আমাকে হেঁটে যেতে হবে। ডায়মণ্ডহারবারের এপারে কোঁকড়াহাটি। তার আগে চৈতন্যপুর। সেখানে তমলুকের বাস মিলবে।

পড়িয়ার চক থেকে ফরেস্ট শুরু। ঝাউবনে ঝিরঝির করছে বাতাস্। এ বনে ভাল কাঠ হয়। গাছ থাকায় নদীও পাড় ভাঙতে পারে না। তমলুক মহকুমায় বনবিভাগের ছ-টা আপিস। তার একটা বালুঘাটার বাজারে।

দোকানে বেঞ্চিতে ব'সে একটু চা খেয়ে নিলাম। রাস্তার ধুলো তখনই তেতে উঠেছে। চর বাজিতপুরে এসে আর হাঁটা সম্ভব হল না। পকেটের অবস্থা সুবিধের নয়। খানিকটা বেপরোয়া হয়েই শেষ পথটুকু সাইকেল রিক্সা নিতে হল। তারপর চৈতন্যপুর থেকে বাস।

ঠিকানাটা আগেই নেওয়া ছিল। মেছেদায় এসে নৌকোয় আলাপ হওয়া ছেলেটার বাড়ি খুঁজে বার করতে বেশী বেগ পেতে হল না। পানের বরজ থেকে তাকে ডেকে আনা হল। চা জলখাবার না খাইয়ে কিছুতে ছাড়ল না। দুজনে হাঁটতে হাঁটতে স্টেশনে চলে এলাম। সাহিত্য নিয়ে নানান কথা হল। বলল এখনও লেখবার কথা কিছু ভাবে নি। তবে কোনোদিন হয়ত লিখতেও পারে।

স্টেশনের কাছেই পানের বাজার। মেছেদা থেকে রেলে গড়ে পাঁচ শো টুকরি পান দৈনিক চালান যায়। বেশির ভাগ যায় বাংলার

বাইরে। বাকিটা কলকাতায়। মুখে মুখে হিসেব করে দেখলাম রোজ প্রায় লাখ চল্লিশেক পান পাতা এখান থেকে যায়। এ অঞ্চলে পান চাষের বয়স বেশী নয়।

পান চাষ এ তল্লাটে প্রথম আবম্ভ হযেছিল চার নম্বব ইউনিয়নের চাটরা বল্লুক গ্রামে। সে আজ প্রায় এক শো বছর আগে। শুধু পান চাষ করে এমন লোক কমই আছে। ধান-পান দুটোরই চাষ করে বেশির ভাগ লোক। তবে পানই হল প্রধান অর্থকরী ফসল। ঘন বসতি, জমি কম এবং পান বেচে টাকা বেশী পাওয়া যায়—তাব জন্যেই পানচাষের দিকে এদিককাব লোকের এত নজর।

বাংলাদেশে মিঠে পান একমাত্র এখানেই হয়। মিঠে পান আবাব বেলে মাটি ছাড়া হয না। চাষে ডবলেবও বেশী খরচ। সাবও দিতে হয প্রচুব। অঘ্রান থেকে জষ্টি পর্যন্ত বিক্রি হয় গোড়া পান। বছবে প্রধান বিক্রি এই পান। তাছাড়াও বাবো মাসই কিছু না কিছু পান কাটা আর বিক্রি হয়। পান বিক্রি হয় গোছ, শ' আর হাজার হিসেবে। পঞ্চাশটা পান নিয়ে হয় এক গোছ।

এখানকার চাষীরা পাইকারদের কাছে সেরা মিঠে পান বেচে তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকা হাজার। সে পান যায় বিকানীর, জয়পুর, যোধপুর, নাগপুর, বোম্বাই, দিল্লী, আগ্রা, মুসৌরি। নিবেস পান বিক্রি হয় পনেরো টাকা হাজাব। দর পড়ে গেলে কখনও কখনও সেরা পানও ঐ দরে বেচতে হয়। পানের টুকবি পিছু পাইকাররা পায় দু টাকা করে। গাছের মূল থেকে যেটা বেরোয়, সেটা খাড় পান—ভাল পান। আর ভাল পানের গোড়া থেকে ফ্যাকড়া বেরিয়ে সরু বোঁটায় এক সঙ্গে তিনটে থেকে ছটা যে পান ধরে, তাকে বলে পালা পান। পালা পান হল নিরেস পান।

মিঠে পান ছাড়াও এ অঞ্চলে বাংলা পান আর সাঁচি পান হয়। মিঠে পানেব গাছ দশ থেকে পনেবো বছর থাকে। পাঁচশো সারি গাছের ভালো বরজ করতে জায়গা লাগে পাঁচ কাঠা। তা থেকে রোজগার

হয় দেড়-ছু হাজার টাকা। খরচ পড়বে হাজার টাকার মতো। এ হল যখন বাজার দর ভালো থাকে তখনকার হিসেব।

চাষীরা বলে, বরজ মানে রোজ — রোজ যেতে হবে। বেশী গরম বেশী ঠাণ্ডা -- এর কোনোটাই পানগাছের সয় না। তাছাড়া বরজে পোকা লাগে, পানের রোগ হয়—পান চাষে ঝকমারিও অনেক।

একটা বোগ আছে। তার নাম চিংলা। পানেব গায়ে বসন্তের দাগের মতো হয়। সে পান এখানে চার আনা শ'। চিংলা থেকে হয় আভারি। পানের লতা পচে যায়। গাছের এক জায়গায় পচ ধরে, পরে গোটা গাছটাই মরে যায়। ঝল্‌মা বোগে পানের বং পোড়া হয়ে যায়। আবহাওয়া বদলে গেলেই এ রোগ সেরে যায়। অতিরিক্ত রোগে পানেব হয় তসর‍্যা — পান হয়ে যায় তসরের মত। পাতাগুলো হয় পাঁশুটে লাল। এ রোগে গাছও যায়, পানও যায়। ফোস্কা ধরার সঙ্গে সঙ্গে পাতাগুলো ফেলে দিতে হয়। সবচেয়ে মুস্কিল হল, পানের রোগব্যাধি সম্বন্ধে চাষীদের যেটুকু আছে তা হাতুড়ে বিদ্যে। সরকারি কৃষিবিভাগেব আছে অনেক ভালো গবেষণাব জ্ঞান। কিন্তু দুটোব মধ্যে লেনদেন কম।

ঠিক হল, ছেলেটি সন্ধ্যেবেলা আমাকে কোলাঘাটে পৌছে দিয়ে আসবে। বাতটা ওখানে কাটিয়ে ভোববেলাব ট্রেনে আমি কলকাতায় পাড়ি দেব।

রূপনাবায়ণের ব্রিজ হচ্ছে। দীঘায় যাবার রাস্তাও তৈরী। তাছাড়া সোজা বোম্বাই পর্যন্ত ন্যাশনাল হাইওয়ে। শুধু ব্রিজটার অপেক্ষা। সেই দিনটার জন্যে কোলাঘাটও অপেক্ষা করে আছে। এখন তো কোলাঘাট বলতে দেনান গ্রাম থেকে পাইকপাড়ি পর্যন্ত মাইল দুয়েক নদীর ধারের জায়গা।

আগে নাম শুনে ভাবতাম কোলাঘাট না জানি কী বড় জায়গা। সিনেমা মোটে একটা। শহরের লোক বলতে ব্যাবসাদার আর ডেলি-প্যাসেঞ্জার। গাড়ি নেই। শুধু বড় বড় বাড়ি। পোশাক-পরিচ্ছদে

বাহার নেই। শৌখীন স্থায়ী নাট্য সম্প্রদায় নেই। মাঝে মাঝে বাইরে থেকে যাত্রা, কবিগান, পুতুলনাচের দল আসে। কলেজে-পড়া ছেলেরা চায়ের দোকানে বসে তর্ক ক'রে গলা ফাটায় না। পাবলিক লাইব্রেরি আছে। পড়ুয়া ষাট-সত্তর। রাজনৈতিক সভা হলে তেমন লোক হয় না। বড়লোক যথেষ্ট। তাদের লাখ লাখ টাকার কারবার। ইউনিয়ন বোর্ডের কলকাঠি নাড়া পর্যন্ত তাদের পাবলিক অ্যাকটিভিটিব দৌড়। কিন্তু ব্যস, ঐ পর্যন্ত।

একেবারে নেহাতই কাঠ, পাট, কয়লা, ধানচাল আমদানি রপ্তানির জায়গা। তবে ব্রিজটা একবার হয়ে গেলে কী হবে এখনও বলা যাচ্ছে না। এখানে কাঠেব আট দশজন বড় বড় আড়তদাব। কাঠ আসে কটক নাগপুর শিলিগুড়ি থেকে। যায় হাওড়া, হুগলী, মেদিনীপুব। কড়িবরগার জন্যে শাল, চাকুন্দা, লোহাশাল, কটকী শাল, পিয়া শাল; খুঁটির জন্যে বাতিকাঠ। আসবাবেব জন্যে সেগুন, সিসু।

মযনা, দাসপুব, আরও নানা জাযগা থেকে আসে পাট। পাটের আড়তদাবি মাড়োয়ারিদেব একচেটে। কয়লার আড়তদাররা স্থানীয় বাঙালী। ধানচালে বাঙালীও আছে, মাড়োয়ারিও আছে। মাছের কারবার মরশুম-নির্ভর। আড়ত একটাই।

ছেলেটি কার হাতে আমাকে সঁপে দিয়ে গেল বোধহয় জানত না। ভাগে রুগী দেখার এক ঘরে বাত্তিরে আমাব থাকাব জায়গা হল। সারাদিন স্নান হয় নি। সামনে এক সিনেমা হাউসে গিয়ে অন্ধকারে টিউবওয়েলের জলে আরাম করে স্নান সেরে নিলাম। পকেটে পয়সা নেই। ক্ষিধেও পেয়েছে খুব। চা দিয়ে ক্ষিধেটাকে একবেলার মত মেরে নেওয়া গেল।

এতক্ষণ চেয়ারেই বসে ছিলাম। এবার শোবার জায়গাটার দিকে তাকালাম। রবারক্লথ-পাতা রুগী দেখার বিছানা। তার ওপর নীচেয় রক্তমোছা তুলো। শোবার চিন্তা মাথায় উঠে গেল। ঠিক করলাম চেয়ারে বসেই যতটুকু পারব ঘুমিয়ে নেব। রাত এগারোটা নাগাদ সেই

ভদ্রলোক এসে হাজির। দেখতে এসেছেন আমার কোনো অসুবিধে হচ্ছে কিনা। বিনয়ে আমি তাঁর ওপর দিয়ে গেলাম।

কিন্তু ঠিক যা ভয় করেছিলাম, তাই হল। এটা ওটা কথার পর হঠাৎ পকেট থেকে তিনি কাগজের একটা তাড়া বার করলেন। আমাকে তিনি তাঁর কবিতাগুলো শোনাবেন। আমি একবার মেঝের দিকে, একবার কড়িকাঠের দিকে তাকালাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার কর্তব্য স্থির করে ফেললাম।

ভদ্রলোক কবিতা শোনালেন বটে, কিন্তু সে রাতে তাঁব আর বাড়ি ফেরা হল না। যখন তাঁর খুব হাই উঠতে লাগল, তখন আমরা গেলাম তাঁর চেনা এক গেঁজেলদের আড্ডায়। সেখানে রাত তিনটেয় চা পাওয়া গেল। তাবপর আমরা দুজনেই দুজনকে বললাম—বাত্তিবটা খুব ভাল কাটল।

ব'লে ভোরে একেবারে ফার্স্ট ট্রেনেই পড়ি-মবি ক'বে সটান কলকাতা।

হাসনাবাদ



হাসনাবাদ

গৌতমমুনিব আবেক নাম অক্ষপাদ। নামটাব একটা ইতিহাস আছে।

গৌতমেব ন্যায়শাস্ত্রে ব্যাসদেব খুঁত ধবে বসলেন। আর যায় কোথায়! গৌতম বললেন তিনি আব ব্যাসেব মুখদর্শন কববেন না। মুনিঋষিদের যে কথা সেই কাজ। এদিকে ব্যাসদেবও ছাড়বাব পাত্র নন। তিনি এমন অনুনয়-বিনয় শুরু কবে দিলেন যে, শেষ পর্যন্ত গৌতমের রাগ পড়ল। কিন্তু মুখের কথা তো ফেরানো যায় না। কাজেই ঠিক হল ব্যাসেব মুখ তিনি দেখবেন, তবে চোখ দিয়ে নয়—পা দিয়ে। তার জন্যে দু পায়ে তিনি দেখবার চোখ ফুটিয়ে নিলেন। তাই তাঁর নাম হল অক্ষপাদ।

আমি গৌতম না হয়েও অক্ষপাদ। আমার চোখ আমার পা-দুটোতে বাঁধা। পা নড়িয়ে নড়িয়ে আমি দেখি। ব্যাসদেবকে নয়, আমি দেখি বাংলা দেশেব মুখ।

খালপাবে বাস দাঁড়িয়ে। হাসনাবাদ, ইটিণ্ডার বাস। বিদ্যাধরীর খাত এখন কলকাতায় ময়লাধোয়া জল খালাস করছে।

ডিপোয় বেশিক্ষণ দাঁড়ানো যায় না। হাওয়ায় বিকট দুর্গন্ধ। আগে পুল পার হয়ে ছিল ছোট রেলের স্টেশন। মনে আছে, বছর কুড়ি আগে হাড়োয়ায় গিয়েছিলাম। ভারি মজা লেগেছিল। এখন আর ছোট রেল নেই। হালে বড় রেল হয়েছে। বারাসত থেকে হাসনাবাদ। বাস আর রেলের এখন বড় একটা মুখ দেখাদেখি নেই।

যাব হাসনাবাদ। মাঝরাস্তায় একটু বেড়াচাঁপায় নামব। চন্দ্রকেতুর জাঙালটা আমার দেখা হয় নি। সেই সঙ্গে খনামিহিরের ভিটে।

দমদম বিমানঘাঁটি পেরিয়ে অবারিত আকাশ মিলল। বিরাটির দিকে পিছন ফিরে একটা এরোপ্লেন রানওয়েতে ছুটতে ছুটতে আকাশে আলগোছে উঠে গেল। ডানদিকে মধ্যমগ্রামের গোহাটা। দুপাশে নানারকম কলকারখানার বাড়ি উঠছে। হঠাৎ সামনের উইণ্ডস্ক্রীণের ভেতর দিয়ে চোখে পড়ল। রাস্তার ওপর সাদা মতো কী একটা আড় হয়ে পড়ে। ধারে কাছে জনপ্রাণী নেই। কাছে আসতেই বোঝা গেল, ধোপদুরস্ত কাপড়জামা পরা একটা শবদেহ। যখন চোখের সামনে এল, তাকাতে পারলাম না। আমাদের বাসটা সাবধানে রাস্তার ডানপাশ ঘেঁষে এগিয়ে গেল।

বারাসতের চৌমাথা পেরিয়ে টাকী রোডের মুখে এসে বাস একটু হাঁফ ফেলল। দোকানে দোকানে পাহাড়প্রমাণ ডাব। ডাবের জল খেতে গিয়ে একজন ডাবের ভেতর শাঁস দেখতে পেয়েছিল। খালি ডাবটা হাতে নিয়ে সে চলন্ত বাসে লাফিয়ে উঠল। প্রায় একশো বছর হতে চলল এখানকার মিউনিসিপ্যালিটির বয়স; তারও ঢের আগে এই বারাসতে ছিল সমরশিক্ষার ইস্কুল। ইংরেজ বাপ-মায়েরা তাদের ছেলেদের বিলেত থেকে এখানে পড়তে পাঠাত। তখন বারাসতের ছিল রীতিমত নামডাক। এ জায়গার দক্ষিণ দিক দিয়ে গেছে বিদ্যাধরী নদী।

সুকুমার বন্ধুর কলোনী পেরোলেই পাড়াগাঁ শুরু। ঘরবাড়ি অত ঘেঁষাঘেঁষি নয়। কাজীপাড়া বামুনমুড়া পীরগঞ্জ পেরিয়ে বাসরাস্তার ওপর ট্যাড়া কেটে চলে গেছে আনকোরা রেলের লাইন। নতুন রাস্তা;

তাই ট্রেন এখনও গজেন্দ্রগমনে যায়। বাসের চেয়ে ভাড়া কম। কিন্তু বারাসত থেকে হাসনাবাদ যেতে লেগে যাবে সাড়ে তিন ঘণ্টা। তাছাড়া ট্রেন তো মোটে চারটে আপ, চারটে ডাউন। সেখানে বাইশ মিনিট অন্তর অন্তর বাস।

ধর্মপুর কদম্বগাছি খোলাবাড়ির পর নোনা নদী। আর নোনানদীর ঠিক গায়েই বেলেঘাটার বাজার। আঁটি আঁটি খড় উঠছে নৌকোয়। লোকালয় ছাড়ালেই দিগন্তছোঁয়া ধানক্ষেত। বেশির ভাগ জমিতেই এখনও হাল পড়ে নি। সবাই অপেক্ষা করছে বৃষ্টির। আলবাঁধা শতচ্ছিন্ন জমি। মাঝে মাঝে পাটকাঠির চৌকো বেড়া। পাটের চারা উঠেছে। বাস্তবাড়ির ধারেকাছে যা একটু বাগান। তলানিতে এসে ঠেকেছে ডোবাপুকুরের জল। নয়ানজুলিতে কাদা ছেঁকে মাছ ধরছে ছোট ছোট মেয়ে। কেউ নিয়েছে ছাকনি জাল, কেউ ছেঁড়া শাড়ি। কোঁচড়ে কুচো কুচো মাছ। মাথায় কাপড় টেনে দিয়ে খিড়কির পুকুরে ছিপ নিয়ে বসেছেন এক প্রৌঢ়া। মাঝে মাঝে রংচটা কবর আর ঈদ্গা। চিরকেলে একঘেয়ে মাটির দোচালা। দাওয়ার ওপর বাখারির পর্দা। মাঠে এখন কাজ কম। ঘর তোলা, চাল ছাওয়া, পুকুর কাটার এই মরশুম।

দেগঙ্গায় মস্ত হাট। সওদা আসছে বাসের মাথায়, গরুর গাড়িতে, সাইকেল রিক্সায়। রাস্তার দুপাশে ডাঁই হয়ে আছে আম কাঁঠাল টমেটো পটল আর সেই সঙ্গে কিছু ঝিঙে মোচা আর লিচু। এখানে সবই প্রায় মহাজনী কারবার। মণ হিসেবে দর। কলকাতা থেকে পাইকাররা এসে থাউকো কেনে। সব ফলই কাঁচা। পাকবে আড়তে। যারা এ বছর আমবাগান জমা নিয়েছিল তাদেরই এবার পোয়াবারো। ফলন কম হয়েছে। কাজেই তারা পিটিয়ে পয়সা করবে।

এ লাইনে হাট আর গঞ্জ অনেক। এটা যে চাষী এলাকা সাইনবোর্ড দেখলেই তা বোঝা যায়। রঙীন হরফে লেখা : এখানে পাওয়া যায়। কী? না, পাটের বীজ, আলুর বীজ, ভাল জাপানী বীজ। দেগঙ্গায় আছে গোপ্রজনন কেন্দ্র। খাবারের সঙ্গে তেলসাবান, বীজের সঙ্গে

ফটো, ওষুধের সঙ্গে বই অনেক দোকানে এক লপ্তেই পাওয়া যায়।

হঠাৎ বাইরের দিকে চেয়ে রোদ্দুরটা কেমন যেন মিয়োনো মনে হল। আকাশটা এখন আর স্টেনলেস ষ্টীলের মত নয়। কী আছে আকাশের মনে কে জানে? কথায় বলে, আমে ধান তেঁতুলে বান। আম তো দেখলাম গাছে ঠনঠনাচ্ছে। তেঁতুলগাছ চোখে পড়ে নি। খনার কথা মনে পড়ল—

চৈত্রেতে থর থর
বৈশাখে ঝড়পাথর।
জ্যৈষ্ঠেতে তারা ফোটে
তবে জানবে বর্ষা বটে॥

বলতে বলতে এসে গেলাম খনামিহিরের দেশে। দেবালয়ের ঠিক গায়েই বেড়াচাঁপা।

বাস থেকে নামতেই একটা বিশ্রী ভ্যাপসা বোদা গন্ধ নাকে এসে লাগল। এ গন্ধ প্রথম পেয়েছিলাম পঞ্চাশের আকালে—লক্ষ্মীকান্তপুরের দুঃস্থকেন্দ্রে, দেশভাগের পর শেয়ালদায় আর কাশীপুর ক্যাম্পে। চায়ে চুমুক দিয়েই ফেলে দিলাম। যে ছেলেটা চা দিল, তার ছেঁড়া ময়লা প্যান্টে আর গায়ে সেই গন্ধ। পঞ্চাশের আকালের। কাল হাট ছিল, রাস্তার দুপাশটা আঁস্তাকুড় হয়ে আছে। হয়ত তার গন্ধও হতে পারে। আশ্চর্য, একেকটা গন্ধের গায়ে একেকটা স্মৃতি কি রকম অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে যায়।

গ্রাম বেড়াচাঁপা হলেও, অঞ্চলের নাম দেবালয়। দেখলাম লোকমুখে সেটা দেউলিয়া থেকে হয়ে গেছে দেউলে।

লোকে বলে, সেকালে কোন্ এক রাজাকে তাক লাগাবার জন্যে কোন্ এক ফকিরের কুদরতিতে লোহার বেড়ায় ফুল ফুটেছিল। চাঁপাফুল। নীরস কঠিন লোহার বেড়ায় কিনা চাঁপাফুল। সেই থেকে নাকি বেড়াচাঁপা নাম।

ডানদিকে হুই চলে গেছে হাড়োয়ার বাসরাস্তা। বাঁ দিকের মেঠো রাস্তাটা গাঁয়ে ঢোকবার। বেশী নয়, খানিকটা এগোলেই পড়বে সেই ঢিবি—লোকে আজও যাকে বলে 'খনা মিহিরের ভিটে'। বাঁদিকে খোঁড়াখুঁড়ির কাজ চলেছে। চারদিকে কাঁটা তার। তার ভেতরে ছোট্ট একটা তাঁবু। রাস্তার ডানদিকে এখনও অনেকখানি জঙ্গলে ঢাকা ঢিবি। এখনও সেদিকে হাত পড়ে নি।

ওপরে ওঠার রাস্তা খুঁজে পাচ্ছিলাম না, একজন কুলি দেখিয়ে দিল। নীচে রাস্তায় দাঁড়িয়ে বুঝতেই পারিনি ওপরে এত সমস্ত কাণ্ডকারখানা চলেছে।

সন্তোষবাবু আমাকে সব ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখালেন। পাছে পায়ের চাপে ইট খসে, তাই খুবই সন্তর্পণে চলতে হচ্ছিল। মাঝখানে গর্ত গর্ত। ভেতরে নামা ওঠার সরু সরু ধাপ। নীচে কাজ হচ্ছে। চারদিকে ইটের দেয়াল। জৌহুরি চোখ না হলেও বেশ বুঝতে পারছিলাম ওপরনীচে ইটের আলাদা গড়ন, স্থাপত্যের ধরনও আলাদা। যেন মৌর্যযুগের কাঁধের ওপর দাঁড়িয়ে পালযুগ উঁকি দিয়ে আমাদের এই নতুন যুগটাকে দেখছে। মাটির নীচে ইটের ওপর ইট-গেঁথে রেখেছে হয়ত দু হাজার থেকে আড়াই হাজার বছরের আগেকার বাংলা।

চন্দ্রকেতুর গড় দেখতে গিয়ে দক্ষিণের রাস্তায় বেশ খানিকটা হাঁটতে হল। পুব থেকে পশ্চিমে দিগন্তরেখা বরাবর স্পষ্ট দেখা যায় একটানা চলে গেছে জাঙাল। চন্দ্রকেতুগড়ের নগরদুর্গ। প্রায় পঁয়তাল্লিশ মাইল দীর্ঘ। চার ফুট চওড়া প্রাকার। দুপাশে ইট, মাঝখানটা ভরাট। জমির প্রায় তেরো ফুট নীচে। এই প্রাকারে ঘেরা মাটির নীচে চাপা পড়ে আছে দুই থেকে আড়াই হাজার বছর আগেকার বাংলা দেশের এক ঐশ্বর্যশালী মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম আলবাঁধা ফসলের জমি। দেবালয় বেড়াচাঁপা ছাড়িয়ে ঝিকরা হাদিপুরই শুধু নয়, আরও গ্রাম জুড়ে আত্মবিস্মৃত এখানকার মাটি। অনতিদূর ভবিষ্যতে এ মাটিতে স্মৃতির ফসল ফলবে।

রাস্তার ধারেই গড়ের গায়ে পুরাতাত্ত্বিক দপ্তরের সংরক্ষিত জায়গা ব'লে উনিশ শো বিশ সালের একটা সরকারী অনুশাসন আছে। তার চারদিকে কাঁটা গাছ। সংরক্ষিত জায়গা ব'লে ঘোষণা করা ছাড়া ইংরেজ আমলে এখানে অনুসন্ধানের কাজ খুব সামান্যই হয়েছিল। এ কাজ প্রথম হাতে নেন লংহার্স্ট সাহেব। ১৯০৭ সালে। তাও স্থানীয় অধিবাসীদের আগ্রহে। তখনই এ অঞ্চলে কিছু কিছু মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ আর ছাঁচে-ঢালা ইট পাওয়া গিয়েছিল, কিন্তু তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য সরকারী পুরাতত্ত্ব বিভাগ ঠিক ধরতে পারে নি। এরপর রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ও এ অঞ্চলে ঘুরে কিছু সুপ্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কার করেছিলেন।

বেড়াচাঁপা প্রথম গুরুত্ব পেল যখন আশুতোষ মিউজিয়মের পক্ষ থেকে এ অঞ্চলে অনুসন্ধানের কাজে হাত দেওয়া হল। প্রথমে ১৯৪৮ সালে, তারপর ১৯৫২ সালে। তারপর সে কাজে আবার ভাঁটা পড়ে। কিন্তু তার বছর কয়েক পরেই এখানে পাওয়া গেল একটি সূর্যমূর্তি আর চক্রবাহিত একটি মেষমূর্তি। চারটি সুসজ্জিত অশ্ববাহিত রথে সূর্যদেব; তাঁর দুপাশে দুই স্ত্রী—উষা ও প্রত্যুষা। রথচক্রতলে পিষ্ট অসুর। মূর্তিটির গড়ন, শিল্পরীতি, অলঙ্কার আর শিরোভূষণ দেখে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর বলে মনে হয়। এই মূর্তি চোখে পড়ার পরই আশুতোষ মিউজিয়মের পক্ষ থেকে ১৯৫৫ সালের শেষাশেষি পুরোদমে বেড়াচাঁপায় কাজ শুরু হয়ে গেল।

বেড়াচাঁপায় এ পর্যন্ত যা পাওয়া গেছে, আশুতোষ মিউজিয়মে গেলে তা দেখা যায়। তার মধ্যে আছে, ভারতের প্রাচীনতম মুদ্রার অন্যতম লাঞ্ছনযুক্ত তাম্রমুদ্রা কার্ষাপণ আর রৌপ্যমুদ্রা পুরাণ। খৃষ্টজন্মের আগে নির্মিত ভারহুত আর বুদ্ধগয়ার প্রস্তরবেষ্টনীতে অনাথপিণ্ডদের জেতবন ক্রয়ের চিত্রে এই মুদ্রার ছবি আছে। কোনো কোনো মুদ্রায় আছে সৌরচিহ্ন, কোনোটায় জ্যোতির্বিদ্যার আঁকিবুকি। কোনো কোনো মুদ্রায় আঁকা মৎস্য হস্তী বৃষ শশক বিন্দুমণ্ডল সম্ভবত প্রাক-আর্য বা

আদি-আর্য সভ্যতার স্মারক।

পাওয়া গেছে দু হাজার বছর আগেকার বাংলাদেশের শিল্পসাধনার নিদর্শন—শুঙ্গযুগে ছাঁচে-তৈরি যক্ষ আর যক্ষিণীর মূর্তি। যক্ষিণীদের কবরীতে পঞ্চচূড়, কণ্ঠে পুষ্পহার, হাতে রত্নপট, বাতাসে আন্দোলিত স্বচ্ছ কটিবাস। আছে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের এক মিথুন চিত্র। পোড়ামাটির মূর্তি আর মৃৎপাত্রও পাওয়া গেছে অনেক। পোড়ামাটির অনেক মূর্তিতে আছে সেকালের জীবনযাত্রার ছবি। যক্ষ, প্রেমিকপ্রেমিকা, ঘোড়সওয়ার, সৈনিক, হাতিতে-চড়া-মানুষ, বিদেশী, এমনি অনেক কিছু। চক্রবাহিত পোড়ামাটির জীবাকার খেলনা।

পাওয়া গেছে মকরমুখো জাহাজের ছবিআঁকা ভাঙা ছোট মৃৎফলক। মকরের গলায় বাঁধা নিশানাকার বস্ত্রখণ্ড। প্রাচীন গ্রীক সমুদ্রবিবরণীতে এমনি জাহাজের কথাই তো বলা আছে, যা গাঙ্গে বন্দর থেকে দূর প্রাচ্যে যেত আসত। সৈনিক মূর্তির আজানু পোশাক আর শুঙ্গযুগের যক্ষিণীর হেলেনীয় ঘাঘ। সংগত দু হাজার বছর আগেকার বাংলাদেশের সঙ্গে ভূমধ্যসাগর এলাকার ভাববিনিময়ের কথা মনে করিয়ে দেয়।

চন্দ্রকেতুগড়ের ওপর যেখানে সরকারী ফলক, তার অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আমরা কথা বলছিলাম। গড়ের নীচে ছোট একটা পুকুর। তার ঠিক পাশেই একজন জমিতে লাঙল দিচ্ছিল। পুকুরের চারপাশে ভাঙা ভাঙা ইঁটের টুকরো। সন্তোষ বাবু খোঁজ নিলেন হালে কিছু পাওয়া গেছে কিনা। লোকটা বলল কিছু পাওয়া যায় নি। কেউ কিছু পেলে ব্যাপারটা জানাজানি হতে খুব দেরি হয় না। তবে আজকাল প্রায়ই বাইরের টুরিস্টরা এসব অঞ্চলে আসে। এ অঞ্চলের একটা পুরনো মূর্তি হাত ঘুরে লণ্ডনে গেছে। ভারতের সব প্রত্নবহুল জায়গাতেই হামেশাই যা ঘটে থাকে। এসব জায়গায় তাই চোখকান সবসময় খাড়া রাখতে হয়।

এদিকের অনেক গ্রামে পুকুর খুঁড়তে গিয়ে কম জিনিস পাওয়া যায় নি। বহু মৃৎপাত্রের অংশই পুকুর খুঁড়তে গিয়ে পাওয়া। এক রকমের

মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যার গায়ে কালো রঙের ঝকমকে প্রলেপ দেওয়া। এ ধরণের মৃৎপাত্র মৌর্যযুগে ব্যাপকভাবে চলত। দুটি মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশের গায়ে খৃষ্টীয় প্রথম-দ্বিতীয় শতকের লিপিতে উৎকীর্ণ আছে কুম্ভকারের নাম। তাছাড়া পাওয়া গেছে চিত্রলিপি আর রোমান ধরনের মাটির পাত্র।

পুকুর খুঁড়ে আর পাওয়া গেছে নানারকম রংচঙে পাথর, যা দিয়ে তৈরি হত মেয়েদের কণ্ঠহার আর অঙ্গাভরণ। কোনো পাথর নিখুঁতভাবে কাটা, কোনোটা কাটতে কাটতে রেখে দেওয়া। প্রাচীন তক্ষশিলা আর ভারতের অন্যান্য নগরের মত এখানেও নিশ্চয় এককালে সুদক্ষ মণিকারদের বসবাস আর কর্মকেন্দ্র ছিল।

বেড়াচাঁপায় ফিরে আসতে আসতে ভাবছিলাম—এই তাহলে গ্রীক পুরাণের সেই গঙ্গারিডি, যার শৌর্যবীর্যের গুণকীর্তন করে গেছেন ভার্জিল? এই সেই গাঙ্গে বন্দর, পেরিপ্লাসে আব টলেমির লেখায় যার নাম অমর হয়ে আছে?

আজ যেখানে মাটির ঘরবাড়ি, কাঁচা মাটির রাস্তা—একদিন সেখানে ছিল ইটের তৈরি ঘরবাড়ি, কুষাণ গুপ্তযুগের বাঁধানো ইটের রাস্তা। এখন যেখানে নয়ানজুলি, সেখানে একদিন ছিল মৌর্য-সুঙ্গযুগের ভূগর্ভের পয়ঃপ্রণালী।

বাসের পাদানিতে পা দিয়ে মনে হল হাঁটলেও বাংলাদেশের গর্বে মাটিতে এতক্ষণ আমার পা পড়ে নি।

কাউকেপাড়া ছাড়িয়ে স্বরূপনগর। বাস ছুটেছে ঊর্ধ্বশ্বাসে। এসব লাইনের বাসের দস্তুরই এই। হাটে দাঁড়িয়ে গঞ্জে দাঁড়িয়ে লোক তুলতে সময় যাবে, তারপর ছুট ছুট ছুট। হাওয়ার দমকে বাসযাত্রীদেরই বেদম হাঁফ লাগবে।

বিবিপুরের স্টপে সওয়ারী তুলতে বাস দাঁড়াল। নায়রে এসেছিল বউ, স্বামীর সঙ্গে ফিরছে। পোঁটলাপুঁটলি তুলে দিয়েও বাড়ির লোকের

কথা ফুরোয় না। বাস আর কতক্ষণ দাঁড়াবে? ছেড়ে দিল। সব-শেষের দরকারী কথাটা হাওয়ায় উড়ে গেল। হঠাৎ বাসের আয়নাটার দিকে তাকিয়ে হাসিতে পেট ফাটবার যোগাড়।

আয়নার গায়ে কে লিখেছে কথাটা? লিখেছে: নো লাইফ উইদাউট ওয়াইফ। অর্থাৎ যার বউ নেই তার কিসের জীবন?

বাসের গায়ে প্রাতঃস্মরণীয় প্রোপ্রাইটারটির নাম খুঁজলাম। ভিড়ে সবদিক দেখা গেল না। কোনো পাঁইজীর বাস নয় বলেই মনে হল। কেননা 'টু ক্যারি…পার্স'ন্‌স্‌' থেকে 'স্ট্যাণ্ডিং অ্যালাউড' পর্যন্ত ইংরেজিতে একেবারে নির্ভুল বানানে লেখা।

নেহালপুর পেরিয়ে বাঁদিকে ধানকুড়িয়া যাবার রাস্তা। মোড়ের ওপর গাইনদের বিরাট রাজপ্রাসাদ। এখন ওটা বালিকা-আশ্রম। গাইনরা থাকে কলকাতার বাড়িতে। ধানকুড়ের এক লোক ছিল আমাদের বাসে। সে বলল ও-গাঁয়ের বল্লভ আর সাউরাও খুব ধনী। ব্যবসাবাণিজ্যেই ওদের পয়সা।

মেটিয়া থেকে বাঁদিকে ঘুরে যায় বসিরহাট-হাবড়ার বাস। মেটিয়ার হাট থেকে শুরু হল ভিড়। ভিড় ব'লে ভিড়!

কুলীনগ্রাম ঢেঁকি পেরিয়ে খোলাপোতার বাজার। এখানে সেখানে ধানকল। মাঝে মাঝে ইটখোলা টালিখোলা। পাশে এক ইস্কুলের মাঠে লাল শালুর ওপর কী যেন লেখা। সভা হবে বোধহয়। এক হাতে পানের বোঁটায় চুন উঁচিয়ে, আর এক হাতে কোঁচা সাম্‌লে দু'চারজন পান চিবোতে চিবোতে সভায় আসছে। সভাপতি বি, ডি,ও নিশ্চয়?

বাঁদিকে দূরদিগন্তে বেড়ের বিল। জল চিকচিক করছে। কাছেই শুকনো ঠন্‌ঠন্‌ করছে পদ্মবিল। মেটিয়া পেরিয়ে খানিকটা যেতেই ডানদিকে পড়ল কাটাচকার বিল। রাস্তার কাছেই টল টল করছে জল। বিলের ধারে ময়দানের সভার মত বকের ভিড়। গোটা জায়গাটা শাদা হয়ে আছে।

রঘুনাথপুর হরিশপুর মৈত্রীবাগান। তারপরই বসিরহাট কলেজ থেকে পরীক্ষা দিয়ে ফিরছে একদল ছোকরা। সারা বাস তাদের আলাপে মুখর হয়ে উঠল। স্টপে বাস থেমেছিল। সাইকেল ধরে রাস্তায় দাঁড়িয়ে ছিল তাদেরই বোধহয় কোনো সহপাঠী। জানলা দিয়ে ঝুঁকে পড়ে খুব কথা হল। তারপর বাস ছাড়তেই সকলের হো হো করে হাসি। কী কাণ্ড! সামনের মাসেই ওর নাকি বিয়ের সব ঠিক।

গ্রামের রাস্তায় বই হাতে নামল একটি মেয়ে। পড়ে কি পড়ায় বুঝতে পারলাম না। ওঠবার সময় ভিড়ে দেখতে পাই নি। নামবার সময় দেখলাম। ভারি স্থন্দর দেখতে।

গ্রাম থেকে গজব্যাণ্ডেজের বড় বড় বস্তা উঠল বাসের মাথায়। নামবে টাকীতে। এ অঞ্চলে তাঁতে গজ বুনে দিন চালায় অনেকগুলো সংসার। এ কাজে হাতযশেরও খুব দরকার হয় না।

এদিকে চাষআবাদই লোকের সবচেয়ে বড় নির্ভর। চাষ বলতে ধান আর পাট। রবি ফসল আম কাঁঠাল কলাবাগানও কিছুটা। নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে জেলেপাড়া মাঝিপাড়া। গঞ্জে বন্দরে শহরে দোকানপাট। কিছু ষ্টীমলঞ্চ, কিছু ঘাটিয়ালি ব্যাবসা। এদিকে ওদিকে ছড়ানো কিছু ধানকল। বসিরহাটে বাসরাস্তার ধারেই একটা করাতকল। শুনলাম ছোটখাটো একটা গেঞ্জির কলও নাকি হয়েছে।

বসিরহাটে এসে বাস প্রায় খালি হয়ে গেল। এরপর বাসে শেষ পর্যন্ত যেখানেই যাবেন সেখানেই নদী।

ইটিণ্ডাঘাটে যদি যান বাস সোজা যাবে বসিরহাট বাজারের রাস্তা ধরে। তুপাশে একটানা দোকান। তুটো বাস পাশাপাশি হলে দোকানের ঝাঁপির সঙ্গে বাসের গায়ের প্রায় ঠেকাঠেকি হয়ে যায়। সেকেলে ভুষিমালের দোকানের পাশে হালফ্যাশানের স্টেশনারি দোকান। হুঁকোকল্কে তামাকের দোকান আছে কিনা জানি না, থাকলেও বিড়ি-সিগারেটের দোকানের জেল্লায় চাপা পড়ে গেছে। আছে ফটো তোলা আর রেডিওর দোকান। কোর্টকাছারির কাছটাতে চায়ের দোকান,

মিষ্টির দোকান আর হোটেলের ছড়াছড়ি। সাজাতে হয় না, রোদ পড়ে আপনি ঝকমক করে ছবি বাঁধাইয়ের দোকান। ফ্রেমেআঁটা সব লাগসই সদুক্তি : 'গাছে খেজুর গোঁফে তেল', 'একদর', 'প্রেম চিরকাল থাকে হৃদয়েতে জেগে', 'মাটির প্রদীপ কহে…' ইত্যাদি ইত্যাদি।

শহর ছাড়াবার আগেই বাঁদিকে তাকালে হঠাৎ চোখোচোখি হবে নদীর সঙ্গে। থানা জেলখানা এস. ডি. ওর আপিস সবই এই পথে। নদীর মুখোমুখি উঠছে একটা প্রাসাদোপম বাড়ি। হাসপাতাল বলেই মনে হল। শহর ছাড়িয়ে বদরতলা ধলতিথার মোড়ে।

আরও খানিকটা এগোলে ইছামতী নদীর মুখে ইটিণ্ডাঘাট। এপারটা টিমটিম করছে। বাস থেকে যারা নামে সবাই প্রায় যায় ওপারে। এপারে একটা দুটো চা মিষ্টির দোকান। আর একটা ওষুধের। ওপারের লোকালয় পেরিয়ে মাইল আড়াই গেলেই পাকিস্তান।

ইছামতীর ধারে ধারে ক-বছর আগেও ছিল আড়ালে আবডালে চোরাচালানের জমজমাট ব্যাবসা। যেত কাপড়চোপড় আর বিড়ির পাতা, আসত পাটসুপুরি। নদীর ধারেকাছের কোনো কোনো গঞ্জ নাকি এখনও রাত দশটা বাজলে তবে ঝাঁপ খুলে নড়ে চড়ে বসে। খিড়কিতে ঘাই দেয় বড় বড় মক্কেল।

হাসনাবাদের বাস যায় টাকীর রাস্তায়। বসিরহাট শহরের ভেতরে ঢোকে না। একটু এগোলে ডানদিকে দূরে দেখা যায় বসিরহাট রেল-স্টেশন। বাসরাস্তা থেকে অনেকটা দূরে। আশপাশ এখনও ফাঁকা।

এদিকে শহর বলতে যা কিছু, সবই ইছামতীর ধারে ধারে। আগে বন্দর ছিল, পরে হয়েছে শহর,—বেশ বোঝা যায়।

টাকী শহর নদীর ঠিক ধারে। ওপারে শ্রীপুর। এখন পাকিস্তানে। টাকী এক সময়ে ছিল খুব বর্ধিষ্ণু। এখানে ছিল বড় বড় জমিদার আর টাকা পয়সাওয়ালা লোকের বাস। এখন সকলেরই পড়ন্ত অবস্থা। ধানচালের কারবারীদের হাতেই এখন যা পয়সা। বড় বড় ঘরবাড়ি যা ছিল ভেঙে ভেঙে নদী আর কিছু রাখে নি। বাঁধ দিলেও নোনা জলে

খেয়ে যায়।

নতুন বাঁধ হয়েছে দেখলাম। বাঁধের গায়ে নাম লেখা — যারা বাঁধ বেঁধেছে। ডায়মণ্ডহারবারের মিস্ত্রি।

মিউনিসিপ্যালিটি, সেট্‌লমেন্ট অফিস, হাসপাতাল, সরকারী কলেজ, সেন্ট্রাল লাইব্রেরি আর গোটা চারেক ইস্কুল—এই নিয়ে এ শহরের জীবন। বড় রাস্তায় ইলেকট্রিক জ্বললেও একটু ভেতরদিকে সব বাড়িতেই প্রায় কেরোসিনের বাতি। শনিবার হলে এখানকার বাড়িতে বাড়িতে লোক বেড়ে যায়। রোজগেরে লোকেরা কেউ কলকাতা থেকে সপ্তাহান্তে, কেউ বাইরে থেকে মাসান্তে একবার করে বাড়ি আসে। রবিবারের সকালগুলোতে চায়ের দোকানে জোর আড্ডা বসে।

টাকীর এরিয়ান্স ক্লাবের ফুটবলে খুব নামডাক। প্রায় ফি বছরই নাকি এ ক্লাবের দুচারজন কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশনে খেলে। কিন্তু খেলোয়াড়দের কী জীবন!

রেজিষ্ট্রি আপিসের এক মুন্সীকে দেখে বুঝলাম। মুখ দেখে মনে পড়ল কাগজে ছবি দেখেছি। খেলার জন্যে রেলে ভাল চাকরি হয়েছিল। ভালোর চেয়ে আরও ভাল চাকরির লোভে ক্লাব বদ্‌লে চাকরিও গেল, মালাইচাকি ভেঙে খেলাও ছাড়তে হল। সময়মত সুচিকিৎসা হলে সারত। কিন্তু খরচপত্রের অভাবে হয় নি।

হাসনাবাদের রেলস্টেশন পেরিয়ে বাস যেখানে থামে, তার ঠিক সামনেই নদী পারাপারের ঘাট।

হাসনাবাদ গ্রাম বলতে আসলে নদীব ওপারটা। এপারটা গঞ্জ মতন জায়গা। আগেকার দিনে এর নাম ছিল চিংড়িঘাটা। এপারের নাম হাসনাবাদ হয়েছে বছর পঞ্চাশ আগে। ধার বরাবর নদীর নোনাজলে খাওয়া রাস্তা। ডানদিকে পারঘাট আর লঞ্চ দাড়াবার জায়গা। বাঁদিকে ধানকল আর ফিশারি। রাস্তার দুপাশে হিন্দু-মুসলিম হোটেল, চুল ছাঁটার সেলুন, পানবিড়ির দোকান আর দলিল-লেখকদের সেরেস্তা। এখানে দলিল-লিখিয়েদের বেশ ফলাও কারবার।

নদীর ধার ছেড়ে বাঁদিকে থানার পাশ দিয়ে টাকী বরাবর চলে গেছে রাস্তা। লোকবসতি খুব বেশী নয়। বাজারের আশেপাশে সামান্য কিছু ধানচালের আড়ত। একটা ফটো তোলার আর একটা মাইক্রোফোন ভাড়া দেওয়ার দোকান। ইস্কুলের পরীক্ষা, চাকরির দরখাস্ত, পাকিস্তানের পাসপোর্ট—কোনোটাই এখন ফটো ছাড়া হবার নয়। আর বিয়েপুজোয় পুরুত ছাড়া যদিও বা চলে, অমাইক হলে একদম চলেই না।

Dak Bunglow Diary

ইংরেজ আমলের একেবারে গোড়া থেকে হাসনাবাদ ছিল জলপথে বাণিজ্যের ঘাঁটি। এ জায়গার সঙ্গে জড়িয়ে আছে পাদ্রী কেরী সাহেবের স্মৃতি। কেরীসাহেব আর তাঁর বন্ধু জন টমাস কলকাতায় এসে মহা ফাঁপরে পড়লেন। তাঁরা এমন একটা জায়গা খুঁজছিলেন যেখানে কম পয়সায় থাকা যায়। কিছুদিন থাকলেন ব্যাণ্ডেলে গিয়ে। সেখানেও পোষাল না। কেরী চাইছিলেন সাহেবিয়ানার আওতা থেকে দূরে গিয়ে এদেশী মানুষদের মত জীবনযাত্রা নির্বাহ করতে। প্রকৃতির কোলের মধ্যে থাকতে। কলকাতায় ফিরে টমাস মাণিকতলায় বাসা নিলেন।

কেরীর স্ত্রীর তখন মাথা খারাপ, ছেলে দুটিও পেটের রোগে খুব ভুগছে। কেরীর মুন্সী বুদ্ধি দিলেন সুন্দরবনে গিয়ে জমি নিয়ে চাষ আবাদ করবার। টমাস মোটা সুদে কিছু টাকা ধার নিয়ে নৌকো ভাড়া করে সুন্দরবনে যাবার ব্যবস্থা করলেন। নৌকোয় যেতে যেতে চারদিনের দিন যখন তাঁদের কাছে আর মোটে এক বেলার খাবার আছে, তখন তাঁরা রাস্তায় ইংরেজের একটা কুঠি দেখতে পেলেন। কুঠির সাহেব ছিলেন এ অঞ্চলে কোম্পানির নুন তৈরির কারখানার কর্তা। কেরীসাহেবেরা তাঁর অতিথি হয়ে কুঠিতে উঠলেন।

সেই পুরনো নুনের জায়গাই এই হাসনাবাদ। তখন এসব দিকে ছিল খুব বাঘের ভয়। সাহেবের বন্দুক থাকায় অনেক লোক এখানে এসে ঘর বেঁধেছিল। কেরীসাহেব এখানে কয়েক একর জমি নিয়ে

থাকবার জন্যে বাঁশের ঘর তুলেছিলেন।

তারও একশো বছর পরের গল্প শুনলাম হাসনাবাদের বৃদ্ধ ডাক্তার হেমন্ত দাশগুপ্তের মুখে। বয়স তাঁর বছর তিরাশি। এখনও চশমা ছাড়াই পড়েন লেখেন। বাড়িতে সব সময়ই রুগীর ভিড়।

এ অঞ্চলে তাঁর বাস পঞ্চাশ বছরেরও বেশী। আগে এদিকের সারা তল্লাট জুড়েই ছিল বৈঁচির বন। দোকানপাট কিছু ছিল না। ঘাটে টিমটিম করত একটা কুঁড়েঘর। সেখানে চিঁড়ে আর বাতাসাই শুধু মিলত। আপিস বলতে শুধু একটা সাব-রেজিষ্ট্রি আপিস, থানা আর ডাকবাংলো। লোকজনের তেমন বাস ছিল না। মাহিষ্য, যুগী, যাদব আর পৌণ্ড্রক্ষত্রিয়েরাই এদিকে সংখ্যায় বেশী।

লড়াইয়ের আগে পর্যন্ত এসব জায়গায় এক আনা সেরে চাল পাওয়া যেত। দুধের সের ছিল দু তিন পয়সা। বড় বড় কই মাছের কুড়ি বিক্রি হত দশ বারো পয়সায়; এক কুড়ি মানে ছাব্বিশটা।

এ জায়গা জমজমাট হল দেশ ভাগের পর। অবশ্য টাকীতে নদীর ভাঙনের ফলে সেখানকার দোকানপাট আগে থেকেই এখানে উঠে আসছিল। তবে খুলনা জেলা থেকে উদ্বাস্তুরা আসার পর থেকে এখানকার লোকালয় বেড়ে গেছে। এ অঞ্চলে জিনিসের দাম আর অভাব বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে নদীপথে ডাকাতির সংখ্যাও গেছে বেড়ে। বাত্তিরে চলাফেরা করা মোটেই নিরাপদ নয়।

বছর পঞ্চাশ আগে এখানে জমির বিঘে ছিল চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ টাকা। দেশভাগের পরও জমির দর সত্তর পঁচাত্তরের ওপরে ওঠে নি। এখন হাসনাবাদের ওপর বসতবাড়ির জমির কাঠা সাত আট শো'র কম নয়। ধানজমির দামও চারশো টাকা বিঘে।

কাছে-পিঠে সিনেমা বলতে এক হাসনাবাদে। তাও শুধু শুকনোর ক'টা মাস। দালান নেই তাঁবুতে। দেখানো হয়। ছবি যা আসে, তার মধ্যে হিন্দীই বেশী। নাচগান আর মারপিটের বই-ই লোকের বেশী পছন্দ। সিনেমা-মালিকেরও তাতে সুবিধে। বাংলা বই আনতে যা খরচ,

তার অর্ধেক টাকা দিলে নাকি হিন্দী বই পাওয়া যায়। তাছাড়া লোকে চায় সুচিত্রা-উত্তম। বারো মাস তিরিশ দিন ওদের ছবিই বা অত পাওয়া যায় কোত্থেকে ?

শোনা যাচ্ছে, বছর কয়েকের মধ্যে নাকি রেললাইন হিঙ্গলগঞ্জ পর্যন্ত যাবে। হাসনাবাদ থেকে হিঙ্গলগঞ্জ দশ বারো মাইল রাস্তা। নদী পার হয়ে ওপারে হাসনাবাদ থেকে পাওয়া যায় অটো-রিক্সা। রামেশ্বরপুর, সুতিবাটি, বরুণহাট পেরিয়ে কাটাখালি। মাত্র আটত্রিশ পয়সা ভাড়া। নৌকোয় ওপারে গিয়ে আবার অটো-রিক্সা। বোলতলা মামুদপুর পেরিয়ে তবে হিঙ্গলগঞ্জ। ভাড়া বিশ নয়া পয়সা। পারঘাটের পয়সা নিয়ে দশ মাইল রাস্তা যেতে টাকাখানেকের ধাক্কা।

এককালে হিঙ্গলগঞ্জ ছিল প্রকাণ্ড বন্দর। এক ইছামতী, তার নাম কত। হাসনাবাদে ইছামতীকে যদি যমুনা বলে তো এখানে লোকে বলবে কালি নদী বা কালিন্দী। নদী এখানে রীতিমত চওড়া। আগে এ সমস্তই ছিল সুন্দরবন। ভাটি অঞ্চল।

আঠারো শতকের শেষাশেষি যশোর জেলার হাকিম ছিলেন টিলম্যান হেঙ্কেল। বাদা অঞ্চল হাসিল করে এদিকে আবাদের পত্তন তাঁর উৎসাহেই শুরু হয়। জলপথে তখন যেমন ডাকাতি হত, তেমনি জমিদারদেরও ছিল নানা রকমের জুলুম। হেঙ্কেল সাহেবের চেষ্টায় রাহাজানি আর জুলুম বন্ধ হল, সেইসঙ্গে এখানে গড়ে উঠল বন্দর। বন্দরের নাম হল হেঙ্কেলগঞ্জ। লোকের মুখে মুখে সেই হেঙ্কেলগঞ্জই হয়েছে এখন হিঙ্গলগঞ্জ।

ওপারে পাকিস্তানের বসন্তপুর গ্রাম। ওপারের ঘরবাড়ি ধানকল চালগুদাম এপার থেকে স্পষ্ট দেখা যায়। হিঙ্গলগঞ্জ আগে ছিল সুন্দরবনের প্রাণকেন্দ্র। লেনদেনের একমাত্র জায়গা। দেশ বিভাগ হওয়া ছাড়াও ভাটির দিকে এখন আরও হাটবাজার আর ইস্কুল হয়েছে। ভাটির দেশের সবাইকে এখন আর হিঙ্গলগঞ্জে আসতে হয় না। তাই এ জায়গায় সে জমজমাট ভাব আর এখন নেই।

হিঙ্গলগঞ্জের আশেপাশে গোটা সাতেক ধানকল। কোনোটা বারো মাস, কোনোটা শুধু শুক্‌নোর ক'মাস চলে। কাজ করে হাজার বারো-শো মজুর। মেয়েদের কাজ চাতালে ধান শুকানোর।

এক দেড় লাখ টাকার কমে নাকি ধানকল হয় না। লাভও নাকি প্রচুর। চালুর সময় রোজ হাজার বারো-শো টাকা। বর্ষার হাওয়ায় গুদাম খুলে রাখলে নাকি চাল ফুলে উঠে বস্তাগুলো ফাটো-ফাটো হয়। প্রত্যেক তিন মণী বস্তা ওজনে আড়াই সের বাড়ে। ধানকলে আরেক সুবিধে, কয়লার দরকার হয় না। জ্বালানির কাজ তুষ দিয়েই চলে যায়।

বাজারে ধানভানার কল এসে যাওয়ায় মেয়েদের ঢেঁকির কাজ খুব কমে গেছে। সে কলে গমও ভাঙানো যায়।

'এদিকে ছ' সাতজন আছে যাদের নানা নামে হাজার বিঘের ওপর জমি। বাকি বেশির ভাগই গরীব। নিজের নিজের জমিকে অনেকেই এখন দু-ফসলা করবার চেষ্টা করছে। কিন্তু আড়তদাররা যে দামে কেনে, তাতে পাট বেচে ভাগচাষীর হাতে কিছুই প্রায় থাকে না। এক বিঘে পাটের জমিতে লাগে পাঁচ টাকা সেরের আড়াই সের বীজ। সঙ্গে সঙ্গে চারা না উঠলে আবার জমি ভেঙে বীজ বুনতে হবে। তিন রোজ দুটো করে লাঙল, তাছাড়া মই দেওয়া, আচড়ানো, নিড়ানো, কাটা, কাচা আর বওয়ার খরচ। কাজ হিসেবে জনের রোজ আড়াই থেকে তিন টাকা। পাটের দর উঠলে আড়তদাররাই দাঁও মারে।

হিঙ্গলগঞ্জের সবচেয়ে বড় উৎসব হল দোল। দোলখেলায় আট দশদিন ধরে উৎসব হয়। কলকাতা থেকে বড় বড় যাত্রাপার্টি আসে। সার্কাসপার্টি, নাগরদোলা আসে। পুজোয় জাঁকজমক হয় নবমী দশমীর দিন। সেই সময় দুএক বছর আগেও বাচ্‌ খেলা হত। এখন বেবাক বন্ধ। এখানে সব উৎসবই হিন্দু-মুসলমানেরা একসঙ্গে হয়ে করে। নদীর দেশ বলেই বোধহয়, কী বিয়েতে কী বাচ্‌ খেলায়—ঘড়া জিনিসটাই এখানে সব চেয়ে বড় উপহার। দশমীর দিন মদের চাহিদাটা একটু বাড়ে। তবে শিক্ষাদীক্ষা যত বাড়ছে, নেশার ভাগটাও তত কমছে।

নদীর ধারে জেলেপাড়া। পুজোর পর মহাজনের কাছ থেকে দাদন নিয়ে জেলেরা যায় সুন্দরবনে মধুর চাক কাটতে, মাছ ধরতে। বনের মধ্যে ওপর দিকে মৌমাছির দিকে চেয়ে মৌচাকের খোঁজ করতে করতে অনেক সময় তারা সটান গিয়ে পড়ে বাঘের পেটে। যে ক'মাস তারা বাইরে থাকে, বাড়ির মেয়েদের হয় হাঁড়ির হাল। অভাবে স্বভাবও নষ্ট হয়। ওদিকে আবার ঘরের মানুষেরা বাড়ি ফেরে রোগব্যাধি আর মনে কু-সন্দেহ নিয়ে।

জেলেপাড়ায় তাই কখনও সুখ এলেও শান্তি আসে না। অন্ধ কুসংস্কারগুলোও যায় না। ছোট ছেলেদের নাকি বনদেবী মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেন; নাকি বলে দেন নদীর ঠিক কোন্ জায়গায় মাছের ঝাঁক আছে।

বছর চারেক আগে বনদেবীর নাকি আদেশ হয়েছিল একটি শিশুকে হত্যা করবার। জানতে পেরে বাড়ির লোকে তাকে সকলের অসাক্ষাতে অন্য জায়গায় সরিয়ে ফেলেছিল।

তার ঠিক পরের বছরেই নদীতে এসেছিল মাছের জো। নরবলিটা হলে বনদেবীর মান চড় চড় ক'রে বেড়ে যেত— তাতে সন্দেহ নেই। সে সময়ে মাছ ধরবার জন্যে মহাজনেরা সেবার দৈনিক সাত শো টাকা ভাড়ায় লঞ্চ ভাড়া করেছিল।

ঢেঁকিছাঁটা নিরেস চালের সের এখনই শুনলাম সাড়ে বারো আনা থেকে সাড়ে তেরো আনা। দেড়মণী ধানের বস্তা তিরিশ টাকা। পটল হাটবারের দিন দেড় টাকা সের গেছে। এমনিতে আঠারো আনা। পাঁচ পোয়া আলু সাড়ে চার আনা, ছোট হলে চার আনা।

হোমিওপ্যাথ ডাক্তার রাধানাথ দাস মশায়ের ডিস্পেন্সারিতে বসে নানা লোকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। এখানে যাদের জমি নেই তারা কষ্টের সময় শাপলার নাল সেদ্ধ করে খায়। শাপলার ঢ্যাপে থাকে দানামত জিনিস; তাই রোদে শুকিয়ে ফোটালে খইয়ের মত হয়, খেতে একটু নোনতা নোনতা লাগে। নইলে হয় কচু শাক, নয় বীচিকলা

সেদ্ধ। কাঁকর থাকে না বলে এমনিতেই এখানে খুদের খুব চাহিদা। সেই খুদের মণও এখন চব্বিশ পঁচিশ টাকা।

ডাক্তারবাবু খাস কলকাতার লোক। যাকে বলে ডাহা ঘটী। দশ বারো বছর ধরে এখানে আছেন। প্রথমে এসেছিলেন এক ব্যাঙ্কের কাজ নিয়ে। জায়গাটা পছন্দ হয়ে যায়। শেষ পর্যন্ত এখানেই থেকে গেছেন। শহুরে মানুষকে এভাবে বশ করতে পেরেছে যখন, তখন এ নিশ্চয় এই জায়গারই হাতযশ।

ডাক হরকরার কথা



[illegible]

Kamdhenu Milk producers co-op socity LTD.

ফুলের লোক্যালে ফেরা

লোকটাকে এ বছরও শেয়ালদার রথের মেলায় খুঁজে পেলাম না। এইবার নিয়ে কিন্তু চার বার হল। বলেছিল, 'ভাল গাছ রেখে দেব, আসবেন। আসবেন কিন্তু—'

প্রথম বছর নাম মনে ছিল। দ্বিতীয় তৃতীয় বছরে মুখ মনে ছিল। এ বছর নাম কিংবা মুখ কিছুই মনে পড়ল না।

তবুও রথের মেলায় গাছপট্টিতে ঘুরলাম। আমি ভুলে গেলেও তার তো আমাকে মনে থাকতে পারে?

ছাই! মাঝের থেকে নতুন জুতো পরে হাঁটতে গিয়ে পায় ফোস্কা পড়িয়ে ফেললাম। লোকটিকে খুঁজে বার ক'রে খুব যে ফয়দা হবে, তাও নয়। বাড়িতে তো আমার নিতান্ত হাতে মাটি করার জমি। টবে ফুলগাছ লাগাব এমন ফুলবাবুও আমি নই। কাজেই লোকটার সঙ্গে আমার দেখা না হলেই বা কী!

তবু মধ্যে মধ্যে মনে হয় চলে গেলেই তো হয়। হাওড়া থেকে সুনীলকে পাকড়ানো। ব্যস, তারপর বাগনান। ঠিক চার বছর আগে যেভাবে গিয়েছিলাম।

ট্রেন থেকে তো নামলাম। এবার স্টেশন থেকেও নামতে হবে।

খাড়া সিঁড়ি। খলবল খলবল করে নেমে গেছে সোজা রাস্তায়। ডাইনে তাকান। আজ্ঞে হ্যাঁ,—সাইকেল, টায়ার, স্পোক, চেন, সিট, বেল, হ্যাণ্ডেলের এক অফুরন্ত দুর্ভেদ্য জঙ্গলই বটে। ট্রেনে করে অফিস-ফেরতা বাবুরা ফিরবেন, তার পরই সব ভোঁ ভাঁ। তখন ওখানে ছুঁচোর ডন দেওয়া ছাড়া আর কিছু দেখবার থাকবে না।

বাজারে অমল গাঙ্গুলীকে কি পাওয়া যাবে? তাহলে এক আঁচড়ে বাগনান থানার ছবিটা একবার হালফিল এঁকে নেওয়া যেত। তাঁর তো সবই নখাগ্রে।

আটটি ইউনিয়ন নিয়ে বাগনান থানার চৌষট্টি বর্গ মাইল আয়তন। পুবে দামোদর, পশ্চিমে রূপনারায়ণ। এ ছবিটা বদলাবার নয়। লোকসংখ্যা নিশ্চয় এখন এক লক্ষ তিরিশ হাজারের বেশী। মাটির ওপর জনসংখ্যার চাপ তাহলে আগের চেয়ে আরও বেড়েছে। মোট জমির যে অর্ধাংশ বসতভূমি, আর বাকি অর্ধাংশের যে দশ শতাংশ জমি জলাভূমি—এ চার বছরে তার কোনো হেরফের হয়েছে বলে মনে হয় না।

জলা বলতে মনে পড়ে গেল তারাপদ সাঁতরার কাছে শোনা সেই ছড়াটা :

বাগনানের জলার ধারে
মাগশয়নী কাছে
যদিও বা শোয়
ফিকির ফিকির হাসে।

বাগনানের মাঠে ধান না হওয়ার বর্ণনা। যারা পাটের দড়ি বুনত আর চট তৈরি করত, সেই কপালীদের কাছ থেকে ছড়াটা পাওয়া।

মোট লোকের অর্ধেক কৃষিজীবী হলেও এ থানায় মোট জমির অর্ধাংশেরও ঢের কম জমিতে চাষ হতে পারে। চাষ হয় প্রধানত ধান; তারপর পান, পাট, আলু আর অন্যান্য রবিফসল। পঁচিশ বছর আগেও এ অঞ্চলে বিঘায় গড়ে ধান হত দশ মণ—এখন চার মণে এসে ঠেকেছে। বড় বড় দুটো নদীই মজে যাওয়ায় সেচ-ব্যবস্থা ভেঙে পড়বার দাখিল।

তার ওপর হয় অনাবৃষ্টি, নয় বন্যা। ধানের ফলন যেমন কমেছে, তেমনি মাথাপিছু জমির পরিমাণও কমে গেছে। কাজেই কম জমিতে লোক এখন পান চাষের দিকে ঝুঁকছে। চার বছর আগেও দেখা গেছে, এ থানায় মোট দু হাজার পান-বরোজ এবং প্রতি তেরো জনে একজন লোকের নির্ভর পান-বরোজ।

সেবার বৈদ্যনাথপুরে আমি গিয়েছিলাম। দেখলাম ষোল আনাই পান চাষ। বাঁটুল, মাশুমা, লুষ্ঠিয়া, পালোড়া, বীরকুল, খানজাদাপুরে ধানজমি নামমাত্র। সাঁচি কম, বাংলা পানই বেশী। দামোদর আর রূপনারায়ণের চরে পাট চাষ ছিল তিন চার হাজার কৃষক-পরিবারের নির্ভর। ফড়েদের হাতে পড়ে পাটচাষীরা এখন নিঃস্ব।

চাষীবাসী বাদ দিয়ে শতকরা যে-পঞ্চাশজন বাকি থাকছে, তাদের মধ্যে বিশজন গ্রামে মজুর খাটে, দশজন কলকারখানার মজুর, দশজন অফিসের কেরানী, স্কুলের মাষ্টার, ছোট দোকানদার আর বাকি দশ জন কামার, কুমোর, জেলে, শঙ্খকার, চিরুনীকার, চর্মকার—এইসব।

মনে আছে, বাজারটা পেরোতে গিয়ে দেখেছিলাম : সারি সারি মাইক্রোফোন, রেডিওর গমগমে আর সেইসঙ্গে দু চারটে ফটো তোলার ঝকমকানো দোকান। বাজী রেখে বলতে পারি, এ চার বছরে এ লাইনের দোকান বেড়েছে বই কমে নি। মন্তর পড়তে পুরুতেরও এখন মাইকের দরকার হয়। নইলে মন্তরের জোর বাড়বে কেন? এখন আর শুধু বিয়ের সম্বন্ধে কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায়, চাকরির দরখাস্তেও তো ফটোর দরকার।

তেমাথাটা আছে নিশ্চয়। বলা যায় না, এ চার বছরে চৌমাথাও তো হয়ে যেতে পারে। তা হলেও ডানদিকে এগিয়ে যেখানে তেরাত্তির ছিলাম সেই দোতলা মাটির বাড়িটা নিশ্চয় খুঁজে পাওয়া যাবে। বলা যায় না, মাটির বাড়ি ভেঙে দালানকোঠা হওয়াই তো নিয়ম। তাছাড়া ও রাস্তার এখন পায়া বেজায় ভারী। রূপনারায়ণে গাড়ি যাবার ব্রিজ হয়ে গেলে এটাই হবে জাতীয় সড়ক। তখন এ

রাস্তার খাতিরই আলাদা। ও রাস্তার দুপাশে জমির দাম এখন নিশ্চয় আরও বেড়েছে।

রূপনারায়ণ আর দামোদরকে যোগ করছে ছ মাইল লম্বা মেদিনীপুর ক্যানেল। এপারে আঁটুল, ওপারে বাঁটুল। চার শো ঘর লোকের মধ্যে ঘর চল্লিশ শাঁখারী। তাঁদের কো-অপারেটিভের বয়স তখন তিন বছর। সেক্রেটারি রাধারমণ দাস। কো-অপারেটিভ এখন নিশ্চয় সাত বছরের হল। দশ টাকা শেয়ারে তখন এক শো সাত জন সভ্য।

শাঁখ থেকে শাঁখা হয় ধাপে ধাপে। প্রথমে হয় শাঁখ ভাঙা, কোঁড়া, মালোই করা, মালোই ঘষা, শাঁখ চেরা। তারপর হয় সারাই — ভেতর ঘষা, ওপর ঘষা, নক্সা। তারপর পালিশ, তারপর মেরামত, তারপর সুতো বাঁধানো বা পেয়ার বাঁধা। ঘষামাজার কাজটা করে মেয়েরা।

শাঁখ আসে মাদ্রাজ আর সিংহল থেকে। কো-অপারেটিভ হওয়ার আগে সেই শাঁখ কিনতে হত কলকাতার ব্যাপারীদের কাছে থেকে। ওরা যখন রদ্দি মাল দিতে শুরু করল, তখন সরকারের চেষ্টায় মাদ্রাজ থেকে সরাসরি মাল আনবার ব্যবস্থা হল। দু-এক খেপ দিব্যি ভাল মাল কম দরে পাওয়া গেল। কলকাতার বাজারে যা দাম, সে তুলনায় দেড় শো শাঁখে কমসে কম এক শো টাকা বাঁচল। হলে হবে কি, সরকারী চাকুরেরা জানেন না কোন্ মাল কোন্ দামে কিনতে হয়। তাঁরা ক্রমেই নিরেস মাল দিতে থাকায় ষোলটা সমিতিই সরকারের কাছ থেকে মাল কেনা বন্ধ করে দিল। সরকারী গুদামে পচতে থাকল ষোল লক্ষ টাকার মাল।

কলকাতার দালালদের ব্যাবসা আবার ষোলকলায় পূর্ণ হয়ে জমজমাট হল। গোড়ায় গোড়ায় তারা কম দাম নিল, জিনিসও ভাল দিল। তারপর থেকে আবার যে-কে সেই। জিনিস চলনসই, দাম বেশী। টিউটিকোরিনকে শাঁখারীরা বলে তিতকুরি; যে তিতকুরি মাল সরকারের কাছ থেকে ২৬০৲ টাকায় মিলছিল, দালালদের

কাছ থেকে তা কিনতে হচ্ছে ৩৩০৲ টাকায়। এই মালে শাঁখা হবে ৪২৫৲ টাকা দামের। উদ্বৃত্তের প্রায় সবটাই চলে যাবে মজুরি দিতে। একটা কারখানায় দশ জনে মাসে গড়ে ছ বস্তা শাঁখা তৈরি করতে পারে। যুদ্ধের আগে শাঁখার জোড়া ছিল ছ আনা; এখন দু টাকা। আসলে আড়াই টাকা হলে তবে পড়তায় পোষায়। কিন্তু দাম বাড়ালে লোকেও আর কিনবে না।

এখন গেলে পদে পদে দিগ্‌ভ্রম হবে। আচ্ছা, দেউলগ্রাম দক্ষিণে নয়? গদি, কল্যাণপুর, মানকুড়—ঐ রাস্তাতেই তো!

দেউলগ্রামে গেলে হয়ত পাব কুশধ্বজ চন্দ্রকে। যারা মোষের শিঙের চিরুনি বিক্রি করে, এ চার বছরে তাদের হাল আর কতটা বদলাবে? শিঙের চিরুনির চাহিদা এখনও বেশ ভাল। চলছে বটে প্ল্যাস্টিকের চিরুনি। তবে শিঙের চিরুনির কদর তাতে কমে নি। তবে দামটা বাড়তে পারছে না প্ল্যাস্টিকের চিরুনিরই জন্যে।

শিঙের চিরুনি বলতে, নানান ডিজাইনের খোঁপা-চিরুনি, তুতকুম-চিরুনি, পকেট-চিরুনি — এসব তো আছেই, তাছাড়া তৈরি হয় ক্ষুরের হ্যাণ্ডেল, ছুরির বাঁট।

এ কাজ করে এ গ্রামের প্রায় তিরিশ ঘর লোক। এ শিল্প শুধু দেউল গ্রামে। আমতার কাছে থলেরসপুরেও দু-এক ঘরে কিছুটা হত।

কুশধ্বজেরা জাতে সূত্রধর। কোনো কোনো পরিবারে এখনও চিরুনি তৈরির সঙ্গে কাঠের কাজ আর প্রতিমা গড়ার কাজ হয়। কুশধ্বজেরা চিরুনি তৈরি করে আসছে পাঁচ-সাত পুরুষ ধরে।

মোষের শিং আসে কলকাতার মীর্জাপুর, মেছোবাজার, কলুটোলার হামিদ সাহেব রশিদ সাহেবের গোলা থেকে।

ফাটাফুটো রদ্দি শিঙের মণ চব্বিশ টাকা। শিঙের আগাল যে নিরেট অংশটা দিয়ে ক্ষুরের হ্যাণ্ডেল কিংবা ছুরির বাঁট তৈরি হয়, তার দাম তিরিশ থেকে চল্লিশ। ভালো ভালো বড় চিরুনি তৈরি করবার শিং পঞ্চাশ টাকা মণ।

গ্রামে মহাজন চারজন। তার মধ্যে দুজন করে নিছক কেনাবেচার কাজ—তারা বানানো-তৈরির মধ্যে নেই। মহাজন শিং এনে কারিগরকে দেয় বত্রিশ বা পঁয়ত্রিশ টাকা মণ দরে। সেই শিঙের চিরুনি তৈরি ক'রে কারিগর মজুরি পায় বিশ থেকে তিরিশ টাকা। ছাঁটগুলো পায় কারিগর। এক মণ শিং থেকে মোটা কুচো হয় পঁচিশ সের আর গুঁড়ো কুচো পাঁচ সের। চাষীর কাছে সার হিসেবে দশ-বারো টাকা মণে মোটা কুচো আর পনেরো-বিশ টাকা মণে ছোট কুচো বিক্রি হয়। দুই মহাজনের কারখানায় ছ টাকা রোজে যারা মজুরি করে, তারা কিন্তু কুচোকাচাগুলো পায় না।

এক মণ শিঙের চিরুনি তৈরি করতে একজন লোকের চোদ্দ-পনেরো দিন লাগে। মাসে চল্লিশ-পঞ্চাশ টাকা রোজগার করতে খাটতে হয় সকাল ছ-টা থেকে রাত ন-টা। কলকাতায় মাল বেচে মহাজনদের মণপিছু লাভ থাকে কমসে কম দশ থেকে পনেরো টাকা। বাগড়ি-মার্কেট, তামাপট্টি, মালাপট্টি, খ্যাংরাপট্টির সামনের মাঠ—এই সব হলো তাদের বেচবার জায়গা।

যারা ছিল স্বাধীন শিল্পী, এখন তারা ক্রমেই মহাজনদের কারখানার মজুর হচ্ছে। কেউ কেউ বাড়ি ব'সে কাজ করলেও মজুরি নিচ্ছে মহাজনের কাছ থেকে।

কুশধ্বজেরা দেখেছিলাম তখনও মহাজনদের জালে জড়িয়ে পড়ে নি। বাপ-বেটায় মিলে মাসে মণ দুই শিঙের চিরুনি তৈরি ক'রে নিজেরাই কলকাতার মনিহারি-পট্টিতে বেচে আসত। এখনও কি তাই করে?

শাওড়া, মুগকল্যাণ আর খাজুরনান—এই তিন গ্রাম যেখানে এসে মিশেছে, তারই মোড়ের ওপর রাস্তার পশ্চিমে গ্রামসেবা সঙ্ঘ। চণ্ডীবাবু নিশ্চয় আছেন?

তাঁরই মুখে শুনেছিলাম সেবাসঙ্ঘ পত্তনের গল্প। দেশ স্বাধীন হওয়ার সময়ও তিনি কংগ্রেসে ছিলেন। সাতচল্লিশ সালে বাগনান থানার ইউনিয়ন জ্যাকটি নামিয়ে জাতীয় পতাকা তোলবার সময় যে-

বক্তৃতা দিয়েছিলেন, আজও তা বুকের মধ্যে খচ খচ করে। কী ভাবা গিয়েছিল তখন আর পরে কী হল! ক্ষমতা হাতে পেলে কি তবে এই রকমটাই হয়? কাজেই কংগ্রেস ছেড়ে প্রজাপার্টি। কিছুদিন ভূদান। তারপর সব ছেড়ে গঠনমূলক কাজ।

উনপঞ্চাশ সালে চণ্ডীবাবু এ জায়গাটা বেছে নিয়েছিলেন সবচেয়ে ওঁছা বলে। এখানে ছুটো পাড়া—গুনীনপাড়া আর ফকিরপাড়া। এরা না-হিন্দু, না-মুসলমান। মেয়েরা চুড়ি বিক্রি করে, ছেলেরা সাপ ধরে। এরা যা ক্ষতি করত তা নিজেদের — পরের ক্ষতি পারতপক্ষে এরা করত না। মদ চোলাই করত, তে-তাস জুয়ো খেলত আর ছিল মেয়ে আমদানি করার ব্যাবসা।

এখন এ ছু পাড়া পুরোপুরি শ্রমজীবী। মেয়েরা এখনও চুড়ির ব্যাবসা করে। সেই সঙ্গে ঢেঁকিতে ধান ভাঙে, চরকায় স্থতো কাটে। ছেলেরা ছু-চারজন এখনও সাপ ধবে। তবে বেশির ভাগই হয় রিক্সা চালায়, নয় জনমজুরি করে, নয় ছোট ছোট দোকান করে।

প্রথমে এখানে কাজ শুরু হয় কস্তুরবা গ্রামসেবিকার ট্রেনিংপ্রাপ্ত ছুজন মহিলাকর্মী নিয়ে। গুনীনপাড়া আর ফকিরপাড়ায় খোলা হল বালবাড়ি। আড়াই বছব থেকে আট বছরের মধ্যে যাদের বয়েস, তাদের বালবাড়িতে এনে নিয়মানুবর্তিতা আর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা শেখানো আর দৈহিক শ্রমের দিকে আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা হল। বালবাড়িতে ক্লাস টু অব্দি পড়ানো হয়। সেই সঙ্গে নাচ-গান-খেলা। এ ছুই পাড়ায় পনেরো বছরের কম যাদের বয়েস, এখন আর তাদের মধ্যে কেউ নিরক্ষর নেই।

বালবাড়ি চালাবার খরচের তেরো আনা অংশ আসত কস্তুরবা ফাণ্ড থেকে। গোড়ায় গোড়ায় বছরে বারোটা করে তিন দিনের শিবির হত। তাতে হাওড়া জেলার নানা এলাকা থেকে যুবকেরা আসত। একেকবারে গড়ে তিরিশজন করে। শিবিরের কর্মসূচী ছিল: পুকুরের পানা তোলা, রাস্তা তৈরি, আগাছা পরিষ্কার, কম্পোস্ট সার তৈরি,

পাঠচক্র, আলোচনা বৈঠক, সুতো-কাটা, প্রার্থনা। দুঃস্থদের ওষুধপত্র, রোগীর সেবা, ভ্রাম্যমাণ গ্রন্থাগার আর বাড়ি বাড়ি মুষ্টিভিক্ষার ভাঁড় বসানো—এ সবের ব্যবস্থা হল।

কিন্তু ক্রমে বোঝা গেল, সমাজসেবাকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে গেলে হয় চাষবাস, নয় কুটির-শিল্পের আশ্রয় নিতে হবে। সুতরাং জন তিরিশ কর্মীকে কয়েক খেপে পাঠানো হল ওয়ার্ধা, নাসিক, বেলগাঁওয়ে তেলসাবান তৈরি, কাঠের কাজ, চামড়া, তাঁত, মৃৎশিল্প, মৌমাছি-পালন শিখতে। ধাত্রীবিদ্যা শিখতে পাঠানো হল এলাহাবাদে।

সেবাসঙ্ঘে এখন সতেরো জন ট্রেন্‌ড্‌ কর্মী। ঘানি দিয়ে শুরু হয়ে এখন মাটির কাজ, সাবান তৈরি, তাঁত, মৌমাছি-পালন, হাঁসমুর্গীর চাষ। সমাজসেবার কাজ বলতে বালবাড়ি ছাড়াও আছে ভ্রাম্যমাণ পাঠাগার, সপ্তাহে দুদিন মেয়েদের দর্জির কাজ শেখানো, পঞ্চাশ জন দুঃস্থকে গুঁড়ো দুধ বিলি। তাছাড়া আছে দাতব্য চিকিৎসালয় — অর্থাভাবে সেখানে শুধু হোমিওপ্যাথিক ওষুধের ব্যবস্থা। আব দুজন ধাত্রী নিয়ে মাতৃমঙ্গল।

জাপানী প্রথায় চাষ শেখাবারও একটা ব্যবস্থা আছে। বিঘায় খরচ বাড়ে চল্লিশ টাকা, কিন্তু লাভও তেমনি বাড়ে বিঘায় পঞ্চাশ টাকা। ফসল আড়াই গুণ পর্যন্ত বাড়তে দেখা গেছে। কিন্তু হলে হবে কি, যে-চাষী জমি চাষ করে বেশিব ভাগ ক্ষেত্রেই জমিটা তার নয়। যে-জমিতে সে সার দিচ্ছে, সে জমি পরের বছরও তার থাকবে কিনা ঠিক নেই। তাছাড়া এত কিছু ক'রে ফসল যেমন বাড়বে, তেমনি কিছু না ক'রে সে ফসলে মালিকের ভাগটাও তো সেই হারে বেড়ে যাবে?

রাস্তা দিয়ে আসতে আসতে চোখে পড়েছিল—দুপাশের বাড়িগুলোর উঠোনে কি রকম রংবেরঙের বিলিতি আর দো-আঁশলা মুর্গীব ছড়াছড়ি।

একা গেলে দেউলটি মহাশ্মশানের রাস্তাটা এখন আর খুঁজে পাব না। সেই যে, যেখানে মূলো-কালী আর তাল-কালীর ভারী মেলা হয়। আর ভলুটাসের সেই রোগা টিংটিঙে প্রাক্তন কেরানিটি? কাঠের কাজ ছিল

যাঁর বংশগত পেশা ? আশ্রম খুলে এখন যাঁর দিব্যি শাঁসে-জলে চেহারা হয়েছে !

পানিত্রাসের শরৎ স্মৃতি-সংগ্রহশালায় দেখেছিলাম শরৎচন্দ্রের ব্যবহৃত ওভারকোট, ছাইদানি, লেখবার ডেস্ক, চটিজুতো, পাণ্ডুলিপি আর অপ্রকাশিত বহু চিঠিপত্র। গুপ্তযুগের পাথরে খোদাই সূর্য-মূর্তির ভগ্নাংশ, পাল আর সেন যুগের বিষ্ণুমূর্তি, কালো পাথরের বিষ্ণুপট্ট, জৈনমূর্তি, চামুণ্ডামূর্তি। প্রাচীন মন্দিরগাত্রের ভাস্কর্য আর বিভিন্ন যুগের কত মুদ্রা। তালপাতা আর তুলোট কাগজে লেখা তিনশো সাড়ে-তিনশো বছব আগেকার পুঁথিপত্র, মূল্যবান পুরনো দলিল-দস্তাবেজ। নানা জেলা থেকে আনা হাতে-টেপা পুতুল, রং-করা পুতুল, নক্সীকাঁথা, মাটির ঘোড়া, পট, নক্সা-করা কাঠের কাজ। কত কী !

সাত কাঠা জমিব ওপব মিউজিয়ম গড়াব স্বপ্ন কতদূর সফল হল ?

যে-লোকটাকে আমার খুঁজে বার করতে হবে, তাকে আমি পাব ভুরবেড়িয়ায়। ভুরবেড়িয়া, না, ভুলবেড়িয়া ? লোকে ছু-রকমই বলে। যে নামই হোক, বদ্‌লাতে বদ্‌লাতে একদিন হয়ত দেখলেন নাম হয়ে গেছে ফুলবেনিয়া।

এ গ্রামে ফুলের চাষ হচ্ছে হালে। দশ এগারো বছর আগেও এ গাঁয়ে ফুলের চাষ কবত মোটে ছু-তিন ঘর। গ্রামে ছেচল্লিশ ঘর লোক। বলতে গেলে ষোল আনাই এখন ফুল-চাষী। ধানচাষ সামান্য। এ গাঁয়ের প্রায় বারো আনা লোককে চাল কিনে খেতে হয়।

ফুলের চাষে অনেক হ্যাপা। মাটি কোপানো। সার দেওয়া। কলম বাঁধা। নিড়ানো। জল দেওয়া। গাছ হাপর দেওয়া, অর্থাৎ ডাল থেকে কেটে মাটিতে পোঁতা। চারানো। রোজ গড়ে পাঁচটা করে জন লাগে। কোপানো আর সার দেওয়ার কাজে রোজ ছু টাকা। কলম বাঁধতে পাঁচ টাকা। হাপর দিতে তিন টাকা। অন্যান্য টুকিটাকি কাজে ছু টাকা।

বাজারে বিক্রির জন্যে গাছ বয়ে নিয়ে যাবার একটা খরচা আছে।

তাকে বলে বউরি খরচা। ঝুড়ি পিছু এক টাকা। তা বাদে আছে পার্সেল খরচা।

চার বিঘে জমিতে বছরে বীজ কিনতে হয় তিন-চারশো টাকার। সব চেয়ে বেশী দাম পামগাছের বীজের। পিচাড়িয়া দশ টাকা হাজার, অ্যারিকা আট টাকা হাজার।

দাম পাওয়া যায় চারা বিক্রিতেই সবচেয়ে বেশী। এক ধরনের বিলিতি গোলাপ আছে, একটা চারারই দাম তিরিশ টাকা। তাছাড়া ফুল বিক্রি আছে। সবচেয়ে বেশী কাটে গোলাপ।

কোলাঘাট থেকে ভোরবেলায় ছাড়ে 'ফলের লোক্যাল'। রোজ যায় প্রায় তিনশো ফুলওয়ালা।

বলাই মান্নার বাগানটা আরেকবাব দেখে আসতে হবে। ও অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ফুলচাষী বলাই মান্নাব বয়স এখন বোধহয় চুয়ান্ন পঞ্চান্ন হল ?

ওর বাগানে ফলের চাষও কিছু হয়। আম, কালোজাম, গোলাপ-জাম, লিচু, সবেদা, জামরুল, পেয়ারা, কাগজী লেবু, বাতাবী লেবু, কমলা, ন্যাসপাতি, ডালিম, বেদানা। কলমের চারা বিক্রি হয়। সবচেয়ে দাম বেশী আমের চারার। একেকটি তিন টাকা।

আসল বাগান ফুলের। কত সব রকমারি ফুল। আর তাদের কত আহা-মরি সব বাহারী আহ্লাদী পেল্লাদী নাম।

বিলিতি গাছ : ট্যালিসম্যান। ভট্‌চায্যি হোয়াইট। স্নো হোয়াইট। ঈজি হিল। ফর্টিনাইনা। গোল্‌ডেন ফেয়ারি। লেডী হ্যারিংটন। পলিরন। গ্লোরিয়া ডি ডচার। অ্যামেরিকান বিউটি। ইণ্ডিপেণ্ডেন্স পীস। বার্সিলোনা। সুলতান। আলেকজাণ্ডার বার্ণেস। ইটয়েল ডি নিয়ন। ইটয়েল ডি ফ্রান্স। কালো গোলাপ নিগ্রেডি। নাইট। এলিট। পিকচার। ব্ল্যাক প্রিন্স।

আছে বস্‌রাইল, দো-রঙা, চাইনিজ গোলাপ। বেল, রাইবেল, মোতিয়া বেল, মডরু বেল, খ'য়ে বেল, জাপানী রাইবেল।

যুঁই, ডবল আর সিঙ্গেল যুঁই, চামেলী, জাপানী আর দেশী জেসমিন, লতানো টিকোমা জেসমিন, স্বর্ণ যুঁই, স্বর্ণ চামেলী। ডবল আর সিঙ্গেল জাপানী গন্ধরাজ। ডবল আর সিঙ্গেল টগর। কামিনী। লাল আর সাদা করবী, কাশীর করবী, কপিলাক্ষ করবী। বোগেনভেলিয়া। রিডাই, জার, বিউটি, ইণ্ডিয়ান প্রিন্স, টর্টিলাস্, মহারাজা অব মহীশূর, ভিক্টোরিয়া পাতাবাহার। রজনীগন্ধা। কাঞ্চন। শিউলি। লাল আর সাদা স্থলপদ্ম। ম্যাগ্নোলিয়া। গ্র্যাণ্ডিফ্লোরা। ডালিয়া।

চন্দ্রমল্লিকা। স্বর্ণ চাঁপা, জহুরী চাঁপা। হাসনুহানা। পঞ্চমুখী, সপ্তমুখী, অরোরা জবা।

আছে তেজপাতা, দারুচিনি, পাম, ঝাউ। আর রকমারি ফুলের রকমারি নাম: নেতাজী, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, বিধান রায়, নির্মলচন্দ্র চন্দ্র, স্বামী বিবেকানন্দ।

ফুলচাষী যে-দামে যে-ফুল বেচছে, আপনি তার দশ বারো গুণ বেশী দামে সেই ফুল কিনছেন। হেঁয়ালীর মতো শোনালেও কথাটা সত্যি। কেননা সটান চাষীর হাত থেকে তো আর আপনার হাতে যাচ্ছে না। চাষী আট আনা শ-য় চালানদারকে বেচছে। চালানদার সে-জিনিস পাইকারকে বেচছে দু টাকা শ-য়। পাইকার সে-ফুল দোকান-দারকে তিন-চার টাকা শ-য় বেচছে। দোকান থেকে আপনি পাচ্ছেন পাঁচ-ছ টাকা শ-য়। তিন ধাপে দশ গুণ। চাষ থেকে দোকান—সবটাই যদি সমবায়ের হত? তাহলে ফুলের দরও কমত—আরও বেশী লোকের কাছে ফুলের আদরও বেড়ে যেত। এই মাঝের ধাপগুলো কমিয়ে আনতে পারলে চাষীরও কিছু বেশী থাকত আর আপনারও কিছু কম পড়ত।

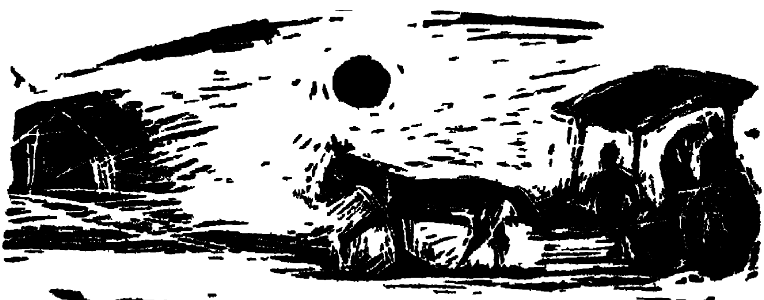
এই দেখুন, এতক্ষণে লোকটাকে মনে পড়েছে। দাওয়ার ওপর বসে কথা হচ্ছিল। সামনের একটা বাড়ি থেকে ভেসে আসছিল গাঁক গাঁক করে রেডিওর আওয়াজ। মুড়ি, তেলেভাজা আর গরম চা এল। ঢ্যাঙা মতো সেই লোকটা। মনে পড়ছে। মুখ মনে পড়ছে। ভুরবেড়িয়ায়

গেলেই চিনতে পারব। দাওয়াটার ওপর আবার গিয়ে বসলে নামটাও হয়ত মনে পড়ে যাবে।

চলে গেলেই তো হয়। হাওড়া থেকে কেন? এবার অছিপুরে গঙ্গা পেরিয়ে উলুবেড়িয়া ষ্টেশন থেকে ট্রেনে উঠব।

ফিরব ভোরবেলাকার ফুলের লোক্যালে।

আর তা যদি কবি, তাহলে আসছে বাব এখানে রথের মেলায় আস্ত একটা ভালো ফুলেব গাছও আমাব কপালে নাচছে।



নিম নয়, তিতা নয়

হাওড়া থেকে ট্রেনে পুরো একবেলার পথ। স্টেশন আগে ছিল ধুলিয়ান। নদীতে ভেঙে যাওয়ায় এখন নিমতিতা।

ট্রেনে এসে থামল শেষ রাতে। প্ল্যাটফর্মে টিমটিমে বাতি। বাইরে ঘুটঘুট করছে অন্ধকার। বেরোবার দরজা থেকে নীচে নেমে গেছে সিঁড়ি। নামতে নামতে বুঝলাম নীচের জমি থেকে স্টেশন অনেকখানি উঁচুতে।

যেন পা তুলে আছে। বর্ষার জলের ভয়ে কি?

গাঢ় নীল-গোলা জলের মত অন্ধকার। একটু দূরে দৈত্যকায় কয়েকটা গাছ। তাদের হাঁটুর কাছে ছেঁড়াখোঁড়া আকাশ। মহাজনদের আড়তের মত দেখতে টিনের বড় বড় চালাগুলোর মাথার ওপর দিয়ে আবছা নজরে পড়ে।

কাছেই কয়েকটা টাঙা দাঁড়িয়ে। সঙ্গে হারিকেনের আলো। ঝোলানো আলোয় তলাকার মাটিটাই শুধু যা দেখা যাচ্ছে। কয়লার গুঁড়োমাখা খড়কুটো আর শুকনো পাতার মধ্যে পাটকাঠিগুলো গোরা পল্টনদের মত ঠিকরে আছে। ঘোড়াগুলো ঘুমচোখে ঠায় দাঁড়িয়ে থেকে থেকে মাঝে মাঝে পা বদলাচ্ছে। তখন একটু করে ঠুনঠুন আওয়াজ। ধুলিয়ানে লোক নিয়ে যাবে যে স্টেশন-ওয়াগন, সেটা

ছাড়তে এখনও ঢের দেরি। সকাল হোক, প্যাসেঞ্জার আসুক। তারপর ছাড়বে। তাই তার তেমন হাঁকডাক নেই।

টাঙা দেখে আমার খুব ছেলেবেলাকার পুরনো একটা ছবি হঠাৎ মনে পড়ে গেল।

কলকাতা থেকে চাটিবাটি উঠিয়ে আমরা এসে নেমেছিলাম সান্তাহার স্টেশনে। তখন সবে রাত পুইয়ে সকাল হচ্ছে। ব্লটিং পেপারে কালি শুষে নিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনিভাবে। দূরে মাথার অনেকখানি ওপরে ওভারব্রিজটা, কী আশ্চর্য, কিছুই না ধরে কেমন করে যে ঝুলছিল। আমি আর দাদা আনন্দে হাত ধরাধরি করে আগে আগে চলছিলাম। স্টেশনের বাইরে দাঁড়িয়ে ছিল টমটম। ঠিক টাঙারই মত। এক-ঘোড়ায়-টানা দু-চাকার গাড়ি। হাসিখুশিতে এক্কার ছবি দেখেছিলাম তার ঢের ঢেব পরে।

টাঙায় উঠে পেছনের সিটে বসে পুরনো কথাগুলো মনে করতে বেশ লাগছিল।

পর পর কয়েকটা টাঙা। আউটডোরে ছবি তুলতে চলেছে দলবল। আমি অবশ্য রেয়োক্লাট। দলের কেউ না হয়েও ভিড়ে পড়েছি দলে। সরজমিনে না দেখলেও নিমতিতা আমার একেবারে অদেখা নয়। দেখেছি 'জলসাঘরে' আর 'দেবী'তে। দেখার চেয়েও বেশী শোনা। 'পদ্মা নদীব মাঝি'র প্রসঙ্গে শুনেছিলাম ভারতের মাটিতে দাঁড়িয়ে পদ্মা দেখবার এই নাকি একমাত্র জায়গা। কাজেই সে লোভ অনেকদিন থেকেই আমার মনে মনে ছিল।

বসেছিলাম পেছনের সিটে। গাড়োয়ানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে। মাঠঘাট পেরিয়ে আস্তে আস্তে লোকালয় পাওয়া গেল। পিচের রাস্তা ছেড়ে খোয়া-বাঁধানো সড়ক। দু-পাশে বৃষ্টির জল নিকাশী খানাখন্দ। মধ্যে মধ্যে কালভার্ট।

যেদিকেই তাকাই, সব মিলিয়ে কেমন যেন একটা উত্তর-বাংলা উত্তর-বাংলা গন্ধ।

টাঙায় পেছনের সিটে বসা মানেই উল্টোমুখো হয়ে বসা। তার ওপর, পা রাখার জায়গাটা রাস্তার সঙ্গে প্রায় ঠেকে গিয়ে কেমন একটা আধ-দাঁড়ানো গোছের ভাব হয়। আর দু-পাশের দৃশ্যগুলোও আসে হঠাৎ আচমকাভাবে। আগে থেকে একটুও জানান না দিয়ে। সামনে যারা বসে আছে তাদের ওপর রাগ হয়। ওরা যেন একলষেঁড়ের মত আগেভাগে সব দেখে নিয়ে পেছনের লোকদের জন্যে টিপে টিপে একটু একটু করে ছাড়ছে। নতুন জিনিস একটার বেশী একসঙ্গে কিছুতেই দেখাবে না।

গাড়ির গতি কমবার ধবনে বোঝা গেল এবার আমরা এসে পড়েছি। রাস্তা ছেড়ে উঁচু-নীচু অ-সমান জমি। আবছা আলোয় একটা-দুটো স্তম্ভ। এখানে এই প্রথম এলেও কেমন যেন সব চেনা-চেনা। নিজেকে জাতিস্মরের মত মনে হয়। বাড়ির দোরগোড়ায় টাঙা এসে থামল। রাজপ্রাসাদের মত বাড়ি। গলির দু-পাশে একতলার পৈঠে। বাইরের অন্ধকারটা আলোর খোঁচাখুঁচিতে উঠে বসে আড়ামোড়া ভাঙলেও বাড়ির ভেতরের অন্ধকার তখনও দিব্যি মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছে। লণ্ঠনের একটা আলোকে তৎক্ষণাৎ পা টিপে টিপে নীচে নেমে আসতে দেখা গেল।

গায়ে ঠাণ্ডা সিরসিরে হাওয়া লাগতেই পেছন ফিরে তাকালাম। সামনে হাঁ হাঁ করছে আকাশ। আমরা কি তবে নদীর ধারে এসে দাঁড়িয়েছি? ঠিক ঠাহর করতে পারলাম না। সামনে উঠোনের মাঝখানে একটা শান-বাঁধানো চত্বর। পাশেই নড়ে চড়ে পাহারা দিচ্ছে এক বন্দুকধারী সেপাই। দোতলায় উঠতে উঠতে শুনলাম এ-বাড়ির একতলায় সীমান্ত-পুলিশের ফাঁড়ি।

এককালে এ-বাড়ির কী জাঁক ছিল, ভেতরে এলে বোঝা যায়। দোতলায় ভেতরে বাইরে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চওড়া বারান্দা। স্বচ্ছন্দে ব্যাডমিন্টন খেলা যায়। বাঁদিকে হলঘর। রং-করা দেয়াল। দেয়ালে ইলেকট্রিকের লাইন। যখন এ গাঁয়ে বিজলী আসে নি, তখনই

নিজেদের ডায়নামো চালিয়ে এ বাড়িতে ইলেকট্রিকের আলো জ্বালানো হত। ডায়নামোটা এখন অচল হয়ে পড়ে আছে। গ্রামে ইলেকট্রিসিটি এসে গেছে। এখন আর ডায়নামো সারিয়েই বা কী হবে? ইলেকট্রিকেরও আগে ছিল বেলোয়ারি কাঁচের ঝাড়লণ্ঠনের যুগ। হলঘরটা তখন ছিল সত্যিকারের জলসাঘর। ও-ঘরে কী ফুর্তির ফোয়ারাই না বয়ে গেছে একদিন!

গরম চায়ের পেয়ালাটা নিয়ে পুবের বারান্দায় এসে যখন দাঁড়ালাম, আকাশ যেন ডিমের কুসুমের মত ফেটানো। সামনে গঙ্গা। একটু বাঁদিকে চরের গা ঘেঁষে গেছে পদ্মা। পদ্মা পার হয়ে দিগন্তের পায়ের কাছে সবুজ নরুণপাড় বনরেখা। কাছে চরের গায়ে কাঁচা রোদ পড়ে ঝলমলিয়ে উঠেছে কাশফুল। রোদ ওঠবার আগেই সবাই নূরপুরের বাগানে চলে গেল ছবি তুলতে। আকাশটাকে মুখে করে আমি একা। রাস্তা জেনে নিয়েছি। বেলা হোক। তারপর নদীর ধার দিয়ে ধার দিয়ে যাব।

খানিক পরেই এসে গেলেন রাধানাথবাবু। রাধানাথ চৌধুরী। এঁদেরই বাড়ি। রায়েরা শুধু খনেদী জমিদার নন, পড়াশুনো-করা রুচিবান মানুষ। এ অঞ্চল নিয়ে অনেকক্ষণ ধরে গল্প হল।

রায়বাড়ির একতলায় সরকারী সেট্‌ল্‌মেন্ট ক্যাম্প। ফরাক্কা আর শামসেরগঞ্জ—এই দুই থানা নিয়ে কাজ। ফরাক্কায় চার-চারটে ইউনিয়ন: অর্জুনপুর, বেনিয়াগ্রাম, ফরাক্কা আর শ্রীমন্তপুর। সব মিলিয়ে বাহাত্তরটি মৌজা। আর শামসেরগঞ্জ থানায় ইউনিয়ন তিনটি: নিমতিতা, কাঞ্চনতলা, ভাসাইপাইকর। মোট পঞ্চাশটি মৌজা।

ওপরদিকে পশ্চিম দিনাজপুর অবধি ধরলে মানচিত্রে পশ্চিমবঙ্গের বেশ একটা আজব-প্রাণী আজব-প্রাণী চেহারা হয়। এই আজব প্রাণীর গলাটাই হল শামসেরগঞ্জ। বাংলার এই সরু গলাটা বিহারের গায়ে প্রায় লেপটে আছে। হাটেবাজারে আর সাধারণ মানুষের আটপৌরে জীবনে তার ছাপ মেলে।

আগে বড় অর্থে গণ্ডগ্রাম বলতে যা বোঝাত নিমতিতা তাই। তিনটি উদ্বাস্তু কলোনি নিয়ে গ্রামে মোট হাজার পাঁচেক লোক। এলাকা আগে আরও অনেক বড় ছিল। পাকিস্তান হয়ে এ গ্রামের পাঁচ-ছ হাজার বিঘে জমি হাতছাড়া হয়ে গেছে। তাছাড়া আরেক শত্তুর নদী। উনিশশো একচল্লিশের ভাঙনের পর থেকে এ পর্যন্ত দু-আড়াই হাজার বিঘে জমি গেছে নদীর পেটে। জোত খুইয়ে পাঁচ-ছ শো চাষী পরিবারকে জাতও খোয়াতে হল। এরা এখন কেউ মোট বয়, কেউ বাগান নিড়োয়, কেউ ঘরামির কাজ করে, কেউ গাড়ি চালায়, কেউ আনাজপাতি বেচে। তবে এদের মধ্যে পনেরো আনা লোকই এখন বিড়ি বাঁধে।

চাষীদেব মধ্যে এখানে মোটামুটি তিন জাত। মুসলমান, মাহিষ্য আব ধানুক। মুসলমান চাষীরা বেশির ভাগ থাকে বাগড়ী এলাকায়। নদীব ধাবে ধাবে। মেটাল এলাকায় থাকে মোটামুটি মাহিষ্য আব ধানুক। ধানুকবা এসেছে বিহাব থেকে। বাঢ় এলাকায় হিন্দু-মুসলমান দুযেবই বাস। আরেকটা জাত আছে, তাদেব বলে 'চাঁই'। তারা সাধারণত তরিতরকারির আবাদ কবে।

বিশ পঁচিশ বছব আগেও এ অঞ্চলে ছিল লাক্ষার ফলাও ব্যাবসা। লাক্ষাকে চলতি কথায় বলে 'লাহা'। সব পবিবাবই তখন কিছু না কিছু লাহার চাষ করত। এ অঞ্চলে লাহাব চাষ হয় কুলগাছে আর বিহারে হয় পলাশ গাছে। লাহার বিছনকে বলে 'তুড়ি'। কুলগাছে তুড়ি দিয়ে একহাত করে ডাল বেঁধে দেওয়া হয়; তারপর সেই গাছে পোকার দল ছড়িয়ে পড়ে লাহা তৈরি করে।

লাক্ষার গাছগুলো এখন নদীর পেটে। তাছাড়া লাক্ষার বিছনও এখন যেমন দুষ্প্রাপ্য তেমনি দুর্মূল্য। লাক্ষার ব্যাবসাতে এখনও লেগে আছে শতকবা চার কি পাঁচজন। লড়াইয়ের আগে তুড়ির যা বাণ্ডিল ছিল, এখন তার দাম হয়েছে তিন থেকে পাঁচগুণ। লাক্ষার দাম কমেছে সেখানে টাকায় আট আনা থেকে বারো আনা। আগে প্রচুর

লাক্ষা যেত ইংলণ্ড, আমেরিকায়। জার্মানিতে কৃত্রিম রঞ্জন তৈরি হওয়ার পর থেকে লাক্ষার বাজার গেছে।

অতিবৃষ্টি আর অনাবৃষ্টি, এই দু-কারণেই ধানের চাষ এদিকে আগের চেয়ে কমে গেছে। বন্যায় কম নষ্ট হয় বলে পাটের চাষটাই বেড়েছে। ক-বছর পাটের দরও পাওয়া গেছে ভালো। কালীগঞ্জ, ঔরঙ্গাবাদ,নিমতিতায় স্থানীয় লোকেব আড়তই আছে দেড়শো। তাছাড়া বাইবের সুরজমল, জৈন, মঙ্গলবাবু, জে. সি. মুখুজ্যে—এদেরও আছে শতখানেক আড়ত। পাটের কেন্দ্র হিসেবে নিমতিতার স্থান ধুলিয়ানের ঠিক পরেই। নৌকো, ট্রাক আর ট্রেণে বছরে আট দশ লক্ষ মণ পাট এখান থেকে চালান যায়। রাজমহল বা কাছাকাছি আরও নানা এলাকার পাট নিমতিতা হয়েই যায়। চাষীর হাত থেকে কমপক্ষে চার হাত ঘুরে পাট যায় চটকলে। এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়ো যেতে ফারাক হয় পাঁচ-সাত টাকার।

রাধানাথবাবুর দুই ছেলে সৌম্যেন আর খোকন। ওদের সঙ্গে খুব ভাব হয়ে গেল। ঠিক হল নুরপুবে যাওয়ার পথে গাড়ুলীপাড়াটা একবার ঘুরে যাওয়া যাবে। গাড়ুলী নামটা আগে কখনও শুনি নি। শুনলাম নীচু জাত; কম্বল বানানো পেশা। বোকা লোককে আমরা গাড়ল বলি কেন? গাড়ল মানে কী?

খোকন তক্ষুনি একটা অভিধান এনে হাজির করল। 'গাড়ল'। গাড়ল মানে ভেড়া। যারা গাড়ল পোষে তারাই গাড়ুলী। এরা এক-ধরনের আদিবাসী। বিহার থেকে বাংলায় এসেছে। নিজেদের মধ্যে কথা বলে ভাঙা হিন্দীতে।

রাস্তাব ওপারে নদীর ধারে ছোট পাড়া। আট-দশ ঘর গাড়ুলীর বাস। মাইল তিনেক দূরে আলমশাহী, বাসুদেবপুর, মজিলপুর—পাশাপাশি তিনটি গাঁয়ে থাকে আশী-নব্বই ঘর গাড়ুলী। জঙ্গীপুর মহকুমাব বাইরেও মুর্শিদাবাদ জেলার আরও নানা জায়গায় এদের বাস আছে। তাছাড়া বিহারের গাড়ুলীদের সঙ্গেও এদের বিয়ে-থা হয়।

গাড়ুলীপাড়ায় ঘর বলতে সবই খড়ের চালা। মহেন্দ্র ঘোষের দাওয়ায় বসে খানিকক্ষণ এ কথা সে কথা হল। তারপর ঢুলু ঘোষের সঙ্গে পাড়াটা একবার টহল দেওয়া গেল।

এ পাড়ায় জমি কারো নেই বললেই চলে। সামান্য একটু বাস্তু আর দু-এক বিঘে চাষের। থাকবার মধ্যে সব বাড়িতেই কম্বল বোনার একটা করে মান্ধাতার আমলের সাদাসিধে যন্ত্র।

বাংলা-বিহারের অনেক জেলাতেই চাষীরা বাড়িতে ভেড়া পোষে। ভেড়ার মাংস কিংবা ভেড়ার লোমের চেয়েও তাদের কাছে বেশী কদর ভেড়ার নাদির। কেননা ভেড়ার নাদিতে ভালো সার হয়। বাংলা-বিহারের গ্রামে গ্রামে ঘুরে গাড়ুলীদের ভেড়ার লোম যোগাড় করতে হয়। বছরে বেরোতে হয় তিন বার। কেননা ভেড়ার লোম কামানোর তিনটে সময়: মাঘ-ফাল্গুন, জষ্টি-আষাঢ়, আশ্বিন-কার্তিক। বছরের অর্ধেক সময় তাদের এ গ্রামে সে গ্রামে বেদের টোল ফেলে ফেলে ঘুরতে হয়।

লোমের জন্যে গেরস্থকে ভেড়াপিছু দিতে হয় এক আনা দু আনা। লোম কামাতে লাগে একটা হেঁসোর মত যন্ত্র কিংবা কাচি। একেকটা বস্তায় দু শো ভেড়ার লোম হয়। পঁচিশ-তিরিশ সের তার ওজন। পাঁচ-ছটা কম্বল হবে তাতে। জঙ্গীপুরে আছে ভেড়ার লোমের মহাজন। তাদের কাছ থেকে কিনতে গেলে দর পড়ে মণকরা নিরেস তিরিশ টাকা। তাও কশাইখানার চুনমেশানো লোম। কারণ, মরা ভেড়ার চামড়া থেকে ওরা লোম তোলে চুন লাগিয়ে। মহাজনেরা যে সরেস লোম বেচে তার দর আশী থেকে একশো টাকা।

লোম আনবার পর থাকে ধোয়াবাছার কাজ। রংওয়ারি বেছে বেছে লোমগুলোকে আলাদা করতে হবে। নলের ঝুড়িতে লোম নিয়ে গঙ্গায় চুবিয়ে ধুতে হবে। ধোয়ার পর শুকোনোর পালা। তারপর তুলো ধোনার মত করে চরকায় সুতো কাটতে হবে। সুতো কাটার পর তানাহাঁটি করে ঝাঁপে বুনতে হবে। তাও সবটা একবারে নয়।

আলাদা আলাদা চারটে ফালি বুনে সেগুলোকে সেলাই করে জুড়ে দু-পাশে ঝালর লাগিয়ে তারপর জমাট করতে হবে।

আটপৌরে একেকটা কম্বল বেচে দশ-বারো টাকার বেশি পাওয়া যায় না। পাঁচ ফালি জোড়া-দেওয়া একেকটা অর্ডারি ভালো কম্বল বেচলে পাওয়া যায় গোটা তিবিশেক টাকা। তেমন অর্ডার দু-চারখানার বেশি মেলে না। বছরে একবার মালদহের রামকেলির মেলাতেই যা কম্বল বিক্রি হয়। আর হয় পাইকাররা বাড়িতে এসে কিনলে। চারজন খাটবার লোক থাকলে কম্বল হয় দু-দিনে একটা। বোনার যন্ত্র সাত টাকা, চরকা সাত টাকা আর কাঁচির দাম পড়ে বাইশ থেকে পঁচিশ টাকার মত।

এ পাড়ায় মাঝবয়সীরা লেখাপড়া বড় একটা জানে না। কিন্তু সবাই প্রায় তাদেব ছেলেমেয়েদের ইস্কুলে দিয়েছে। এ পাড়ার একটি মেয়ে বছর আট-দশ আগে, আর একটি ছেলে বছব পাঁচ-ছয় আগে ম্যাট্রিক দিয়েছিল। পাশ করতে পাবে নি। পবীক্ষা দেবার বছব দুই পবে মেয়েটি মারা যায়।

শুনে সৌম্যেন বলল, 'জানেন, আমাদের বাড়িতে মেথরের কাজ করে যে নগেন জমাদার, নিজে নিজে বাড়িতে সে বাংলা লেখাপড়া শিখেছে। আর নগেনের বড় মেয়ে ভারতী পড়ছে হাইস্কুলে।'

নদীর ধাব দিয়ে ধাব দিযে অনেকখানি রাস্তা ভেঙে যখন আমরা আমবাগানে এলাম, তখন ছবি তোলার কাজ পুরোদমে চলেছে। ট্রলির ওপর ক্যামেরা বসানো। আমের ডালে দোলনা বাঁধা। রীণা তার ওপব বসে। শাড়ি পরে কী সুন্দর যে দেখাচ্ছে!

দুশো গজ দূরে দাঁড়ালেও সত্যজিৎকে চোখে না পড়ে পারে না। যা ঢ্যাঙা! তাছাড়া চোখেমুখে তখন তার অন্য ভাব। দেখে মনে হবে কিছুতে ভর করেছে। মাঝে মাঝে উঠছে আর পড়ছে একটা হাত

গোটা দলটা কেউ চালাচ্ছে, না আপনি চলছে বাইরে থেকে দেখে বোঝবার উপায় নেই।

দোলনায় মৃণ্ময়ী দুলছে। আস্তে। ডাঙার ওপরে ওপরে। তারপর জোরে। ডাঙা ছেড়ে আকাশ। পেছনে শুধু আকাশ।

চোখের ওপর এখনও যেন সব ভাসছে।

চায়ের বিরতি শেষ হতে না হতে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল। মাঝ-দরিয়ার নৌকোগুলো তরতরিয়ে ডাঙায় ভিড়ছে। পড়ে রইল চা। রায়ের ক্যামেরা তখন মেঘ ধরতে ব্যস্ত। মেঘের গায়ে চমকে চমকে উঠছে বিদ্যুৎ। যে যেখানে ছিল নদীর পাড়ে ভেঙে পড়েছে। অনেক দূরে আকাশের গায় কী যেন চিক চিক করছে। পেছন থেকে কে একজন চেঁচিয়ে উঠল : 'বৃষ্টি'!

তখন পালে বাঘ পড়াব মত এক দৃশ্য। যারা ছবি তোলা দেখবার জন্যে সকাল থেকে ভিড় করে দাঁড়িয়ে ছিল, গাছের পাতায় বৃষ্টির ফোঁটা পড়তেই হুড়মুড় হুড়মুড় ক'রে সব হাওয়া।

নদীর পাড়ে কিন্তু অন্য দৃশ্য। ক্যামেরা গুটিয়ে সকলের আগে যাদের পালাবার কথা, সেই গোটা দলটা দেখি আনন্দে নাচছে। সেপ্টেম্বর মাস। এমন পাগলের মত এসে মেঘ যে এমন লণ্ডভণ্ড বাধিয়ে দেবে কে ভেবেছিল! অথচ ওরা যে মনে মনে এতক্ষণ এটাই চাইছিল বুঝি নি। বৃষ্টিব বড় বড় ফোঁটাগুলো গায়ে যেন নখের আঁচড় দিচ্ছে। বিদ্যুৎ চমকানোর সঙ্গে সঙ্গে ডেকে উঠছে মেঘ। দমকা হাওয়ায় টলে টলে উঠছে গাছ। মাঝে মাঝে হাওয়া যখন দাঁড়িয়ে দম নিচ্ছে, ক্যামেরা চলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি।

একে নিরবচ্ছিন্ন ধারাবৃষ্টি, তার ওপর অনবরত জল লেগে লেগে চশমার কাঁচও ঝাপসা। হঠাৎ একটা রণধ্বনির মত শুনলাম। দীর্ঘ-কায় একটা লোক তীরবেগে সামনের দিকে ছুটে গেল। নদীর ধার বরাবর পায়ে চলা রাস্তা ধরে। সাংঘাতিক পিছল হয়ে আছে এঁটেল মাটি। দলের পেছনে পেছনে আমিও ছুটলাম। ছুটতে ছুটতে দুমদাম

করে একেকজন পড়ছি। রায় পড়ে যেতেই পূর্ণেন্দু ক্যামেরা তুলে নিয়ে ছুটল। পূর্ণেন্দু পড়ে যেতে সত্যজিৎ। সত্যজিৎকেও পড়তে হল।

বর্ষার সে ছবি পরে দেখেছি রবীন্দ্রনাথের ডকুমেণ্টারিতে। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। গলা বুঁজে এসেছিল দেখতে দেখতে। শুধু ভঙ্গি দিয়ে ভোলানো নয়, সৃষ্টির মধ্যে নিজেকে কিভাবে ঢেলে দিতে হয়—সত্যজিৎ রায়ের ছবি তোলা আর সত্যজিৎ রায়ের সেই তোলা ছবি দেখা, দুটো মিলিয়ে আমার কাছে স্পষ্ট হল।

পরদিন সকালে শুটিং নেই। শৈলেনবাবু এসে বললেন, 'চলুন' তাঁতীপাড়াটা ঘুরে আসি।' শৈলেনবাবুর আসল উদ্দেশ্য ছিল স্ত্রীর জন্যে শাড়ি কেনা, সেটা ফেরার সময় টের পেলাম।

তাঁতীপাড়ায় যেতে পথে পড়ল ঔরঙ্গাবাদের বাজার। বাজারটার খুব জাঁকজমক। রাত্তিরে গেলে দেখা যায় ফ্লুরেসেণ্ট আলোর বাহার। এ জায়গাটা ফুলে ফেঁপে উঠেছে দেশভাগের পর। রাতবিরেতে নদীতে মাল পারাপারের ব্যাবসা ছিল। আয়ুব খাঁর আমল থেকে সে কারবারে বড় রকমের ঘা পড়েছে বলে শোনা যায়। অনেকে ধরা পড়েছে, সীমান্ত পুলিশের গুলি খেয়েও অনেক মরেছে। নিমতিতায় সিনেমা বলতে এক ঔরঙ্গবাদে। দেয়ালে দেয়ালে হিন্দী ছবির রঙীন পোস্টার। ঘিঞ্জি গলির মধ্যেও গায়ে গায়ে দোকান। দু-পাশে বিড়ির বড় বড় ফ্যাক্টরী। একটা সাইনবোর্ড দেখে বেশ মজা লাগল। অমুকচন্দ্র অমুক! বড় বড় অক্ষরে নামের নীচে লেখা: শুধুমাত্র 'বিলেত-ফেরত'।

ঠক-ঠকাস। ঠক-ঠকাস। তাঁতীপাড়ায় যে এসে পড়েছি, আওয়াজ শুনেই তা মালুম হয়। ঔরঙ্গাবাদে তাঁত আছে শ-তিনেক। দেড়শো দুশো ঘর তাঁতী। এ ছাড়া আড়াইশো তিনশো তাঁত আছে মোমিনদের। আবার কোনো কোনো মহাজনেরও তাঁত আছে। সেসব তাঁতে যারা কাজ করে তারা তাঁতী হয়েও আসলে অবশ্য মজুর। তাঁত খুইয়ে দোকান করছে, চাকরি করছে, জমিতে খাটাখাটুনি করছে—তেমন লোকও এ পাড়ায় যথেষ্ট মিলবে।

হরেন দাসের দাওয়ায় বসে সব শুনছিলাম।

সুতো কিনতে হয় মহাজনদের কাছ থেকে। বত্রিশ আর চল্লিশ নম্বরের সুতোরই কাজ বেশী হয়। বত্রিশ নম্বর আর চল্লিশ নম্বরের সুতোর পাঁচ-সেরী বাণ্ডিল হরেদরে একই পড়ে। চাল পেষো, তাতে তুঁত মেশাও, জ্বাল দিয়ে আঠা করো—তাতেই তো গলে যাবে পাঁচ সিকে পয়সা। চল্লিশ নম্বরে ভাতের ফ্যান হলেই চলে যায়।

সুতো হলেই শুধু হল না। সুতো রং করিয়ে আনতে হবে রংগোলা থেকে। তারপর জলকাচা করে রঙীন সুতোয় আঠা মাখানো। ববিনে সুতো জড়ানো। তারপর বাগানে নিয়ে গিয়ে সুতো খুলে তানা দেওয়া। চার মোড় পাড় জুড়লে তবে পঁয়তাল্লিশ ইঞ্চি বহরের বারো জোড়া কাপড় হয় এক বাণ্ডিল সুতোয়। এক বাণ্ডিল সুতো জড়াতে লাগে আশিটা ববীন। বাগানে শানার রীডের ছুটো করে সুতো প্রতি খাঁজে পরানো হয়। তারপর সেই সুতো লরোদে জড়িয়ে বাগান থেকে বাড়িতে আনা। বাড়িতে এনে একজোড়া ব-র ভেতর দিয়ে গলিয়ে তাঁতে যখন লাগানো হল, একমাত্র তখনই বোনার কাজ শুরু হতে পারবে।

আকাশ যদি পরিষ্কার থাকে, তাহলে বাগানের কাজ আর ফিট করার কাজ মিলিয়ে তিন দিনেই হয়ে যায়। নইলে বর্ষার সময় কখনও এক সপ্তাহও লেগে যায়। দিনে কাপড় হয় গড়ে দেড়-দুখানা; খুব বেশী হলে তিনখানা। দশহাতি কাপড় মাসে বিশ জোড়ার বেশি হয় না। মাসে কমপক্ষে ছ-দিন বাগানে কাজ, বাইশ দিন তাঁতে। দৈনিক আট ঘণ্টা খাটুনি। মাসান্তে মজুরি গড়ে পঞ্চাশ টাকা। সাজসরঞ্জামের পেছনেও মাসে চার-পাঁচ টাকা খরচ হয়। সে সব খরচ তাঁতীকেই দিতে হয়। নতুন একটা তাঁত তৈরি করতে গড়পড়তা একশো টাকা খরচ।

নিজের তাঁতে যারা পরের মজুর এ হল তাদের কথা।

পুজোয় নবমী থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত তাঁত চালানো, সুতো কাপড়

কেনাবেচা একেবারে বন্ধ থাকবে। এখন তাই হাতে চালিয়ে কাজ হচ্ছে। একাদশীর দিন প্রত্যেকটি তাঁতে হবে তাঁতপুজো। সেদিন তাঁতের গায়ে তেলসিঁদুর দিয়ে পুরুত ডেকে বিশ্বকর্মা পুজোর মতো সকাল দশটার মধ্যে ষোড়শোপচারে পুজো হবে। দুপুরে ভাত খাবে না কেউ। নিরামিষ লুচি তরকারি খাবে।

তাঁতীপাড়া থেকে ফিরতে বেশ বেলা হয়ে গেল। হাটবার বলে সেদিন ভালো মাছ মিলেছিল। অনিলবাবু এমন ভাব করলেন যেন তাঁরই হাতযশ। আমি রোয়োভাট। আমি ওসব সাতেও নেই, পাঁচেও নেই। কিন্তু খাওয়ার পর তিন তাসে দেখলাম আমার কপাল রীণার মার ঠিক পরেই।

কাজেই বিকেলে ভারী ট্যাক নিয়ে গেলাম নিমতিতার হাটে। রায়-বাড়ির ঠিক পাশেই নিমতলা। হাট বসে হপ্তায় দুদিন। মঙ্গল-বার আর শুক্রবার। হাটে অন্য যা সব থাকার তা তো আছেই। কিন্তু সবচেয়ে যেটা বেশি করে চোখে পড়ল, তা হল প্রচুর সংখ্যায় দেশী ঘোড়া। সওদাপত্র ঘোড়ার পিঠে আসে, ঘোড়ার পিঠে যায়। আশপাশের জেলা থেকে ধানও আসে ঘোড়ায়। ঘোড়া রাখলে গরুর গাড়ির চেয়ে খরচ কম হয়। বলদ তো আর একজোড়ার কমে হবে না। একজোড়া বলদের দাম ফেলেছেড়ে তিনশো টাকা। গাড়ি বানাতে চাকা ছাড়াও বাঁশটাঁশ লাগবে। দুটো চাকার দামই তো পড়ে যাবে ষাট থেকে একশো টাকা। সব মিলিয়ে শ চারেক টাকার ধাক্কা। তাছাড়া গরুর খড় কিনতেই তো ফতুর হয়ে যেতে হয়। পাওয়াও শক্ত। সে তুলনায় ঘোড়ার দানাপানি যোগাড় করা ঢের ঢের সহজ। খরচও কম।

সন্ধ্যেবেলা রাধানাথবাবু নবদ্বীপ বিশ্বাসকে নিয়ে এলেন আমার সঙ্গে আলাপ করাতে।

নবদ্বীপ বিশ্বাস থাকেন নিমতিতার পশ্চিমে ক্রোশখানেক দূরে

ধুমুরীপাড়া কলোনিতে। কলোনিতে আছে পৌনে চারশো মাছ-ধরা পরিবার। তারা এসেছে পাবনা জেলার সদরের বেড়া থানার নানান অঞ্চল থেকে। যমুনা আর হোড়াসাগর বা বড়াল নদীর ধারেকাছে আগে এদের বাস ছিল। কলোনিতে বেশির ভাগ লোককেই ভিটেমাটি ছেড়ে চলে আসতে হয়েছিল শুধু হাতে। চার-পাঁচটার বেশি নৌকো বর্ডার পেরিয়ে আসতে পারে নি। যারা ট্রেণে করে এসেছে, তারা সঙ্গে জাল আনতে পাবে নি।

দেশে ছিল নবদ্বীপ বিশ্বাসের চার-চারটে নৌকো। দুটো ছিল সাতাশ-আটাশ হাত লম্বা, একটা বিশ হাত আর একটা হাত-চোদ্দ। আসবার সময় নবদ্বীপ বিশ্বাস শুধু বিশহাতি নৌকোটাই যা আনতে পেরেছিলেন। আর সেই নৌকোয় করে কিছু কোণা জাল। গ্রামের বাড়িতে তার আরও ছিল বিস্তর জাল: বাছাড়ি, ঘনবেড়, খেওলা, ভেসাল, মই জাল, বিরিণ্ডি, বাঁশগেড়ে, ছাদি, শাংলো—আরও অনেক। আর ছিল সেই জগৎবেড় জাল, যা ফেলতে লাগে একশো জন লোক; পাশ থেকে তিনখানা নৌকো লাগে তিরিশ-বত্রিশ হাত, তদ্বির করতে ডিঙি লাগে চার-পাঁচখানা আর মাছ সরবরাহ করতে আরও চার-পাঁচখানা ডিঙি। সবই ফেলে আসতে হয়েছিল।

এপারে এসে ব্যাবসা আর ঘর করবার লোনের টাকায় নবদ্বীপ একটা টুনিবেড় জাল করলেন। টুনিবেড় জালে লোক লাগে পঁচিশজন। তারপর হল টানাবেড় জাল; টানাবেড়ে লোক লাগে বত্রিশজন। তিন বছর ঐ জালেই চলল। তারপর নবদ্বীপ শুরু করলেন ডিম ধরা সাবাড়।

নবদ্বীপের হাতে যেই দশ হাজার টাকা জমল, অমনি তিনি জগৎবেড় জাল তৈরি করতে লেগে গেলেন। নিজের টাকা ছাড়াও আলকাতরা ইত্যাদি বাবদ ঔরঙ্গাবাদের মুদিখানার এক দোকানদারের কাছে হাজার দুই টাকা দেনা আর দুজন মহাজনের কাছে হাজার পনেরো টাকা চড়া সুদে ধার হল। জগৎবেড় জাল তৈরি করতে পনেরো

হাজার টাকা লাগল বটে, কিন্তু সেই এক বছরেই মাছ উঠল এক-লক্ষ বাইশ-হাজার টাকার। যেখানে যা ধারদেনা ছিল সব শোধ হয়ে গেল। লোকজনদের ছ-মাসের দেনাপাওনা মিটিয়ে হাতে নগদ-লাভ থাকল পাঁচ-ছ হাজার টাকা।

তার পরের বছর? পরের বছর নদীতে মাছই হল না।

অথচ জালের কাছি প্রত্যেক বছরই নতুন করে কিনতে হয়। কাছি বলতে সত্তব বাম লম্বা (দু-হাত ছড়ালে যতটা হয়, ততটাতে এক বাম) সাত ইঞ্চি মোটা পনেরোটা কাছি। একেকটা কাছির ওজন ছ হন্দর। বাষট্টি টাকা করে কাছির হন্দর। তাছাড়া তিরিশ-বত্রিশ টাকা মণের পাট লাগবে তিবিশ-চল্লিশ মণ; আর বারো-তেরো টাকা মণ দরের আলকাতরা একশো মণ। তাহলেই বুঝে দেখুন জগৎবেড় জাল পোষার কী খরচ! পরেব বছব মাছ না পেয়ে নবদ্বীপ বিশ্বাসকে শেষ অবধি হাজারে সাড়ে বত্রিশ টাকা সুদে নতুন ক'বে আবাব সাড়ে এগারো হাজাব টাকা ধার করতে হল।

পুঁজির অভাবে গত ক-বছব নদীতে জগৎবেড় জাল ফেলাই হয় নি। কিছু জমানো সোনা ছিল। বিশ-পঁচিশ ভবি চলে গেছে। তাছাড়া ইদানীং নদী ভাঙছেও খুব। কলোনিব দশ আনা অংশই এখন নদীর পেটে।

নবদ্বীপ বিশ্বাসের অধীনে কাজ করে কলোনির শতখানেক জেলে। তাদের সঙ্গে বন্দোবস্ত: তাবা যা মাছ ধববে, তা থেকে দাদন ইত্যাদির টাকা কেটে নিয়ে যা থাকবে সমান ভাগ হবে। যারা বেশী খাটুনি করে, তারা একটা করে 'মান্য' পায়। মালিক পায় খুব বেশি হলে পাঁচশো টাকা, ম্যানেজার দুশো-আড়াইশো, মুহুরি দেড়শো, মাঝি পঞ্চাশ। মোটা মোটা কাছি জলে যারা নামায় ওঠায় তাদের বলে 'শিশালদার'। তিন নৌকোয় শিশালদার থাকে ছ-জন। তারা প্রত্যেকে পায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ টাকা।

হঠাৎ নদীর দিক থেকে একটা সোবগোল ওঠায় ঘবের মধ্যে সকলেই

আমরা কথা বলতে বলতে থেমে গেলাম। একটা আর্ত চিৎকার। এক ছুটে আমরা সবাই পুবের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। সামনে যতদূর দেখা যায় নিকষ কালো অন্ধকার। আকাশে একটাও তারা নেই। আমরা নিশ্বাস বন্ধ করে শুনতে লাগলাম ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসা পরিষ্কার একটা আওয়াজ : 'বাঁ-চাও, বাঁচা-ও, বাঁ-চা-ও'!

মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপর চারিদিক জুড়ে একটা বুকচাপা স্তব্ধতা আমাদের সবাইকে যেন গ্রাস করে ফেলল।

নদীর অন্ধকার জলে কয়েকটা আলোর ফোঁটা ছুটে গিয়ে এক-জায়গায় হয়ে আবার আলাদা হয়ে হয়ে পিছিয়ে এলো। আমরা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখলাম।

পরে ভানুই খবর নিয়ে এল। নৌকো উল্টে গিয়ে সাত-আটজন ডুবন্ত লোক 'বাঁচাও, বাঁচাও' বলে স্রোতে ভেসে চলেছিল। কয়েকটা নৌকো এগিয়েও ছিল সাহায্যের জন্যে। স্রোতের টানে তারা ভেসে যাচ্ছিল পাকিস্তানের দিকে। এগিয়ে যেতে পারলে হয়ত তাদের বাঁচানোও যেত। কিন্তু পাকিস্তানী পুলিশের খপ্পরে পড়বার ভয়ে শেষ পর্যন্ত অনিচ্ছায় তাদের পিছিয়ে আসতে হয়েছে।

সেদিন অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম এল না। 'বাঁচাও, বাঁচাও' আওয়াজটা কানের কাছে নাছোড়বান্দা হয়ে লেগে রইল।

নিমতিতায় এখন সবচেয়ে ফলাও হয়ে উঠেছে বিড়ির ব্যাবসা। বছর তিরিশ আগেও গ্রামে হুঁকোতামাকেরই বেশী চল ছিল। শুধুমাত্র স্থানীয় প্রয়োজনে খুচরোভাবে কিছুটা বিড়ি বাঁধা হত। এখানে বিড়ির প্রথম কারখানা খোলে এম. বি. এম. কোং, বিশ্ববিজয় বিড়ি ফ্যাক্টরি। তখন থেকেই বিড়ি বাইরে রপ্তানি হতে থাকে। এখন তো ধুবড়ি, গঙ্গিয়া, ভাগলপুর, উত্তর বাংলা, কলকাতা থেকে বড় বড় লোক এসে এখানে কারখানা খুলেছে। এদিককার লোকের যার যেটুকু জমি ছিল নদীই সব ঘুচিয়ে দিয়েছে। কাজেই মজুরের কোনো

অভাব হয় নি। অন্যান্য জায়গার চেয়ে মজুরিও এখানে কম। ক্ষেতমজুরদের দেড় টাকা রোজ। কাজেই বিড়ি কারখানা এখানে খুলবে না তো খুলবে কোথায়! কলকাতার রাজাবাজার থেকে নাসিরুদ্দিন, খলিল মিঞারা এসে এখানে কারখানা খুলেছে। কেননা কলকাতায় বিড়ি বাঁধতে হাজারে মজুরি দিতে হয় দু টাকা সাড়ে দশ আনা, এখানে দেড় টাকা।

মৃণালিনী বিড়ি কোম্পানির কারখানাই এখানে সবচেয়ে বড়। খাস কোম্পানির অধীনেই কাজ করে দশ-বারো হাজার মজুর। তাছাড়া আছে মুন্সীদের অধীনে কাজ করা মজুর। সব মিলিয়ে মোট সংখ্যা পঁচিশ-তিরিশ হাজার হবে। মৃণালিনীর দৈনিক বিড়ি হয় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ লাখ। তার পরেই হয় মলয় বিড়ি ওয়ার্কস-এর। দৈনিক বারো-তেরো লাখ। এছাড়া আছে আসাম, নিউ আসাম, দিলীপ, বিশ্ববিজয়, এস. কে. খলিলুদ্দিন। সব ঘর মিলিয়ে এখান থেকে দৈনিক এক কোটি সওয়া কোটি বিড়ি বাইরে চালান যায়। পাঁচ টাকা করে হাজার হলে রোজ প্রায় পঞ্চাশ হাজার টাকার বিড়ি। তার জন্যে মজুরি দিতে হয় রোজ প্রায় হাজার পনেরো টাকা।

কোম্পানির মালিকরা নিজেদের কারখানায় সব বিড়ি তৈরি করে না। তাদের সাব-এজেন্টদের বলে মুন্সী। মালিকরা মুন্সীদের দেয় সুতো, তামাক আর বিড়ির পাতা।

সাধারণ হাজার বিড়িতে লাগে পাঁচ ছটাক তামাক। বড় বিড়িতে ছ ছটাক। বড় পাতার বড় বড় বাণ্ডিলে থাকে দু সের আড়াই সের পাতা। তাতে তিন হাজার বিড়ি হয়। দেড়-দু ছটাক ওজন হয় ছোট পাতার ছোট ছোট বাণ্ডিল। তাতে বিড়ি হয় একশো বিশ। একেকটা বড় পাতায় পাঁচ ছটা আর ছোট পাতায় গোটা দুই।

কোনো কোনো কোম্পানির মুন্সী হতে গেলে দুশো-আড়াইশো টাকা কোম্পানির কাছে জমা রাখতে হয়। সেই সঙ্গে এমনও চুক্তি থাকে যে, দৈনিক পঞ্চাশ হাজার বিড়ি বানিয়ে দিতে হবে। মুন্সীরা

মজুর খাটায় দু-ভাবে। আটচালায় লোক বসিয়ে কারখানা খুলে, কিংবা মজুরদের বাড়িতে বাড়িতে বিড়ির মশলা যুগিয়ে। কারখানায় যারা খাটে তারা পায় দেড় টাকা আর বাড়িতে বসে কাজ করলে পায় এক টাকা ছ আনা।

আগে মুন্সীদের ছিল পঞ্চাশ টাকা মাইনে। মজুরদের ছিল তিরিশ টাকা। তখন মুন্সীরা করত কি, কোম্পানির কাছ থেকে দাদন-পাওয়া তামাক আর পাতা মজুরদের কম করে দিয়ে বাড়তি তামাক আর পাতা চোরাবাজারে বেচে দিয়ে দেদার পয়সা করত। তাছাড়া সে-সময়ে ঔরঙ্গাবাদে ছিল চোরাচালানের বড় রকমের ব্যাবসা।

আর একটা ব্যাপারে মালিকদের সঙ্গে ষড় ছিল বলেই মুন্সীদের ওসব হাতটান মালিকরা দেখেও দেখত না। ব্যাপারটার নাম ছাঁটাই। মুন্সীদের যোগানো তামাক আর পাতা থেকে মজুররা যেসব বিড়ি তৈরি করে দিত, তার নানারকম খুঁত বার করে মুন্সীরা বেধড়ক বিড়ি ছাঁটাই করে দিত। এইসব বিড়ি বাবদ মজুররা কোনো পয়সা পেত না। সেই ছাঁটাই-করা বিড়ি মুন্সীদের কাছ থেকে নিয়ে বিড়ি কোম্পানি-গুলো বাজারে বেচত। এই বিড়ির জন্যে কোনোরকম মজুরি দিতে হত না বলে মালিকদের মোটা লাভ হত। দিনে যে মজুর দু-হাজার বিড়ি বাঁধত, দিনের শেষে মুন্সীরা তার পাচশো বিড়িই হয়তো বাতিল করে দিত। এ ব্যাপারে রেকর্ড করেছিল বেলাল মিঞার মুন্সী। হাজারের মধ্যে একেবারে সাতশো।

মুন্সীরা যাতে বেশি বেশি করে খুঁত ধরে বিড়ি ছাঁটাই করে, তার জন্যে মালিকদের দিক থেকে নানা রকমের লোভনীয় ব্যবস্থা থাকত। মুন্সীরা পেত রকমারি বখশিস—কেউ গ্রামোফোন, কেউ রেডিও, কেউ হাতঘড়ি।

কিন্তু বড় বেশী বাড়াবাড়ি হয়ে যাওয়ায় ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত কেঁচে গেল। মজুররা কোর্টকাছারি করায় সরকারের পক্ষেও আর চুপ করে থাকা সম্ভব হল না। ত্রিদলীয় সম্মেলনে বসে রফা হল এই যে,

মুন্সীরা এখন থেকে মাস-মাইনের বদলে কমিশনে কাজ করবে। আর ছাঁটাইয়ের ব্যাপারটাও আগের মত ও রকম ঢালাওভাবে হতে পারবে না। ছাঁটাই চলবে হাজারে দু-মুঠো—পাঁচিশটায় এক মুঠোর হিসেবে দু-মুঠোয় পঞ্চাশটা। এখন সেইভাবেই চলছে।

চুয়ান্ন-পঞ্চান্ন সাল অবধি বিড়ি কারখানায় আরও একটা মধ্যযুগীয় প্রথা ছিল। তার নাম ঈশ্বরবৃত্তি। এ প্রথাটা এসেছিল সটান সেকালের জমিদারদেব কাছ থেকে। মজুরি থেকে সপ্তাহে চার আনা কবে পয়সা কেটে বেখে দেওয়া হত ঠাকুর-দেবতার নামে। সে টাকাব কোনো হিসেব থাকত না। গোটাটাই যেত মালিকের পকেটে। শেষ পর্যন্ত সরকারী হস্তক্ষেপে এই বাজে আদায় বন্ধ হয়।

যে জুলুমগুলো নিমতিতায় বন্ধ হয়েছে তার অনেকগুলো নাকি এখনও ধুলিয়ানে চলছে। আসলে মজুবেব ঘবে সিঁদকাঠি দেওয়াটা বন্ধ হয় নি। বন্ধ হবাবও নয়। যেটা ঠেকানো গেছে সেটা দিনে-ডাকাতি।

বিকেলেব দিকে গ্রামেব ভেতবটা খানিকক্ষণ ঘুবলাম। গ্রামে এমন বাড়ি খুবই কম যেখানে বিড়ি বাঁধা হয় না। পাড়ার মধ্যে অনেক ঘুবেও কানে কোনো গ্রাম্য সুব ভেসে এল না। বিড়ি বাঁধতে বাঁধতে কেউ কেউ গাইছে হিন্দী সিনেমাব গানেব কলি।

পৌষ মাসে নাকি এসব দিকে এখনও কী একটা গান হয়। শাগবোল, না সাঁঝবোল। ছেলেবা দল বেঁধে বেরোয় সন্ধ্যেবেলায়। শাগবোল গেয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে চাল-পয়সা চাঁদা তুলে বেড়ায়। তারপর সংক্রান্তি নাগাদ সেই চাঁদায় চড়ুইভাতি করে।

আর এক আছে আলকাপ। সামাজিক প্রহসন ধরনের এক রকমের যাত্রা। স্থানীয় ভাষায় লেখা। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত লোকেরাই এসব জিনিস লেখে। বেশী দেখা যায় মেলায় আর নীচু সমাজে।

এ গ্রামে গত বিশ বছর ধরে উচ্চশিক্ষার দিকে সাধারণ মানুষের একটা ঝোঁক দেখা যাচ্ছে। নাপিত, রাজবংশী, মাহিষ্য পরিবারে

গ্র্যাজুয়েট আছে। মাঝারি চাষীর মেয়ে আছে স্কুল ফাইনাল পাশ। নাপিতদের এক ছেলে ম্যাট্রিক পাশ করে সেট্‌ল্‌মেণ্ট অফিসে কাজ করছে। পড়াশুনো করেছে সে বিড়ি বেঁধে।

স্কুলে-পড়া অনেক ছেলেমেয়েকেই বাড়িতে বসে বিড়ি বাঁধতে হয়। শুধু পড়াব খরচ যোগাবার জন্যে নয়, সংসারের সাশ্রয়ের জন্যে।

বাড়ির মেয়েদের কথা তো ওঠেই না। বিড়িমজুরদের তিন ভাগেব এক ভাগই মেয়ে। শুধু বাড়ির মা-বউরা নয়, মেয়েরাও ছোট থেকে বিড়ি বাঁধে।

এ গ্রামের মেয়েবা চাষী পরিবার হয়ে থাকার সময় আগে কখনও যা পায় নি, আজ বিড়ি বাঁধাব কাজ ক'রে তা পাচ্ছে।

বাড়িতে এই প্রথম তারা পাচ্ছে মর্যাদা। বিড়ি বেঁধে তারা পায় পুরুষের সমান মজুরি। বিড়ি বাঁধার কাজ জানে বলে বিয়ের বাজারে এ-গাঁয়ের মেয়েদের খুব আদর। এদিকে বাপ-মারাও রোজগেরে মেয়েদের হাতছাড়া করতে চায় না। এমনও নাকি হয়েছে যে, বিয়ের পর মেয়ে বাপের বাড়ি এলে তাকে নানা অছিলায় আটকে রাখা হয়েছে—শ্বশুরের ঘরে পাঠানো হয় নি। অবশ্য পুরোটাই যে মেয়ের অমতে তা নয়। তার কারণ, বিড়িবাঁধা মেয়েরা একেবাবে অজ পাড়াগাঁয়ে গিয়ে চাষী ঘরের বউ হয়ে নিজেদের পুরোপুরি খাপ খাওয়াতে পারে না। এখানে যাহোক হাতে দুটো কাঁচা পয়সা থাকে। শখ-শৌখিনতা করবার ইচ্ছে হলে ভিখিরির মত কারো কাছে হাত পাততে হয় না। শ্বশুরবাড়িতে সে স্বাধীনতাটুকু কে দেবে?

মোট কথা, নিমতিতার গ্রামে গ্রামে বিড়িবাঁধা পরিবারগুলোতে মজার মজার ব্যাপার ঘটতে শুরু করেছে। পুরনো সংস্কারের বাঁধনগুলো এখনও বজ্র আঁটুনি, না ফস্কা গেরো—জোর করে কিছু বলা শক্ত হচ্ছে।

এ গাঁয়ের বিয়ে-হওয়া মেয়েরা সেই ছড়াটা জানে কিনা জিজ্ঞেস করতে ভুলে গেলাম। সেই যে সেই ছড়াটা—

ওপারেতে কালো রং
বৃষ্টি পড়ে ঝম ঝম
এপারেতে লঙ্কাগাছটি রাঙা টুকটুক করে—
গুণবতী ভাই আমার মন কেমন করে।
এ মাসটা থাক দিদি কাঁদিয়ে ককিয়ে
ও মাসেতে নিয়ে যাব পাল্কি সাজিয়ে।
হাড় হল ভাজা মাস হল দড়ি
আয় রে নদীর জল ঝাঁপ দিয়ে পড়ি।

এদিকের অঞ্চলগুলোতে জমিদাররা এখন সেই হিতোপদেশের নখদন্তহীন বাঘ। বেনামীতে আর কত জমিই বা খাস করে রাখা যায়! বনেদী হিংস্রতার মধ্যে একটা পালিশ ছিল। নতুন বড়লোক-দের সেই পালিশটা নেই। পালিশটা আনতে তাদের সময় লাগবে। ঈশ্বরবৃত্তি উঠে যাওয়ার ব্যাপারটাই ধরুন না কেন। অমন দাঁতখিঁচুনো গাঁক-গাঁক ভাব চলবে না। ফোঁটাতিলকে স্বভাব আস্তে আস্তে মিছরির ছুরি হবে।

নতুন যারা বড়লোক হয়েছে, তারা সকলেই বিড়ির পয়সায় বড়লোক। চাষ-আবাদ করে নয়। তার মধ্যে সবচেয়ে বেশী নামডাক দু-জনের। একজনের বাড়ি ছাবঘাটি গ্রামে, অন্য আরেকজনের বাড়ি ধুলিয়ানে। দু-জনেই পয়সা করেছে গত পঁচিশ বছরের মধ্যে। এদের প্রত্যেকেই নাকি এখন কোটিপতি। ব্যাবসাতে একেকজনের বিশ-তিরিশ লাখ টাকা খাটছে।

যিনি ছাবঘাটির, তাঁর বয়স ষাট। তাঁর দাদা নাকি হাটবাজারে দা-কাটা তামাক বিক্রি করতেন। দাদা ছিলেন নিরক্ষর, ভাইয়ের কিন্তু সামান্য বাংলা অক্ষর জ্ঞান আছে। মেয়েদের লেখাপড়া না শেখালেও ছেলেদের ইনি ইস্কুল-কলেজে পড়িয়েছেন। বড় ছেলে বিয়ে করেছে নিজে দেখে।

কলকাতায় অফিস এলাকায় বাড়ি আছে। ভাড়া খাটে। এখানকার বাড়িতে ইলেকট্রিক আছে, রেডিও আছে। বইপত্র কিনে এমন কি ঘর সাজিয়ে রাখাবও অভ্যেস যে নেই সেকথা সবাই জানে। ফুলেব বাগান-টাগান? সে-সবও নাকি নেই। ফিল্মে একবার টাকা লাগিয়েছিলেন। তারপর আর বেলতলা-মুখো হন নি। বিড়ি ছাড়া আব কোনো ব্যাবসাও বিশেষ নেই। গ্রামের শিক্ষিত লোকদের টানারও কখনও কোনো ব্যবস্থা করেন নি। অভ্যেসটভ্যেস নাকি সব রকমেবই আছে। দানধ্যান বলতে নিজের গ্রামে একটা ইস্কুল আর মাতৃমঙ্গল কেন্দ্র।

ধুলিয়ানের যিনি টাকাব কুমির, তিনি আগে ছিলেন রাজমিস্ত্রি। নিজের বিড়ির প্রচারকৌশলেব দিক দিয়ে কিন্তু তিনি সবাইকে টেক্কা দিয়েছেন। তাঁর নিজের প্রোজেক্টর আছে। নিজের বিড়ির বিজ্ঞাপনেব ছবি তুলে লাইনে লাইনে তিনি দেখিয়ে বেড়ান।

মালিকদের টাকাব পাহাড় তুলতে গিয়ে মজুবদেব ফুসফুসগুলো ঝাঁঝবা হয়ে যাচ্ছে যক্ষ্মায়। হাড়ভাঙা খাটুনি, দিবাবাত্রি বসে বসে কাজ, তামাকের ধুলো, পুষ্টিকব খাবাবেব অভাব—সব মিলিয়েই বোধহয় এমন হচ্ছে। শিগগিবই একটা চেস্ট ক্লিনিক খোলা হবে। জায়গা নেওয়া হযেছে স্টেশনেব পেছনে। টাকা উঠেছে হাজার চোদ্দ-পনেরো।

তাব ইতিহাস আছে।

একবাব মজুরদের তরফ থেকে এই বলে মামলা দায়ের করা হয়েছিল যে, সবকারী ব্যবস্থামতে ন্যূনতম মজুরি তাদের দেওয়া হচ্ছে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত একটা আপস হল। মিটমাট হল এই শর্তে যে, মালিকরা নিজেরা টাকা তুলে মজুরদের জন্যে একটা চেস্ট ক্লিনিক খুলে দেবে। সেই টাকাতেই ক্লিনিক হচ্ছে।

এক হাতে ফুসফুসে ঘা করা, অন্য হাতে সেই ঘায়ে মলম দেওয়া। শুনে খুব হাসি পেল। তামাসাটা মন্দ নয়।

সন্ধ্যের পর পুবের বারান্দায় গোল হয়ে বসে ঘরোয়া খেলা হচ্ছিল। সত্যজিৎ এত খেলাও জানে। বুদ্ধির খেলা বলে প্রত্যেকটাতেই আমি হেরে যাচ্ছিলাম।

হঠাৎ বংশী আকাশের দিকে তাকিয়ে আশ্চর্য-হওয়া গলায় বলে উঠল, 'দেখুন, দেখুন—কী ওটা?'

রেলিঙে ভিড় করে আমরা সবাই বংশীর আঙুলের নিশানা লক্ষ্য করে তাকালাম। জ্বলজ্বলে একটা তারা। কিন্তু দাঁড়িয়ে নেই। যেন হন্ হন্ করে হেঁটে আসছে। কে যেন পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠল: 'স্পুৎনিক! স্পুৎনিক!'

আর কোনো কথা নয়। আমরা সব হুড়মুড় করে ছুটলাম ছাদে। গোটা আকাশটা পাড়ি দিয়ে চোখের আড়াল হওয়ার পরও অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

আশ্চর্য! কলকাতায় কতবার দেখবার চেষ্টা করেছি। ঘড়ি ধরে দাঁড়িয়েছি রাস্তায়। কখনও দেখতে পাই নি। সেই স্পুৎনিক শেষে দেখলাম নিমতিতার আকাশে। একেই বলে কপাল।

নিমতিতাকে মনে থাকবে। নিমতিতা। তেতো কে বলল? মিষ্টি।



ডাকবাংলার ডায়েরী

ক্যাকটাসের ফুল

বাসে যাচ্ছি দুর্গাপুর থেকে বাঁকুড়া। সেখান থেকে যাব কংসাবতীর বাঁধ।

আগের বারও গিয়েছিলাম বাসে। তবে দুর্গাপুর থেকে নয়। পুরুলিয়া থেকে। পুরুলিয়া-কলকাতা নরম গদি-আঁটা বাসে। বাংলা ছাড়িয়ে বিহার, বিহার ছাড়িয়ে বাংলা। দৃশ্যপট কেবলি বদ্‌লে বদ্‌লে যাচ্ছিল। ছোট ছোট পাহাড় আর টিলা। ছোট-বড় অজস্র গঞ্জ। ঘোড়ার পিঠে সওদা চলেছে হাটে। ভুট্টার জমি। গমের ক্ষেত। বাঁদিকে পাঞ্চেতে যাবার চৌরাস্তা।

বাংলা দেশে পা দিয়েও মনেই হয় না বাংলা দেশ।

আসলে আমাদের প্রত্যেকের মনেই বাংলাদেশের একটা ক'রে ছবি আছে। আমরা যদি প্রত্যেকে এঁকে দেখাই, কারো ছবির সঙ্গে কারো ছবি মিলবে না। যদি কোনো মিল পাওয়াও যায়, তার মূলে যতটা না বাংলাদেশ—তার চেয়ে বেশী রেলের লাইন। ট্রেনে ক'রে আসতে যেতে দেখা বাংলাদেশ। ছোট বড় ডোবা। আম কাঁঠালের বাগান। খড়ে-ছাওয়া মাটির ঘর। ঘুঁটে-লাগানো দেয়াল। ঋতু-ভেদে আকাশ আর মাঠের রকমারি রূপ। কোথাও গরু চরাচ্ছে

রাখাল। কোথাও পাঠশালায় ছেলেরা পড়ছে। টেলিগ্রাফের তারে বসে আছে ল্যাজ-ঝোলা পাখি।

সেই সঙ্গে কিছু কিছু একালের চিহ্ন। যাত্রী নিয়ে চলেছে বাস বা টেম্পো। ধানের ক্ষেতে অনধিকার প্রবেশ ক'রে যেন রাস্তা হারিয়ে ফেলে দাঁড়িয়ে আছে ডি-ভি-সি'র বিদ্যুৎবাহী পোস্ট। দেবদারু-পাতা-দিয়ে-সাজানো গেটের গায়ে ঝোলানো লাউড-স্পীকারের চোঙা।

পূর্ব বাংলার কথা ধরছিই না। যাকে আজ আমরা পশ্চিম বাংলা বলি, তার চেহারাও একেক জায়গায় একেক রকম। রেললাইন ছেড়ে একটু ভেতরে ঢুকলেই তা নজরে পড়ে।

কোথাও গাছ-আগাছায় আদিগন্ত সবুজ হয়ে আছে মাটি। কোথাও ধূ ধূ করছে খোয়াই আর মধ্যে মধ্যে তালডাঙা। কোথাও গাঁয়ের ভেতর দিয়ে ঝিরঝিরিয়ে বয়ে চলেছে পাহাড়ী ঝোরা। কোথাও ঘরবাড়ি আগলে উঁচু উঁচু বাঁধের রাস্তা। কোথাও আলে আলে বন্দী কাতারে কাতারে মাঠ। কোথাও চোখ-ধাঁধানো বন। কোথাও বাঁশঝাড়, দো-আঁশ মাটি, শীত-বসন্তে হলুদ খড়। কোথাও বিরল-বসতি বারিন্দের ধানকাটা মাঠের শুকনো ঢাল। কোথাও পলি-পড়া দিয়ারা। কোথাও দোতলা মাটির বাড়ি; দুর্গের মত দেয়াল। কোথাও লোকালয় বলতে তেপান্তরের মাঠের মধ্যে টিম টিম করছে গ্রাম নয়—দু-পাঁচ ঘর লোকের ছোট ছোট টাড়ি। গায়ের রং, মাটির রং, জলের রং! স্থানকাল পাত্রভেদে রঙেরও কত তফাত। এ-মুড়োয় যদি সমতটে দাঁড়িয়ে দেখি দিগন্তে বিলীয়মান জাহাজের মাস্তুল, তাহলে ও-মুড়োয় নদীর চরে দাঁড়িয়ে দেখব সোনার মুকুট মাথায় দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে গিরিরাজ হিমালয়।

তার আগেও একবার বাকুড়ায় এসেছিলাম। এক্তেশ্বরের মেলা দেখতে। সে প্রায় বছর আট-দশ আগে। আমি আর আমার

এক বন্ধু। ট্রেনে ছিল ঠাসাঠাসি ভিড়। আমরা যখন স্টেশনে নামলাম তখনও রাত ফরসা হয় নি।

ট্রেন ছেড়ে যাবার দৃশ্যটা এখনও মনে আছে। ট্রেন চলতে আরম্ভ করেছে। আমরা প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে। জানলার ধারে ব'সে যে ভদ্রমহিলা এতক্ষণ আমাদের সঙ্গে কথা বলছিলেন, তাঁর গলাটা কেঁপে উঠল। আমরা হাত নাড়তে লাগলাম। ভদ্রমহিলা মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে চোখে আঁচল চাপা দিলেন।

আমরা দুজনে খানিকক্ষণ কোনো কথা বলতে পারলাম না।

মাত্র তিন-চার ঘণ্টার আলাপ। তা-ও আলাপের সূত্রপাত হয়েছিল তিক্ততা দিয়ে। কলকাতা থেকে আমরা যাচ্ছিলাম। ঠায় দাঁড়িয়ে। ভদ্রমহিলা প্রায় পুরো বেঞ্চিটা জুড়ে আরামে ঘুমোচ্ছিলেন। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে পা এত ধরে গিয়েছিল যে, মাঝরাত্তিরে আর তাঁকে না উঠিয়ে পারা গেল না। ভদ্রমহিলা গজ গজ করতে করতে উঠে বসলেন। আমরাও ছাড়বার পাত্র নই। দুজনের বসবার জায়গাটা ঠিক আদায় ক'রে নিলাম।

এসব ক্ষেত্রে যা হয়। 'কত দূর যাবেন' দিয়ে শুরু। তারপর কি ক'রে আলাপ জমে গেল আমরা নিজেরাই জানি না। সঙ্গে টিফিন বাক্সে কিছু খাবার ছিল, আমাদের খাওয়ালেন। খাওয়াদাওয়া গল্পগুজব করা ছাড়া তখন আর করবারও কিছু ছিল না। কেননা আমরা প্রত্যেকেই যেটুকু জায়গা পেয়েছিলাম, তাতে একটু আরাম করে ব'সে দুচোখের পাতা এক করা যায় না।

আমরা কে কী বলেছিলাম, কিছুই এখন আর মনে নেই। শুধু এইটুকু মনে আছে : মফস্বল ইস্কুলের এক বদরাগী আইবুড়ো মাস্টারনী রুক্ষতার আবরণ এক টানে খসিয়ে ফেলে এক নিঃশ্বাসে বলে গিয়েছিলেন তাঁর জীবনের কথা। চিররুগ্না মাকে নিয়ে নিজের ছোট সংসার। মার বয়েস হয়েছে, তার ওপর একটা পা নেই। নাওয়ানো খাওয়ানো সমস্তই মেয়েকে করতে হয়। দাদারা সকলেই প্রতিষ্ঠিত। বৌদিরাও

ভাল। মাকে ওঁরা নিয়ে যেতে চান। কিন্তু মেয়েকে ছেড়ে মা নড়বেন না। কী জ্বালা বলুন তো! বড়দার মেয়ে গেল বছর বি-এ পাশ করেছে। আজ ছিল ওর পাকা-দেখা। ও লিখেছিল—পিসি, তোমাকে কিন্তু আসতেই হবে।

কাল এসেছিলাম; আজই ফিরে যাচ্ছি। মাকে একা ফেলে কোথাও কি যাবার জো আছে?

গলার স্বরের মধ্যে একটা দলা-পাকানো শূন্যতা।

চোখ বুঁজলে আজও সেই ট্রেনটাকে আস্তে আস্তে সিগন্যাল পোস্ট ছাড়িয়ে ক্লান্তিকর একঘেয়ে হরফের অন্ধকারে মিলিয়ে যেতে দেখি।

বাঁকুড়ায় এবার গিয়েছিলাম অন্য রাস্তায়। দুর্গাপুর থেকে বাসে। রোদ্দুরে মাটিতে পা পাতা যাচ্ছিল না। দুর্গাপুর এখন আর সে দুর্গাপুর নেই। প্ল্যাটফর্ম থেকে নেমে দেখি টাউন বাস, স্টেশন ওয়াগন আর ট্যাক্সির যেন হরির লুট। সরকারী তকমা-আঁটা রকম-বেরকমের সব ঢাউস গাড়ি।

ডানদিকে খানিকটা তফাতে তখন ছিল মফস্বলের বাসের আড্ডা। জায়গাটাতে একটা গেঁয়োভাব মাখানো। কয়েকটা অস্থায়ী আস্তানার মধ্যে চায়ের দোকান। থিক্ থিক্ করছে ধুলো। ভন্ ভন্ করছে মাছি। ঐ চা-ই গিলতে হল।

বাসের মধ্যে একপাল বরযাত্রী। বর বসেছে আমার ডানপাশে। বয়েস চল্লিশের ধারে-কাছে। নাকের নীচে গোঁফের গায় লেগে আছে রাজ্যের বিরক্তি। বরযাত্রীদের বেশীর ভাগই অফিসের বন্ধু। মাঝে মাঝে তাদের রসিকতা মাত্রা ছাড়িয়ে যাচ্ছে। জিজ্ঞেস করছে, বুকে কলপ লাগাবার কথাটা মনে ছিল কিনা। এ সময় ও সব রসিকতা কার ভাল লাগে? তাই থেকে থেকে কোলবরটিকে খামাখা ধমকাচ্ছে। কোলের ওপর যেন গুপ্তধনের মত অ্যাটাচিকেসটা দুহাত দিয়ে আঁকড়ে ধরা।

রেললাইন পেরিয়ে ব্যারেজ। তারপর ব্রিজ পেরিয়ে একছুটে বড়জোড়া। যেতে যেতে জানলা দিয়ে দেখলাম গ্রামের রাস্তায় দুলে দুলে চলেছে পাল্কি। এখন লগন্‌সার সময়।

রাস্তার পাশ বরাবর রং বদলাচ্ছে মাটি। লাল কাঁকর। পাটল রঙের ফোঁপরা পাথর। বন্ধ্যা মাটি। মাঝে মাঝে তালডাঙা। দুপাশে আগাছার জঙ্গল পেরিয়ে চাষের ক্ষেত।

থেকে থেকে হুস হুস ক'রে পেরিয়ে যাচ্ছি মাইল-স্টোন।

চাষীদের গ্রাম। চায়ের দোকানের সামনে এই গরমে আকণ্ঠ রঙচঙে পোশাক চড়িয়ে হাঁসফাঁস করছে চারটি লোকের ব্যাণ্ড বাজানোর একটি দল। তারপর আবার জঙ্গল। শালমহুয়ার ঘন বন। তারপর বহড়াখুল্যা গ্রাম। সরকারী জঙ্গল। কাঠ কাটা বারণ। তাই গ্রামে কয়লার দোকান। গ্রাম পেরিয়ে আবার জঙ্গল। বাঁদিকে চলে গেল গদারডিহি।

আবার খানিকটা ঘন জঙ্গল। রাস্তার ধারে ধারে আম জাম লিচু। জঙ্গল শেষ হলে শুকনো শালী নদী। নদী পেরিয়ে ইটখোলা। মাইল-স্টোনে চোখ পড়ল। এখনও চোদ্দ মাইল রাস্তা।

রোদের ঝাঁঝ ক্রমশ পড়ে আসছে। দুদিকে চাষের ক্ষেত। সর্ষে আর কলাই। রাস্তার ধারে ধারে লতাঝোপ। বড় বড় ফণিমনসা।

সম্পন্ন বড় গ্রাম বেলেতোড়। নামকরা ডালের মিষ্টি মনোহরা। বাঁশবনে শেয়াল রাজার মত ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকট্রিসিটি বোর্ডের জমকালো সাব-স্টেশন। ধানকলের শানবাঁধানো চত্বরে ঠা-ঠা রোদ্দুরে ধান শুকোতে দিচ্ছে মেয়েরা। বাঁদিকে পেট্রোল পাম্প। মাথার ওপর মাইক্রোফোন লাগিয়ে ফিল্মী গান বাজাতে বাজাতে উল্টোদিক থেকে এল একটা রিজার্ভ-করা বাস। ভাল ক'রে ঠাহর করা গেল না। নিশ্চয় বিয়ের পার্টি।

আঁকাবাঁকা রাস্তা ঘুরে বনগ্রাম। পর পর অনেক-গুলো ইটের দালানকোঠা। খানিকটা জায়গা ছেড়ে বাঁ হাতে আবার

শালসেগুনের জঙ্গল। জঙ্গল আর রাস্তার মাঝখানে ফালি ফালি চাষের জমি। বেশির ভাগই পাথুরে ডাঙা।

নাম-না-জানা গ্রাম পেরিয়ে জঙ্গল কাছে সরে এল। দুদিকে এবার ছোট ছোট আগাছার বন। ঢেউ-খেলানো উঁচু-নীচু মাঠ। তালডাঙা আর নিঃসবুজ খোয়াই পেরিয়ে মধ্যে মধ্যে চিক্ চিক্ করছে সবুজ রবিখন্দ। লোকালয়ের গায়ে হঠাৎ হঠাৎ একটা দুটো কবর।

রাস্তার একধারে কাত হয়ে আছে বিগড়ে-যাওয়া ট্রাক। বাম্পারে নাগরা-পরা পা তুলে ঢাকনা-খোলা ইঞ্জিনটার মধ্যে ঠুকুস ঠুকুস করছে মাঝবয়সী শিখ ড্রাইভার। ধারে কাছে জনপ্রাণী নেই।

গ্রামে ঢুকবার ঠিক মুখটাতে এক গাড়োয়ান তার বলদ দুটোকে জোয়াল খুলে খাওয়াচ্ছে। ছইয়ের নীচে পুঁটলি পাকিয়ে কাঁটা হয়ে বসে আছে লাল চেলীপরা বাচ্চা বউ। তার ঠিক পায়ের কাছে পুরনো হয়ে যাওয়া একটা পুরুষালী পোর্টফোলিও ব্যাগ।

মাটির রং আর লাল নয়। ফিকে। গঞ্জ মত গ্রাম। খড়ো চালা। চা আর পান-সিগারেটের দোকান। জাল দেওয়া বাক্সের মুখে সারি সারি বিড়ির বাণ্ডিল। তাকে-রাখা চারমিনার পাসিংশো কাঁচি। লাইনবন্দী নম্বর টেনের খালি প্যাকেট।

তারপর আবার গেরুয়া মাটি। চষা ভুঁই। তাল খেজুর। বাঁকুড়া ঘনিয়ে এল। উঁচু উঁচু আলবাঁধা জমি। গ্রামের ধারে আমবাগান। হ্যাণ্ডেলে মুখ-বন্ধ পাত্র ঝুলিয়ে গ্রাম থেকে সাইকেলে দুধের যোগান নিয়ে ফিরছে শহরের একদল দেহাতী গোয়ালা।

বাস এসে গেল শহরের ডেরায়। বাজারের দিকটা যেমন ঘিঞ্জি, তেমনি নোংরা। বিড়ির পাতা আর শুখা তামাকের বড় বড় আড়ত। বড় বড় ব্যাবসার অনেকগুলোই অবাঙালীদের হাতে।

শহরের অরেকটা দিক খোলামেলা। সেখানে সব সরকারী সাহেব-সুবোর বাংলো বাড়ি।

ইস্কুল-কলেজ-হাসপাতাল আর গির্জা। যে ক'বার এসেছি, কোনো বারই বাঁকুড়া শহরে বেশিদিন থাকি নি। বছর তিনেক আগে যেবার এসেছিলাম, সেবার গিয়েছিলাম রাষ্ট্রীয় বীজ উৎপাদন ক্ষেত্র দেখতে। চলতি কথায় লোকে বলে সরকারী সীড ফার্ম।

শহর ছাড়িয়ে অনেকখানি দূরে। যেদিকে শুশুনিয়া পাহাড়। পথে পড়েছিল কালজিরা গ্রাম। এ গ্রামের পঞ্চানন কুণ্ডু নামকরা চাষী। তাঁর প্রধান হল ভিটামিনের চাষ। ভিটামিন বলতে তরিতরকারি। ঘুরে ঘুরে দেখালেন কিভাবে নতুন নতুন কায়দায় তিনি চাষের ফলন বাড়াচ্ছেন। ক্ষেতমজুরদের মজুরি দেন চার সের ধান কিংবা দু সের চাল আর তিন সের মুড়ি। মাহিন্দাররা পায় ভাত, মুড়ি, বছর খোরাকী ধান আর কাপড়।

উত্তরে শুশুনিয়া পাহাড়। তার কোলে সীড ফার্মের বাড়িটা অনেক দূর থেকে চোখে পড়ে। ফার্মের জমি আছে হাজার বিঘের ওপর। সরকারী ফার্ম হয়েছে হালে। গোড়ায় এটা ছিল কাশ্মীরের দেওয়ান নীলাম্বর মুখুয্যের জমিদারি। তারপর এর মালিক হন এক ডাক্তার। তিনি এখানে দোতলা বাড়ি করেন, চাষের খামার করেন। জমিদারি উচ্ছেদের পর তাঁর ওয়ারিশরা এটা সরকারের হাতে তুলে দেন। সরকারী ফার্মও খুব বেশিদিন হয় নি।

ম্যানেজার, এগ্রিকালচারাল ওভারসিয়ার, এগ্রিকালচারাল ডিমনস্ট্রেটর, ফার্ম মেকানিক, ক্লার্ক, স্টোর কীপার, দারোয়ান, পিওন, ক্যাট্‌ল্ কীপার—এই নিয়ে এখানকার স্টাফ।

তাছাড়া পঞ্চাশজনের মত লোক এই ফার্মে বারো মাস জনমজুরির কাজ পায়। চাষের সময় জুন, জুলাই, অগস্ট। এই মরশুমে কাজ পায় আড়াইশো থেকে তিনশো লোক। মেয়েরা ধান কেটে পায় এক টাকা বারো আনা রোজ। পুরুষরা হাল দিয়ে রোজ পায় এক টাকা চোদ্দ আনা। ছেলেছোকরাদের রোজ পনের আনা। মুনিষদের এক টাকা দশ আনা আর কামিনদের দেড় টাকা। ফার্মে বলদ আছে ঊনষাটটা।

চাষ বলতে প্রধানত ধান। পুকুর, পুকুরের পাড়, রাস্তাঘাট বাদ দিয়ে যে জমি তার সবটাতে চাষ হয় না। কিছু জমি আছে আবাদের অযোগ্য। আর বেশ খানিকটা অনাবাদী পতিত পড়ে আছে।

এসব অঞ্চলে জমির ভালমন্দ হিসেবে জমির স্তর আলাদা আলাদা। সেরা জমি হল 'শোল' বা 'সোনা'। হাজার থেকে দেড় হাজার টাকা বিঘে। মাঝারি ভাল হল 'কানালী'। আটশো টাকা বিঘে। যদি জলসেচের ব্যবস্থা থাকে, তাহলে 'বাদ' জমিও ভাল। এ জমির দাম বিঘে ভুঁই পাঁচশো থেকে ছশো। একেবারে সবচেয়ে ওঁছা জমি হল 'ডাঙা' জমি।

সীড ফার্মে প্রধানত হয় ধান। যেবার ভাল জল হয়, আমনের চাষ বাড়ে। আগের বার আমন হয়েছিল বিঘে প্রতি ঊর্ধ্বে তেরো মণ। এবারে আশা করা যাচ্ছে পনেরো মণ হবে। ডাঙা জমিতে হয় আউশ। বিঘেয় আট মণ। আউশ আমনের মোট বীজধান বিলি হয়েছে সেবার দু হাজার মণেরও বেশি। ধান ছাড়াও সীড ফার্মে চাষ হয় পাট, গম, সর্ষে, ভুট্টা, চীনেবাদাম, কাজুবাদাম আর ধঞ্চে। ধঞ্চে দিয়ে জমির সার হয়।

সে বছর চাষবাস থেকে ফার্ম লাভ করেছিল তেত্রিশ হাজার টাকারও বেশি।

পরের দিন গিয়েছিলাম বিষ্ণুপুরের রাস্তায়।

বিষ্ণুপুর একাধিকবার আমার দেখা। শুধু নতুন মিউজিয়ামটাই আমার দেখা হয় নি। সত্যি বলতে কি, পুরনো স্মৃতির চেয়ে নতুন জিনিসই আমাকে বেশি ক'রে টানে। কী ছিল-র চেয়ে—কী হচ্ছে, কী হবে।

বিষ্ণুপুর বললেই দুটো মুখ আমার মনে পড়ে।

একজনকে দেখেছিলাম বছর কুড়ি আগে। লড়াইয়ের মরশুমে। গোরা পল্টনদের হাত ঘুরে সে এসে উঠেছিল শালবনীর কাছে এক

গ্রামে। পুজোর দালানের দাওয়ায় আলতাপরা পা ঝুলিয়ে ব'সে বুড়ো পত্তনীদারের চিবুক নেড়ে দিয়ে সে বলেছিল, 'সমাজ? সমাজের মুয়ে আমি আগুন দিই।' বলেছিল ও নাকি বিষ্ণুপুরের কোন্ এক কালোয়াতের মেয়ে।

আবেকজনের সঙ্গে দেখা তাব দশ বছর পবে। বিষ্ণুপুবেবই এক জলসায়। বাইরেব এক নাটকেব দলেব সঙ্গে সে এসেছিল। সাইকেলেব চাকা ঘুরিয়ে সে জ্বালাতে পাবত বিজলীব আলো। রোগাপটকা চেহাবা। কবিতা ভালবাসে। পবে সে মশানজোড়ে ট্রাক্টব চালাত।

বিষ্ণুপুরের রাস্তায় গেলেই আমাব সেই মুখ দুটো মনে পড়ে।

গেলাম বিষ্ণুপুবেবই বাস্তায়। তবে বিষ্ণুপুবে না গিয়ে গেলাম ওন্দা হয়ে দক্ষিণে। যেদিকে আছে মানিক-মারাব বন।

বাঁধেব কাজ হবে। বনেব ভেতব দিয়ে যাবে কংসাবতীর ক্যানেল। টুল-দেড়িয়ায় বসেছে সার্ভে ক্যাম্প। সেখানে এক কাপ গবম চা পেটে পড়তেই শবীবটা বেশ চাঙ্গা হয়ে গেল।

বনেব ভেতব দিয়ে গেছে গরুব গাড়িব এবড়ো-খেবড়ো রাস্তা। তিবিশ মাইল লম্বা বন। মধ্যে মধ্যে গাছ আড়াল দেওয়া ছোট ছোট গ্রাম।

বাস্তাও তেমনি। নেহাত জীপ ব'লে তাই। নইলে আর কোনো গাড়িব পক্ষে এ বকম জংলী বাস্তা ঠেঙানো সম্ভবই হত না। জীপটাকে এক জায়গায় বেখে এবাব আমবা ঝোপঝাড়েব ভেতব দিয়ে হাঁটাপথ ধবলাম।

বন বলতে শালবন। মাঝে মাঝে গরানগাছ, সিধিয়া গাছ। এক জায়গায় দেখলাম কয়েকটা তিতির। মাঝে মাঝে গাছের ডালে রং-বেরঙের নাম-জানি-না পাখি। গড়ানে জমিতে সাঁওতালদেব ছোট্ট ছোট্ট গ্রাম। মাঝে মাঝে পাটকিলে রঙেব ফোঁপরা পাথর। কোথাও কোথাও শুধু কাঁটাঝোপ। ময়নাকাঁটা। সিয়াকুল। শুধু মাঠেব পব মাঠ।

যে লোকটা আমাদের সঙ্গে ম্যাপ আর কম্পাস নিয়ে চলেছে, সে টুলদেড়িয়ারই বাসিন্দা। সবে কাজে ঢুকেছে। পঁয়তাল্লিশ টাকা মাইনে। আছেন কমবয়সী একজন সার্ভেয়ার। বাঁধের অস্থায়ী চাকুরে। খাতড়ায় বাড়ি। আর আছেন তামিলনাদবাসী ইঞ্জিনীয়ার শেষাদ্রি। চমৎকার বাংলা বলেন। বাঁধের কাজ করতে এসে শিখেছেন।

বনের মধ্যে একটু নামাল মতন জায়গায় ছোট্ট গ্রাম ফকিরডাঙা। দু ঘর সাঁওতাল। বাকি সবই নায়েক। একটা বাড়িতে উঠোনে মুরগি চরছে। বাড়ির পাশে শিরীষ গাছ। দু-তিনটে খেজুর। একটা ঝাড়ে কলাগাছ। কাঁঠাল আর মাদার। সরকার কুয়ো ক'রে দিয়েছিল। তার জল এখন ঘোলা। আধ মাইল দূরে বাঁধে ধরা বৃষ্টির জলই এখন গ্রামবাসীর ভরসা।

বনের ভেতর ঘোরা হল সাত-আট মাইল রাস্তা। এর মধ্যে একবারও আরাম ক'রে সিগারেট খাওয়া হয় নি। কেননা বনে ঢুকবার মুখেই আমাদের সাবধান ক'রে দেওয়া হয়েছিল। দেখবেন, আগুন যেন এদিক ওদিক না পড়ে। ভাল ক'রে নিভিয়ে না ফেললে দাবানল জ্বলে খাণ্ডবদাহ হবার ভয় আছে। শুনে পর্যন্ত আর সিগারেট ধরানোর সাহস হয় নি।

বনটার পাশ কাটিয়ে আমরা এসে উঠলাম এক ছোট্ট গাঁয়ের এক হতশ্রী জরাজীর্ণ মন্দিরে। কুয়োর জলে থিক্ থিক্ করছে পাতা। সেই জল আমরা গোগ্রাসে ছেঁকে খেলাম। এমন সময় জীপের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল শেষাদ্রির আনা কফির ফ্লাস্ক। গরম কফি যেন অমৃত ব'লে বোধ হল।

ফিরতে হল অনেকটা পথ ঘুরে। আশকান্দাপুর পেরিয়ে তালডাংরা। ফুটিফাটা মাঠের পর মাঠ। একদিকে ফরেস্ট-বাংলো। আরেকদিকে শুকনো খটখটে বালিতে রুদ্ধকণ্ঠ শিলাবতী নদী।

ফেরবার পথে পাঁচমুড়া হয়ে এলাম। দাওয়ার ওপর সাজানো মনসা পুজোর চমৎকার সব প্রতিমা। পোড়ামাটির বড় বড় ঘোড়া।

হাঁড়ি পাতিল। নিজেদের কো-অপারেটিভ আছে। বিক্রি খানিকটা হয় সরকারী সেল্‌স্ এম্পোরিয়াম মারফৎ। খানিকটা হয় যার যার নিজের চেষ্টায় হাটে বাজারে। আসল অভাব হল মাটির। সমবায় থেকে জমি কেনা হচ্ছে মাটির জন্যে।

পাঁচমুড়া থেকে বেরিয়ে যখন ওন্দা পৌঁছুলাম, বেলা তখনই পড়ে এসেছে। ন' মাইল রাস্তা পার হয়ে যখন বাঁকুড়ায় এলাম তখন স্বচ্ছন্দে বলা যায় বিকেল হয়েছে।

তিন বছর পর এবার আর এদিক ওদিক নয়। সটান চলেছি বাঁধ দেখতে।

যে নদীতে বাঁধ দেওয়া হচ্ছে, তার নাম কংসাবতী। লোকে বলে 'কাঁসাই'। পুরুলিয়া শহরের তিরিশ মাইল উত্তর-পশ্চিমে ছোটনাগপুরের পাহাড় অঞ্চল জবররা থেকে বেরিয়ে দক্ষিণপুবে দুশো উনত্রিশ মাইল পথ পাড়ি দিয়ে এই নদী মেদিনীপুর জেলায় নন্দীগ্রামের পুবে হুগলী নদীতে এসে পড়েছে। কুমারী নদী কংসাবতীতে এসে পড়েছে অম্বিকানগরের কাছে; তারপর দক্ষিণপাশ থেকে এসেছে ভৈরব-বাঁকী আর তারাফেণী এবং ঝাড়গ্রাম পর্যন্ত যাবার পথে আরও কিছু পার্বত্য ঝোরা। ময়নার দক্ষিণে ট্যাংরাখালির কাছে আরেকটি যে প্রধান নদী এসে মিশেছে, তার নাম কালিয়াঘাই। সেখান থেকে হুগলীর মুখ পর্যন্ত এই নদীর নাম হল্‌দি।

পশ্চিম বাংলার একেবারে পশ্চিমের যে অঞ্চলটার ওপর দিয়ে এই নদীটি গেছে, সে অঞ্চলে গড়পড়তা বৃষ্টিপাত বছরে পঞ্চান্ন ইঞ্চি। অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় বলতে গেলে কিছুই নয়। চতুর্দিকে খোয়াই আর উঁচু নীচু খাবলানো মাটি। বৃষ্টি হলে কোথাও টিম টিম ক'রে চাষ হয়, কোথাও ঘাস পর্যন্ত জন্মায় না। বাঁকুড়া আর উত্তর-মেদিনীপুরের এই এক দশা। এসব অঞ্চলে কোনোরকম শিল্পসমৃদ্ধি নেই। এককালে যেটুকুও বা কুটিরশিল্প ছিল, তাও মরতে বসেছে। না এসেছে বিদ্যুৎ-

শক্তি, না হয়েছে রাস্তা। সবদিক দিয়েই এ অঞ্চলের যেন একটা দীন-ভিখিরির অবস্থা।

এ অবস্থা একদিনে হয় নি। শত শত বছর ধ'রে ক্ষয়ে ক্ষয়ে গেছে মাটি। কেটে কেটে উজাড় হয়েছে বন। গাছ যত কমেছে, ততই খরা লেগে ফেটে চৌচির হয়েছে মাটি। জল-হাওয়াও গেছে বদলে। গরমের সময় এখন গন্‌গনে গরম, শীতের সময় কনকনে ঠাণ্ডা।

মাটি যাতে ক্ষয়ে না যায়, চষের ক্ষেতগুলো যাতে জল পায়, বন্যা এলে যাতে ঠেকানো যায়—কংসাবতী বাঁধে তারই ব্যবস্থা হচ্ছে। প্রায় লক্ষ বিঘে জায়গা জুড়ে ধরে রাখা হবে জল। তার মধ্যে যে আবাদী আর অনাবাদী জমি পড়েছে তার অনুপাত হবে প্রায় দশ আনা-ছ' আনার মত। এর জন্যে ভিটেমাটি ছেড়ে নতুন জায়গায় উঠে যেতে হয়েছে প্রায় পৌনে পাঁচ হাজার ঘর লোককে।

যে জমি জলের তলায় যাবে, তার প্রায় তিরিশ গুণ জমি পাবে সেচের জল। তাছাড়া বছরে ছ'মাস যখন জল কমে যাবে, জলের তলার জমিরও তিন আনার বেশী অংশে চর পড়বে। পলি-পড়া চর জমিতে চাষের খরচ পড়বে কম, ফলনও হবে বেশী। একরে পঁয়তাল্লিশ টাকা ভাড়া দিলেও এখনকার হিসেবে চাষের খরচ পঞ্চাশ টাকার মত বাঁচবে।

এখন তো ষোল আনার মধ্যে পনেরো আনারও বেশী জমি এক-ফসলা। সেচের জল পেলে চাষীদের মধ্যে পাট আর আমনের সঙ্গে রবিফসল ফলানোর ঝোঁকও বাড়বে। এমনিতেই তো এসব অঞ্চলে গম, রাই, সর্ষে, তিল, তিসি, মুগ, মসুর, ছোলা, কলাই, অড়র, আলু, যব, জোয়ার, ভুট্টা, রকমারি তরিতরকারি আর বারোমাসের আখ চাষ হয়।

শুখার দিনে জমিতে জল পেলে একর প্রতি বাড়তি ফসল বেচে চাষীরা আমন ধান আর খড়ে পাবে ১৬৬৲ টাকার মত আর পাটে পাবে ১৮২৲ টাকার মত। সেচের জলে পতিত জমি আবাদ ক'রে

একর প্রতি নীট লাভ হবে আমন ধানে দুশো টাকারও বেশী আর পাটে সাড়ে চারশো টাকারও বেশী। বাঁধের দৌলতে দেড় লক্ষ একরের বেশী জমি জল পাওয়ার ফলে, একর প্রতি বাড়তি ফসলের দাম পাওয়া যাবে : গমে ৭১॥০ টাকা, যব জোয়ার ডাল কলাইতে ৬৭॥০ টাকা, আলুতে ৩১৫৲ টাকা, আখে ৩২৪৲ টাকা।

এর পুরোটাই সেচ বিভাগের একটা আনুমানিক হিসেব। হিসেব-গুলো হয়েছে আজ থেকে বছর দশেক আগেকার বাজারদরের হিসেবে।

ভবিষ্যতের ছবিটা যে অবিকল এমনিই হবে, তা নয়। এ হল আগামী দিনের মোটামুটি একটা আদরা। কাছাকাছি হলেও বা কম কী!

বাঁকুড়া শহরের এক প্রান্ত দিয়ে গেছে দ্বারকেশ্বর নদী। খটখট করছে শুকনো। এ তিন বছরে নদীর কাছোপিঠে সুন্দর সুন্দর কয়েকটা দালান উঠেছে। ব্রিজ পেরিয়ে তাঁতীপ্রধান রাজগ্রাম। এখান থেকে নাকি বোম্বাইয়ের তাজমহল হোটেলে বেডকভার যায়।

এবার সিধে চলে যাব বাকুড়া থেকে খাতড়া। সাতাশমাইল রাস্তা। তারপর সেখান থেকে কংসাবতী বাঁধ।

রাস্তার ধার বরাবর একটানা চলে গেছে বাঁধের নিজস্ব টেলিফোন আর ইলেকট্রিকের তার। দুপাশে কচ্ছপের পিঠের মত উবু হওয়া বড় বড় প্রান্তর। সংরক্ষিত শালবন। মাঝে মাঝে দূর দিগন্তে বালখিল্য পাহাড়।

বহড়ামুড়ি বনকাটা ইঁদপুর পাথরডিহি পেরিয়ে খাতড়া। বড় গ্রাম। দেখতে ছোটখাট শহরের মত। গ্রামের কেন্দ্রে সোজাসুজি আর আড়াআড়ি দুটো রাস্তায় দুসারি দোকানপাট আর বাজার। ভাতের হোটেল বেশ কয়েকটা। তৈরি জামাকাপড় ঝোলানো দর্জির দোকান। লেবু কলা পান সিগারেটের সঙ্গে গাঁটছড়া-বাঁধা মনিহারী দোকান। মিষ্টির দোকান, চায়ের দোকানও যথেষ্ট। বইয়ের দোকান,

লোহালক্কড়ের দোকানে বিক্রি হচ্ছে রেডিও। বাজারে ঢেলে বিক্রি হচ্ছে বাঁধাকপি আর বেগুন। একটা সাইকেল মেরামতের দোকানের সামনে ভিড়। মাথায় ফেট্টা বাঁধা এক মাঝবয়সী মাতাল খালি গায়ে নেচে নেচে আদিরসের গান গাইছে।

অদূরে বাঁধের ওয়ার্কশপ। গোটা চত্বর জুড়ে পেল্লায় পেল্লায় সব ক্যাটারপিলার, ট্রাক্টর আর বুলডোজার। সন্ধ্যে হলে গ্রাম ব'লে মনেই হবে না। ইলেকট্রিক আলোয় ধাঁধিয়ে যাবে চোখ। বড় বড় ঢাউস চাকায় ধুলো উড়িয়ে দেখা দেবে গোধূলি।

কাছে দূরে ডাইনে বাঁয়ে অনেকগুলো পাহাড়। বাঁয়ে বাঁশনালা আর পোড়া পাহাড়। ডানদিকে পবের পর চলে গেছে ভুরুডাঙা, চন্দনা আর লেদিশোল। মুড়াজোড় বাঁধ পেরিয়ে আরও এগিয়ে গেলে শিয়াল-পাহাড়ী আর মশক।

গোদাহার গ্রামে দেখলাম সাঁওতালদের এক বিয়ের পার্টি। জোরে জোরে বাজছে মাদল বাঁশী ধামসা নাগড়া।

খাল কাটা, মাটি বওয়া, রাস্তা তৈরির কাজ সেবে পিল পিল ক'রে ফিরছে মাঝি-মেঝেন। মেঝেনদেব মাথায় আলো প'ড়ে ঝকমক করছে কাঁসার বড় বড় জামবাটি। জামবাটিতে কী ছিল, মেঝেন? পান্তা। আর কী ছিল? আলুর তরকারি। আর কী? নুন। ব্যস্।

পাহাড়েব গা বেয়ে রাস্তা আঁকড়ে আঁকড়ে ঘুরে ঘুরে গাড়িটা ওপরে উঠছিল। ওপাশে স্পীলওয়ে। এপাশে চিক চিক করছে আধভাসা জমি। সামনে বাঁধ বরাবর মাটি-ফেলা রাস্তা। এপাশে ইউথ হোস্টেলের অসমাপ্ত কোঠা। ওপাশে খাদ আর খড়ির পাহাড়।

পাহাড়ের একদম মাথায় কংসাবতী ভবনের সুন্দর গোল বাংলোয় রাত ক্রমশ জমাট বাঁধল। তিন দিক ঘিরে অর্ধবৃত্তাকার ফুলের বাগান। চারদিকে ম' ম' করছে ফুলের গন্ধ। দূরে দূরে নীচে ওপরে অসংখ্য ইলেকট্রিকের বাতি। কোথাও ফ্লাডলাইট জ্বেলে কাজ হচ্ছে।

বাইরে চেয়ার টেনে নিয়ে গিয়ে অন্ধকারের দিকে মুখ ক'রে

বসলাম। এই গোটা পরিকল্পনার ভার যাঁর ওপর, তিনি আমার পাশে বসে।

ছ' বছরে কংসাবতী বাঁধ, স্পীলওয়ে আব খালে জল ছাড়ার প্রধান গেট প্রায় সম্পূর্ণ। এই বর্ষার পরই শুরু হবে জল ছাড়া। মাঠগুলো তৃষ্ণার্ত চাতকের মত তাকিয়ে আছে। এর মধ্যে খরচ হয়েছে বাবো কোটি টাকা। কাজ শেষ হতে এখনও পাঁচ-ছ' বছর লাগবে। আরও আঠোরো-উনিশ কোটি টাকা খরচ হবে। যেখানে ক্যাটারপিলারের একেকটা টায়ার (ঘণ্টার মাপে যার আয়ু) কিনতেই লাগে আট হাজার ক'রে টাকা—সেখানে বছরে আড়াই তিন কোটি টাকা খরচ হওয়া কিছুই নয়।

কার্পণ্য শুধু তাদের বেলায় যারা ট্র্যাক্টর চালায়; যারা মাটি বয়, পাথব কাটে, পাহাড় টলায়; যারা রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে তদারক কবে; যারা কলকৌশল, বুদ্ধি যোগায়। ঠিকেদারদের মধ্যেও আছে ভাল মন্দ। যারা ভাল। তারা দাও মাবে বটে—কিন্তু উচিত মত কাজও দেয়।

কাজও এখানে সাবা বছর সমান তালে হয় না। মবশুমেব ক'মাস রোজ পঁচিশ হাজার লোক কাজ কবে। চাষেব সময় কাজেব লোকের সংখ্যা হাজাব খানেকে এসে ঠেকে। চাষেব কাজে আছে খোরাকী, ধান আর দু টাকা আড়াই টাকা বোজ। আর বাধের কাজে মজুরী পাঁচ সিকে থেকে দেড় টাকা। ফুরনে করলে আড়াই টাকা থেকে তিন টাকা। চাষের কাজ ছেড়ে বাঁধের কাজে কেনই বা তারা আসবে?

এখন একটা চেষ্টা হচ্ছে দিনমজুরদের নিয়ে কো-অপারেটিভ তৈরি করার। ঠিকেদারদের যে রেটে কাজ দেওয়া হত, কো-অপারেটিভকেও সেই রেটেই কাজ দেওয়া হবে। কো-অপারেটিভের কাছ থেকে কোনো জমার টাকা নেওয়া হবে না। কো-অপারেটিভ যাতে দাঁড়াতে না পারে, এখন সেটাই হবে ঠিকেদারদের তরফের চেষ্টা।

বাঁধ হয়ে এ অঞ্চলের লোকদের আরেকটা বড় রকমের অভাব

ঘুচবে। সে অভাবটা হল খাবার জলের। গরমকালে গ্রামের পুকুর-গুলো যখন শুকিয়ে যায়, তখন লোকে যে জল পায় নির্বিচারে সেই জলই খায়। বাঁধের বাড়তি জল যাতে ক্যানেলের ভেতর দিয়ে গিয়ে গরমকালে পুকুরগুলো ভর্তি রাখে তার চেষ্টা হবে। এটা হলে রোগ-মহামারী এখনকার মত অত ছড়াতে পারবে না।

বাঁধ আর ব্যারেজের সঙ্গে লাগাও যেসব লেক হবে, সেখানে হবে মাছের চাষ। খালগুলোও হবে মাছের বড় বড় ঘাঁটি।

দুধারে হবে পার্ক আর পিকনিকের জায়গা। লেকে হবে নৌ-ভ্রমণ আর মাছশিকারের ব্যবস্থা। লেকের চারপাড় জুড়ে থাকবে মোটরে বেড়াবার রাস্তা।

শুনতে শুনতে এমন মশগুল হয়ে পড়েছিলাম যে, আমি যেন স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম আমার সামনে অন্ধকারের কোল-আলো-করা সেই ভবিষ্যৎকে।

আমার পাশে যিনি ব'সে ছিলেন, কথা বলতে বলতে কখন তিনি থেমে গেছেন জানি না। তাকিয়ে দেখলাম দূরে অন্য কোথাও অন্যমনস্ক তাঁর দৃষ্টি।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল, আজ রাত্তিরে বাড়িতে তাঁব ক্যাক্‌টাসের ফুল ফোটার কথা। আসবার সময় বলেছিলেন।

তবু আমি একরকম আজ জোর করেই এখানে তাঁকে ধরে এনে-ছিলাম।

নাম ছিল মন্ত্রেশ্বর

বেশ্যাসক্তি, পরদারগমন, ফুসলানো, বলাৎকার, খুন—বাবাজীদের গুণের ঘাট ছিল না। কারো ভবলীলা সাঙ্গ হয়েছে ফাঁসিকাঠে. কেউ বা জেলে ঘানি টেনে এসে গদিতে আবার গ্যাঁট হয়ে বসেছে। আজ আর সে বাবাজী মোহান্তরা নেই, কিন্তু বাবা তারকনাথের দবদবা যেমন তেমনিই আছে। শুধু হাওড়া স্টেশনে কেন, শহরের সর্বত্রই দেখবেন বাসন্তী রঙে ছোপানো কাপড়ে টুং টাং টুং টুং করতে করতে কাঁধে বাঁক নিয়ে চলেছে দলে দলে লোক। যাবে তারকেশ্বরে। বাবার থানে। শুধু শিবরাত্রি বা চৈত্র সংক্রান্তি ব'লে নয়—তারকেশ্বরের ট্রেনে, তারকেশ্বরের বাসে বারোমাস তিরিশ দিনই হত্যে দিতে আসা যাত্রীদের ভিড়। বাসও সব আসে কাছে দূরের হরেক জায়গা থেকে।

শেওড়াফুলি ছাড়িয়ে দিয়াড়ার দিকে এগোতেই হুগলী জেলার আর এক চেহারা। দুপাশে ঝোপ ঝাড়, ডোবাপুকুর, খড়োঘর, কলা বাগান। কলকারখানা নয়। বেহদ্দ গ্রাম। সন্ধ্যের পর দেখবেন দূরে, আদিগন্ত অন্ধকার ফুঁড়ে যাত্রী বাস বা মাললরির দুটো জ্বলন্ত চোখ পা টিপে টিপে এগিয়ে আসছে। কোথাও বা ঝোপের গায়ে

ঝাঁক বেঁধে আছে জোনাকি।

তারকেশ্বরে ট্রেন থেকে নেমেই ছুটতে হবে। নইলে আরামবাগের বাসে জায়গা মিলবে না। অত ছুটে গিয়েও প্রথম তুটো বাসে আমরা বসবার জায়গা পেলাম না। শনিবার ব'লে নয়। এ রাস্তায় এ হল রোজকার হাল। তাও তো এখন ভাল। বাস হয়েছে। যখন বাস ছিল না তখন যার যার একমাত্র শ্রীচরণই ছিল ভরসা। বাজারের রাস্তা ছেড়ে বাস এবার বাঁদিকে মোড় ঘুরল। ডানদিকে নাকের সোজা যে রাস্তা, সেটাই ছিল আগে হাঁটাপথ। পেট্রোল পাম্প ছাড়িয়ে গাড়ি এবার ডানদিকে টানা রাস্তা ধরল।

রামনারায়ণপুর পেরিয়ে মাকড়া। তুপাশে ঢালাও জমি জায়গা। মধ্যে মধ্যে মাটির বাড়ি। ভিতগুলো সব উঁচু উঁচু। দেখে মনে পড়ে গেল, এ সব হল বরাবরের বন্যা অঞ্চল। নারকেলতলা পেরিয়ে চাঁপাডাঙার জমজমাট হাট।

পরের পর কয়েকটা কোল্ড স্টোরেজ। পাঁচ বছব আগেও ছিল না। হালে হয়েছে। প্রথম ঠাণ্ডাঘর হয় বালিগড়িতে। পশ্চিমবঙ্গের গ্রামাঞ্চলে কোল্ড স্টোবেজেব এই ধুমধড়াক্কা ফলাও কারবাব ইদানীং খুবই চোখে পড়বে। তবে হুগলী জেলায় এই ঠাণ্ডাঘরের একটা সাবেকী ঐতিহ্য আছে। আজ থেকে প্রায় তুশো বছর আগেও চুঁচুড়ায় দৈনিক কয়েক শো মণ ক'রে বরফ তৈরি হত। তা দিয়ে হত সাহেবসুবোদের ফলমূল মাছমাংসের সংরক্ষণ।

হাটের গা দিয়ে গেছে দামোদর। এ সেই সেকালের ছড়ার ধেয়ে-এল-দামোদর আর নয়। এখন দেখে কে বলবে নদী। মধ্যিখানে হালবলদ জুড়ে রীতিমত চাষ আবাদ হচ্ছে। জায়গায় জায়গায় জলের একটু আধটু ছিটে ফোঁটা। হাটের গা বেয়ে রাস্তা উঠে সটান গেছে বিদ্যাসাগর ব্রিজে।

ব্রিজের ঠিক মুখটাতে গুচ্ছের বিজ্ঞাপন। অমুক কোল্ড স্টোরেজ। সুলভ ভাড়ায় আলুবীজ রাখুন। কিনুন জগদ্ধাত্রী আর লণ্ঠন মার্কা

মিশ্র সার। দলে দলে দেখে যান নট্ট কোম্পানির অপেরা পার্টি। তার মধ্যে ইংরেজিতে লেখা খাপছাড়া সিগারেটের একটা ছুটো বিজ্ঞাপন। ভাগ্যিস বিজ্ঞাপনের লোকেরা গ্রামের রাস্তাঘাট বড় একটা মাড়ায় না! নইলে কী হত একবার ভেবে দেখুন। এর সাইকেল, ওর সাবান। এর রেডিও, ওর শার্ট। এর পোকামারা ওষুধ, ওর মাজন। রকমারি রঙে আর বুক-মুখের ঢঙে—আকাশের নীল আর মাঠের সবুজ নিঃসন্দেহে আড়াল পড়ত। প্রকৃতির সেই অপ্রকৃতিস্থ অবস্থা বাস-যাত্রীদেরও নিশ্চয় পাগল ক'রে মারত। ভাগ্যিস—

সোদপুর পেরিয়ে হরিণাখালির খাল। তারপরই হরিণখোলা। মুণ্ডেশ্বরীর একেবারে গায়ে। দুদিকের উঁচু পাড় দেখলে বোঝা যায় বর্ষায় এ নদীতে কী কাণ্ডই না হয়। নড়বড়ে ভাসন্ত কাঠের পুল দিয়ে শুকনোর ক'টা মাস বাস পারাপার করবে। শোনা যাচ্ছে, শীগগিরই নাকি এ রাস্তায় ব্রিজ হয়ে যাবে। হাজার হোক, এ হল খোদ মুখ্যমন্ত্রীর নির্বাচনী এলাকা।

আমরা নামলাম হরিণখোলায়।

আমরা বলতে আমি রেজওয়ান, বজবজের কবিরন, জাহানারা আর গোলবানুর মেয়ে অরুণা। যাব রেজওয়ানদের গ্রামে। এখান থেকে দেড়-দু ক্রোশ রাস্তা। এসব বলে কবে থেকে পাঁয়তাড়া কষছি। আমার সময় হয় তো রেজওয়ানের সময় হয় না। রেজওয়ানের হয় তো আমার হয় না।

বজবজে রেজওয়ানদের রুটির কারখানা। পত্তনের সময় আমরা বজবজে ছিলাম। এখন তো 'সাথী বেকারি' বলতে ও অঞ্চলে লোকে এক ডাকে চেনে। ময়দা নিয়ে বার বার বিভ্রাট না হলে কারখানা এতদিনে বেশ ভালভাবেই দাঁড়িয়ে যেতে পারত। বিধি বাম না ব'লে দক্ষিণপন্থী বলাটাই বোধহয় ঢের বেশী যুক্তিসঙ্গত।

চেনার সূত্রটা পাঁউরুটি-বিস্কুট হলেও রেজওয়ানের কিন্তু তার চেয়েও

একটা বড় পরিচয় আছে। সে পরিচয় আবৃত্তিকার আর অভিনেতা হিসেবে। নজরুল ইসলামের কবিতা ওর গলায় আর মেজাজে চমৎকার খোলে। যেকোনো নাটকে টাইপ চরিত্রে ওকে সুন্দর মানায়। পৌরাণিক বা ঐতিহাসিক হলে তো কথাই নেই।

সামনের দোকানে গরম চায়ে গলা ভিজিয়ে নিয়ে তক্ষুনি রওনা হতে হল। আকাশটা সারাদিনই মুখ ভার করে আছে। তার ওপর সন্ধ্যে হয়-হয়। গ্রাম থেকে লোক এসেছে লণ্ঠন নিয়ে। বৃষ্টি এসে পড়বার আগেই গ্রামে পৌঁছুতে হবে।

কোল্ড স্টোরেজের গা দিয়ে রাস্তা। দু পা যেতেই চারপাশ থেকে অন্ধকার ছেঁকে ধরল। লণ্ঠন থাকলেও লণ্ঠনটা ইচ্ছে করেই জ্বালানো হল না। লণ্ঠনের আলোয় হাঁটতে ভারি অসুবিধে হয়! যেতে হয় ঘাড় গুঁজে। মুখ তুললেই চোখে ধাঁধা লাগে। তার চেয়ে সামনের লোকের পায়ে পায়ে চলা ঢের ভাল। এই তো বেশ দিব্যি দেখা যাচ্ছে, অন্ধকারে চিক চিক করছে পায়ে চলা এক চিল্‌তে রাস্তা। সাপ খোপ শুয়ে থাকলেও কাছ থেকে অনায়াসে নজর করা যাবে। তাছাড়া এও ঠিক যে, ভয় মনে করলেই ভয়।

খানিকটা যাবার পর, যে সামনে যাচ্ছিল, পাশের একটা বাগান মত জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল—এই জায়গাটাই রাতবিরেতে যা একটু ভয়ের। টাকাপয়সা থাকলে ছোরাছুরি দেখিয়ে কেড়েকুড়ে নেয়। সন্ধ্যের পর এ রাস্তায় কেউ তাই বড় একটা একা আসে না। ঐ যে ঝুপড়িগুলো দেখছেন, ও পাড়াটা ভাল নয়। অন্ধকারে তাকালাম বটে, কিন্তু কিছুই ঠাহর হল না।

ধারে কাছে লোকালয় বলতে ঐটুকু। ঝুপড়ির ভেতরে বাতি জ্বলছে ব'লে মনে হল না।

আকাশ নিকষ কালো। তারাগুলো মেঘে ঢাকা। হাওয়ায় বেশ একটা দমকা ভাব। রাস্তার দু পাশে শুধু মাঠ আর মাঠ। অনেক দূরে আকাশের শেষ দেখা যাচ্ছে।

বৃষ্টি হয় নি এদিকে ?

কোথায় বৃষ্টি ! নামমাত্র ছিটেফোঁটা। পাট চাষের এবার সর্বনাশ হল। পাট বেচে চাষীরা যাও বা হুটো পয়সার মুখ দেখতে পেত, এ বছর সে পথও বন্ধ।

গল্প করতে করতে কালভার্টের মুখে এসে গেলাম। ডানদিক দিয়ে এবার গ্রামে ঢোকবার রাস্তা। এইবার লণ্ঠনটা জ্বালিয়ে নেওয়া হল। জ্বালানো সহজ হল না। যা হাওয়া।

মাদ্রাসার হাতাটা ছাড়াতেই দেখা গেল, রেজওয়ানের ছেলেমেয়েরা রাস্তায় দল বেঁধে দাঁড়িয়ে। বাপকে দেখেই সব হৈ চৈ ক'রে ছুটে এসে তারপর আমাদের দেখে অপ্রতিভ হয়ে গেল।

সকালবেলায় বেরোলাম গ্রাম দেখতে।

মুণ্ডেশ্বরী নদীর এপার ওপার জুড়ে কেশবপুর বেশ প্রকাণ্ড গ্রাম। প্রায় তিরিশ বর্গ মাইল এলাকা। পুবদিকে বৈঠা, কুলবাতপুর, পশ্চিম-পাড়া, নিমডেভি, তকিপুর। দক্ষিণে এপারে হুমাচক, কেষ্টপুর, ওপারে মোদকপুর, আসনপুর, চকানল। পশ্চিমে ওপারে ভেলুয়া আর বাতানল। উত্তরে ওপারে মলয়পুর আর বনমালিপুর।

গোটা মলয়পুর অঞ্চলে যা লোক, তার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ লোক এক এই কেশবপুরে। নদীর এপার ওপার মিলিয়ে কেশবপুরের লোকসংখ্যা প্রায় হাজার ছয় হবে। পাড়ায় পাড়ায় ভাগ হয়ে এপারে ওপারে আধাআধি লোকের বাস।

ঠিক হল ওপারে ইস্কুল দেখতে যাব।

মুসলমান পাড়ার গা ঘেঁষে বাগ্দী পাড়া। বাগ্দী পাড়ার ভেতর দিয়ে পারঘাটে যাবার রাস্তা। পাড়াটাকে বলে ভেটী পাড়া। আগে ছিল ভেটীর চণ্ডী। সেই থেকে ভেটী পাড়া নাম।

এ পাড়ায় ঢুকলেই বোঝা যায়, লোকজনেরা বড় দীনদরিদ্র। পঞ্চাশ ঘর লোকের বাস এ পাড়ায়। তার মধ্যে মোটে আট ঘরের

জমি আছে। তার মধ্যে একটি মাত্র ঘরেরই যা বিঘে পনেরো জমি। বাকি সকলেরই এক বিঘে দু বিঘে ক'রে। প্রায় সবাই হয় ভাগচাষী, নয় ক্ষেত মজুর। কাজের যখন খুব চাহিদা থাকে, তখন ক্ষেতমজুররা রোজ পায় আড়াই-তিন টাকা। কাজের মন্দার সময় রোজ কমে হয় দেড় টাকা।

একজন বলল, ঘর দেখছেন পঞ্চাশটা। কিন্তু এ পাড়ায় মাথাগুণতিতে লোক কত হবে জানেন? চার-পাঁচ শো-র নীচে নয়। যে লোকটা বলছিল সে নিজেও বর্গক্ষত্রিয়। নিজের বলতে তার এক ফোঁটাও জমি নেই। দিনমজুরি করে। কলকাতায় যাওয়া-আসা আছে। কথার খুব বাঁধুনি। দুঃখ ক'রে সে বলল, যার ঘরে যত অভাব, ভগবান তার ঘরে তত ছেলেপুলে দেন।

নদীর ধারে যাবার সরু রাস্তাটায় একটা গাছের ডাল এসে পড়েছে। তার তলা দিয়ে নীচু হয়ে যেতে গিয়ে দেখি পুরনো ইটের একটা ভাঙা দেয়াল।

রেজওয়ান বলল, এটা কী জানেন? খলিল কাজীদের পূর্বপুরুষদের ভিটে। এখানে বছর পঞ্চাশ আগে ছিল বিরাট চক-মিলানো কোঠাবাড়ি। দুয়োরে হাতী বাঁধা থাকত। না, জমিদার টমিদার নয়। কাজীদের ছিল সেকালে নাকি মাংস নোনা করার কারবার। মাংস নোনা ক'রে সেই মাংস জাহাজে সাপ্লাই দিত। আজ ওদের একেবারে কপর্দকহীন অচল অবস্থা। থাকবার মধ্যে আছে এই কয়েকটা ভাঙা ইঁট। গ্রামের লোকে না দেখলে কবে এতদিনে ফৌত হয়ে যেত।

হ্যাঁ, দেখে সম্ভ্রম হওয়ার মত নদী বটে। দু দিকের পাড় আর খানা-খন্দ দেখলে বোঝা যায় বর্ষায় নদীর জল কোথায় ওঠে। নদী ফি বছরই একটু না একটু পাড় ধ্বসিয়ে নিয়ে যায়। একজনদের একটা ঘর তো দেখলাম বিপজ্জনকভাবে পাড়ের গায়ে ঝুলছে। নদীর ভাঙন জিনিসটা এদিককার লোকের প্রায় গা-সওয়া ব্যাপার।

নদীর নাম মুণ্ডেশ্বরী। এ নদী আসছে বর্ধমান জেলা থেকে। দক্ষিণপুব বয়ে এসে হরিণখোলার কাছে বেসিয়া খালের সঙ্গে এর যোগ হয়েছে। পুরনো পুঁথিতে দেখা যায়, মুণ্ডেশ্বরীর অন্য নাম—'মন্ত্রেশ্বর' আর 'মুড়াই'।

নদীতে জল এখন কম। তাহলেও ফেরি ভিন্ন পার হওয়ার উপায় নেই। তকতকে পরিষ্কার জল। শুধু বর্ষার ক'টা মাস রংটা ঘোলাটে হয়। আর সে জলে স্রোতের যে কী টান, তা দুপুরে স্নান করতে গিয়ে বিলক্ষণ বুঝেছিলাম। এক জায়গায় দাঁড়িয়ে যে স্নান করবেন সে উপায় নেই। পরক্ষণে দেখবেন নদী আপনাকে নামালের দিকে ঠেলে সরিয়ে নিয়ে গেছে। তাও তো বর্ষা এখনও নামে নি। বর্ষার ঢল নামলে যে কী দশা হবে ভাবাই যায় না।

ওপার কী আর এপার কী, গ্রামের সমস্ত বাড়িরই ভিতগুলো উঁচু উঁচু। তার কারণ আছে। আগেকার দিনে এসব ছিল বরাবরের বন্যা অঞ্চল। দামোদরের বাঁধ হবার আগে। পরেও হয় নি তা নয়! সেই যেবার দামোদরের বাঁধের জল হঠাৎ ছেড়ে দিতে হয়েছিল। এদিকের যত গ্রাম সব ডুবে গিয়েছিল। ঘরে একদানা খাবার ছিল না কারো। সেই প্রচণ্ড বন্যায় আরামবাগে সরকারী গুদাম থেকে চাল আনতে গিয়ে নৌকো বাওয়ায় কত বার কত ভাবে ডুবে যেতে বসেছিল, সে গল্প বলতে গিয়ে এখনও রেজওয়ানের গায়ে কাঁটা দেয়।

এ অঞ্চলে একটা কথা খুব চলে। 'পাবালে বসা'। একটা ছ-সাত হাত লম্বা বাঁশ নদীর মধ্যে বালিতে গেঁথে তার ওপর কাঠের একটা সরু পাটা বসানো হয়। পাটার ঠিক মাঝখানে থাকে একটা ফুটো। বাঁশের মাথায় সেটা বসানো থাকে। দুদিকে দুটো পা দিয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা ধরে মাথাঘুরুনি বা পাশ জাল দিয়ে লোকে মাছ ধরে। তারই নাম পাবালে বসা। বর্ষার সময় এসব অঞ্চলে চাষীদের পাবালে বসবার ধুম পড়ে যায়। মাছ তো কত! অনেক সময় বসাই সার হয়।

ফেরিতে পার হওয়া নিয়ে ঘাটাল মাঝিদের সঙ্গে গাঁয়ের লোকদের

খিটিমিটি রোজকার ব্যাপার। কেউ অনেক বাকি ফেলে রেখেছে, কেউ দরাদরি ক'রে পয়সা কম দিতে চাইছে। এই রকমের সব ব্যাপার নিয়ে কথা কাটাকাটি ঝগড়াঝাঁটি লেগেই আছে।

ওপারে নদীর ধারে ছোট ছোট সব্জী ক্ষেত। জলও বাড়বে ফেরিঘাটও জায়গা বদলাবে। ঘাট থেকে গ্রামে ঢোকবার মুখে কেশবপুর লাইব্রেরি। অনেক দিনের পুরনো। গন্ধহীন এক ধরনের বড় বড় বেগ্নী ফুলের গাছ। গেরস্ত বাড়ির সামনে ওঁচলা ফেলা আর সার পচানোর বড় বড় গর্ত।

জীবনবাবু নাতনীকে পড়া ব'লে দিচ্ছিলেন। সত্তরের কাছাকাছি বয়েস হলেও মনটা তাঁর খুব তাজা। সওদাগরী আপিসে কাজ করতেন। চাকরি থেকে অবসর নিয়ে এখন বাড়িতেই আছেন। ফুলবাগানের তাঁর খুব শখ। বাইরের ছোট্ট উঠোনে তাঁর নিজের হাতে লাগানো রকমারি ফুলের গাছ।

জীবনবাবু শুনেছেন তাঁর জন্মের আগে এ গাঁয়ের সরকার-দত্ত পাড়ায় দশ বারো ঘর ডোমের বাস ছিল। ডোম বলতে যারা বাঁশের কাজ করে। 'বাঁশ বনে ডোম কানা'র সেই ডোম। ডোমেদের ঠাকুর ছিল। দুর্গোৎসবও হত। নির্বংশ হয়ে যাওয়ায় গ্রামে আর এখন ডোমও নেই, কুমোরও নেই। আগে সব জাতেরই বাস ছিল। জাত হিসেবে গ্রামে বরাবরই ছিল আলাদা আলাদা পাড়া। যুগীরা এখনও আছে, তবে তারা এখন তাঁত বোনা ছেড়ে দিয়ে বিলকুল চাষী বনে গেছে। সব জাতেরই ঝোঁক চাষীবাসী হওয়ার দিকে।

আজকাল হু-হু ক'রে নাকি জায়গাজমির হাতবদল হয়ে যাচ্ছে। বামুন-কায়স্থ-মুসলমানদের হাত থেকে জায়গাজমি এখন জাতচাষী মাহিষ্যদের হাতে চলে যাচ্ছে। নিজেরা চাষ না ক'রে জমি যারা ভাগে দিত, তাদের জমিই বেশী ক'রে হাতবদল হচ্ছে।

জীবনবাবু বললেন, মাহিষ্যরা হল জাত চাষী। তারা মাটি মুখে দিয়ে চেখে দেখে ঠিক করে এবার কোন্ ফসল করবে। এসব অঞ্চলে

যত ডাঙা-ডহর ওরাই তো সব সমান করল, মাটি থেকে নোনা কাটানোর জন্যে সে মাটিতে ওরাই তো সার দিল। কাজেই ওদের হাতে জমি যাওয়ায় কাউকে বিশেষ আপশোস করতে দেখলাম না।

ইস্কুলের রাস্তায় এগিয়ে দুপাশে বড় বড় খানা-হানা দেখে বুঝলাম ডহর কী জিনিস। এ সবই এ অঞ্চলে বন্যার দান। একটা ভাল ছিল, বন্যার জলে খানাগর্তে অনেক মাছ আসত। খানাগুলোতে আগে বারোমাসই কিছু না কিছু জল থাকত। বন্যা বন্ধ হওয়ার পর থেকে গর্তগুলো এখন নির্জলা ঠন্ ঠন্ করছে। আগেকার দিনে বর্ষার সময় এ বাড়ি ও বাড়ি যাতায়াত করতেও তো নৌকো লাগত।

আগে যেটা ছিল কেশবপুর মাইনর স্কুল. সেটাই এখন হায়ার সেকেণ্ডারী হয়েছে—এখন নাম কেশবপুর মহেন্দ্র ইনষ্টিটিউশন। প্রায় একতলা সমান উঁচু ভিতের ওপর পুরনো স্কুলবাড়ি। মাটির দেয়াল। টিনের চাল। আর তার ঠিক মুখোমুখি হাইস্কুলের নতুন দোতলা কোঠাবাড়ি। আশুবাবু আমাদের ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে সব দেখালেন। কলকাতায় যেবার বোমার ভয়ে লোক পালাচ্ছিল, সেইবার আশুবাবু এলেন গ্রামে। তখন তাঁরই চেষ্টায় মাইনর স্কুল হাইস্কুল হল। আশুবাবু পেশায় উকিল। কর্মস্থল কলকাতা। কিন্তু সপ্তাহটাকে তিনি ভাগ করে নিয়েছেন ; অর্ধেক দিন কলকাতা, অর্ধেক দিন গ্রাম। চিরকুমার থেকেই তিনি জীবনটা কাটিয়ে দিলেন ; ইস্কুলই তাঁর ধ্যান-জ্ঞান। গ্রামের লোকের কাছে তাই ইস্কুল আর আশুবাবু একাকার।

আশেপাশে আরও অনেক ইস্কুল হয়ে যাওয়ায় ছাত্রসংখ্যা খুব বাড়ে নি। ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্রদের সিকি ভাগেরও কম। কম বয়সে বিয়ে হয়ে যায়, সংসারের কাজ করতে শুরু—এইসব কারণে মেয়েদের বেশী দূর পড়ানোর এখনও রেওয়াজ হয় নি। ছেলেদের বিজ্ঞান পড়ানোর দিকে অভিভাবকদের ঝোঁক বেশী। কেননা আজকাল তাতে রুজিরোজগারের ঢের সুবিধে।

ছাত্রাবাসে জন পঁয়ত্রিশেকের থাকবার ব্যবস্থা। ছাত্রাবাসে থেকে

পড়তে খরচ পড়ে পঞ্চাশ টাকার মত। মেধাবী ছাত্র হলে শুধু আধ মণ চাল লাগে। বাকি সব খরচ ইস্কুলই বহন করে।

ইংরেজির ব্যাপারটাই যা মুস্কিলের। বেশির ভাগ ছাত্রছাত্রী ইংরেজিতেই আটকায়।

আর এক মুস্কিল বিজ্ঞানের শিক্ষক পাওয়া নিয়ে। যদিও বা পাওয়া গেল, ধরে রাখা শক্ত। সুবিধে হয় স্থানীয় কোনো শিক্ষক পেলে। আরও ভাল হয়, শিক্ষকের স্ত্রীও যদি শিক্ষিকা হন। তাতে ছেড়ে যাবার ভয় কম থাকে।

হাইস্কুল হওয়ার পর গ্রামের লোকেরা ষোল-সতেরো বিঘে নিষ্কর জমি দিয়েছে। আর চাঁদা তুলে টাকা দিয়েছে দশ-বারো হাজারের মত। লোহা ব্যবসায়ী সিংহ মশাই দিয়েছেন পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা। সরকারী ডিফিসিট গ্র্যান্ট মেলে বছরে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ হাজার টাকা। গড়ে বছরে ইস্কুলের খরচ পঞ্চাশ হাজার টাকার মত। ছেলেদের মাইনের টাকা থেকে বছরে আয় হয় বারো থেকে পনেরো হাজার টাকা।

হেডমাস্টার মশায়ের ঘরে ব'সে প্রাথমিক স্কুল নিয়ে কথা হচ্ছিল। একজন বললেন, প্রাথমিক ইস্কুল থাকলে কী হবে—একেবারেই ছাত্র হয় না। বাড়ি বাড়ি ঘুরে জোর ক'রে ছাত্র ধরে আনতে হয়। তাও একই ছাত্রকে দুবার দেখতে পাবেন না। বাধ্যতামূলক আইন হলে এক যদি কিছু হয়। আর করতে হবে দুপুরে ইস্কুলে বিনিপয়সায় খাওয়ানোর বন্দোবস্ত। কিন্তু যাই বলুন, যে দেশে লোকের পেটে ভাত নেই, পরনে কাপড় নেই, রেশনের লাইনে রাতভর দাঁড়িয়ে লাইন দিতে হয়—সে দেশে কতটুকুই বা আপনি লেখাপড়া বিস্তারের আশা করতে পারেন?

বিকেলে মাদ্রাসার মাঠে গোল হয়ে বসে অনেকক্ষণ আড্ডা হল। মুসলমান পাড়ায় চাষবাস করে কম লোক। বেশির ভাগই বাইরে বাইরে চাকরি-বাকরি ব্যাবসাপত্র করে। সপ্তাহে সপ্তাহে

বা মাস গেলে টাকা পাঠায়। বাড়ির লোকজনেরা গ্রামের বাড়িতেই থাকে। যার কিছুটা জমি আছে, কিষাণ রেখে চাষ ক'রে বা ভাগে দিয়ে তা থেকেও কিছুটা ফসল হয়। এ গাঁয়ে বেশী জমি একমাত্র মীর্জা সাহেবদেরই। তা প্রায় দু-আড়াই শো বিঘে হবে। মীর্জা সাহেবদের আসল রোজগার জমি থেকে নয়। তাঁদের আসল পয়সা জাহাজে কাঁচা বাজার সাপ্লাই থেকে।

এদিককার বেশির ভাগ লোককেই পাওয়া যাবে খিদিরপুর-মেটেবুরুজ অঞ্চলে। তার মধ্যে বেকারির ব্যাবসা আর চাকরিই প্রধান। কেক-রুটি তৈরিতে এদিককার লোকের বিলক্ষণ হাতযশ। আবদুল লতিফ মিস্ত্রী আর আবদুল বারি ছিলেন ইংরেজ আমলের বড়লাটের বেকার। কেক তৈরিতে এঁদের নাকি জুড়ি ছিল না। বুড়ো বয়সে ওস্তাগর মিস্ত্রি চল্লিশ টাকা আর তাঁর সাকরেত বারি পেতেন মাসিক তিরিশ টাকা পেন্সন।

সাবেককালে এ গ্রামে বড়লোক ছিল মানিক মল্লিক। চাঁদনী বাজারে তাঁর ছিল কাটা কাপড়ের দোকান। দুই ভাই ছিলেন—মানিক আর ইসমাইল। লোকে বলে, ধানের গোলায় থাকত তাঁদের কাঁচা টাকা। এ সব অঞ্চলে মানিকের ছিল বেজায় দবদবা। গ্রামের প্রাধান্য নিয়ে মামলা মোকদ্দমা লাঠিবাজি ক'রে মল্লিকদের অবস্থা একেবারে পড়ে গেল। আর তাদের যুক্তিপরামর্শ দিয়ে অবস্থা ফিরিয়ে ফেলল শহরের উকিল মোক্তার।

মহাজনী কারবারে নয়, শুধু চাষবাস ক'রে বড়লোক হয়েছে, এমন একজনকেও এ অঞ্চলে খুঁজে পাওয়া যাবে না। ওপারে শৈলধর ঘোষদের অবশ্য বিস্তর জমিজায়গা। তাও তাদের পয়সা হয়েছে লোহালক্করের ব্যাবসায়।

কথা বলতে বলতে সন্ধ্যে উৎরে গেল। দূরে মাঠের এককোণে সপ্তাহান্তে শহর থেকে ফেরা একদল ছেলেছোকরা বসেছে একটা ট্র্যান্‌জিস্টর রেডিও নিয়ে। ঐ দলে বসেছিল কিব্‌রিয়া।

কিব্রিয়া কিছুদিন বজবজে রেজ্জওয়ানের রুটির দোকানে ছিল। এখন থাকে রায়পুরে। কলকাতার এক রুটির কারবারীর স্থানীয় প্রতিনিধি। কারবারের মালিক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ। ভবানীপুরে থাকেন। ভাইয়ে ভাইয়ে খুব ভাব। মুসলমান কর্মচারীদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার ঠিক আপনার লোকের মত। দাঙ্গার সময় তাদের সবাইকে তাঁরা আগলে আগলে রেখেছিলেন।

বাবার মৃত্যুর পর কিব্রিয়া বাড়ি থেকে এক কাপড়ে শুধু হাতে বেরিয়ে পড়েছিল রোজগারের আশায়। কষ্ট কম করে নি। তার চেষ্টা দেখে লোকে সাহায্যও করেছে। আজ কিব্রিয়া মোটামুটি দাঁড়াতে পেরেছে। চাষের মরশুমের জন্যেই এ সময়ে তার ছুটি নিয়ে দেশে আসা।

এখানকার সমস্যাই হল জল। আগে ছিল জল নিকাশের সমস্যা, এখন জলসেচের সমস্যা। হরিণখোলায় যেতে অবশ্য একটা গভীর নলকূপ বসছে। ওটাতে তবু খানিকটা মুস্কিলের আসান হবে। এখানে একটা সুবিধে এই যে, তিরিশ চল্লিশ ফুট মাটি খুঁড়লেই জল মেলে।

হাটে গরু বেচাকেনার কাজ করেন একজন। রাজনীতিতে কমিউনিস্ট হলেও খুব ধর্মভীরু। তিন ওক্ত নমাজ পড়েন। কোনোরকম অন্যায় অবিচার দেখলেই তার বিরুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েন। ওপরতলার অত ডান বা বোঝেন না। তিনি এসে খবর দিলেন, কাল বাজ প'ড়ে নদীর পারের একটা বাড়ি পুড়ে গেছে। কেউ অবশ্য মারা যায় নি। কিন্তু নতুন ক'রে ঘর তোলবার তো এখুনি একটা ব্যবস্থা করতে হয়। নইলে ছেলেপুলে নিয়ে কোথায় থাকবে। ব্যবস্থা মানেই তো আরামবাগে গিয়ে রিলিফ অফিসে গিয়ে দিনের পর দিন হত্যে দেওয়া।

একটা মজা লক্ষ্য করলাম। এখানে যে কথাই হোক, ঘুরে ফিরে আলুর চাষে গিয়ে ঠেকে।

শেষ পর্যন্ত ঠিক তাই হল।

আলু চাষ অবশ্য এ অঞ্চলে নতুন নয়। বরাবরই হয়ে আসছে। কিন্তু পঞ্চাশ ষাট বছর আগেও এত ব্যাপকভাবে আলুর চাষ হত না।

গোটা কেশবপুর মৌজায় এককালে খুব বেশী হলে আড়াই শো তিন শো বিঘা জমিতে আলুর চাষ হত। এখন আলুর চাষ হয় তার দশগুণ জমিতে।

আলু চাষের সময় এখন নয়। কার্তিক মাসের গোড়া থেকে জমি পাট করতে হবে। প্রত্যেক জমিতে মোট আটটা দশটা হাল দিতে হয়। সকালে চাষ। বিকেলে শুকিয়ে গেলে মই দেওয়া আছে। জমি পাট করতে সময় নেবে এক মাস। এত কাণ্ডকারখানার পর তবে জমি তৈরি হল।

প্রথম দুটো চাষ দেবার পর পাঁশ সার বা গোবর সার আর পাতা-পচানি দিতে হবে। শেষ বারের চাষের আগে বা পাট সারার আগে ছড়িয়ে দেওয়া হল কেমিকেল সার।

এবার আলু বীজ পুঁতে দিয়ে মাটি চাপা দেওয়া হল। আলু বীজ বলতে চার-পাঁচটা ক'রে আলুর চোক শুদ্ধ টুকরো। আট দশ দিন পর তা থেকে কল বেরোবে। গাছ খুঁটলে যদি দেখা যায় মাটি শুকিয়ে গেছে, তাহলে মাটিতে জলের ঝাপ্টা দিতে হবে। মাটি শুকিয়ে গেলে বলে 'তাত', ভিজে থাকলে বলে 'বাত'।

আলের ওপর দিয়ে নালা কেটে জল দেওয়া। তাকে বলে জলের ঝাপ্টা দেওয়া। গাছ যখন ছ থেকে আট ইঞ্চি বড় হল, তখন জলের ঝাপ্টা দিয়ে গাছের গোড়ায় পরিপাটি ক'রে মাটি দিতে হবে।

বসাবার সময় ছ ইঞ্চি অন্তর অন্তর বীজ বসাতে হবে প্রত্যেক সারিতে। প্রত্যেক দু সারির মধ্যে এক হাত ক'রে জায়গা ছাড়তে হবে। নালা কেটে সেই মাটি দিতে হবে গাছের গোড়ায়। মাটি দেওয়ার পর শুরু হবে সেচ দেওয়া। 'সেচ'কে চলতি কথায় বলে 'ছিঁচ'। গোড়ায় সাত দিন অন্তর ছিঁচ দিতে হবে।

আগে ছিঁচ দেওয়া হত ডোঙা-কলে। এখন হয় পাম্পিং মেশিনে। আলু চাষে দশ বারোটা ছিঁচ দিতে পারলে ভাল হয়। কিন্তু এখন দেওয়া হয়ে থাকে মোটে চার পাঁচটা।

এরপর কোদাল বা লাঙল দিয়ে জমি ভেঙে আলু তোলার কাজ। বালির জমিতে লাঙল আর মাটির জমিতে কোদাল দিয়ে ভাঙলে ভাল হয়। ফলন হয় কাঠায় গড়ে তিন মণ। খুব ভাল সার দিলে—এবং 'ছিঁচ যদি না বয়' অর্থাৎ ঠিক সময়মত ছিঁচ দিতে পারলে—কাঠায় পাঁচ-ছ মণ পর্যন্ত আলু হয়।

আলুর চাষে বীজ লাগে বিঘায় গড়ে পাঁচ মণ আর লাগে সার। গোবর সার ছাড়াও পাঁচ বস্তা কেমিকেল সার। পাঁচ বস্তায় থাকে দশ মণ। আলুবীজ কিনতে গেলে মণ পড়ে বত্রিশ টাকা।

তবে সবাই প্রায় আলুবীজ রেখে দেয়। কোল্ড স্টোরেজ হওয়ায় এখন বীজ রেখে দেবার সুবিধেও হয়েছে। ফাল্গুনের শেষ থেকে কার্তিক পর্যন্ত কোল্ড স্টোরেজেই থাকে। এই সময়ের জন্যে কোল্ড ষ্টোবেজে বীজ রাখবার ভাড়া মণ প্রতি ছ টাকা। ব্যাপারীরা বিক্রির আলুও বাখে। খাবাব আলু রাখার ভাড়া ঠিক হয় সময়ের মেয়াদ হিসেবে। আজকাল কপিও কোল্ড স্টোরেজে রাখা হচ্ছে। এসব ঠাণ্ডাঘব বেশিব ভাগই মারোয়াড়ীদেব।

আব আছে কিষাণ খরচ। লাঙল দিতে দশটা রোজ লাগবে। বীজ বসাতে গোটা দশেক রোজ। ছিঁচেব জন্যে চাবটে আর গাছেব গোড়ায় মাটি দিতে লাগবে ছ'টা রোজ। তারপব আলু তোলার জন্যে আরও পাচটা রোজ। এ অঞ্চলে খেত মজুরের দু টাকা ক'রে রোজ আর এক টাকা ক'রে খোরাকী।

ছিঁচ দিতেও খরচ আছে। বিঘেভুঁই জমিতে একেক দিন একেক ঘণ্টা ক'রে ছিঁচ লাগবে মোট আটটা। তার জন্যে পাম্পিং-এর ভাড়া ঘণ্টায় চার টাকা।

তার মানে, বিঘেভুঁইতে আলু চাষের খরচ দাঁড়াচ্ছে প্রায় সাড়ে চার শো টাকা। বিঘেতে ফলন হয় গড়ে ষাট মণ। গড়ে পনেরো টাকা মণ দবে বিক্রি হলে চাষীর হাতে দু পয়সা হয়।

এখানে সব কিছুরই কেনাবেচা হয় চাঁপাডাঙার মোকামে। গ্রামে

গ্রামে থাকে এপার ওপারের মহাজনদের দালাল। ধান পাট আলু— সব কিছুই এরা কেনে। এরা নিজেরা চাষও করে, আবার মহাজনদের হয়ে দালালিও করে। গ্রামের মাঠ থেকে গরুর গাড়িতে ক'রে মাল নিয়ে বড় রাস্তায় লরিতে তোলে। তারপর সে মাল পৌঁছে দেয় চাঁপাডাঙার বড় বড় আঁড়তদারদের মোকামে। দালালরা মণে এক টাকা দালালি পায়। তারপর অনেক হাত ঘুরে সে আলু বাজারে ওঠে। চাষী যে দরে বেচে আর বাজারে লোকে যে দরে কেনে তাতে মণে কম ক'রে পাঁচ টাকার ফারাক হয়।

কথা বলতে বলতে রাত্তির হয়ে যাচ্ছিল। কথা দিয়েছিলাম সন্ধ্যেবেলা ভেটীপাড়ায় যাব নাটকের মহলা দেখতে। কাজেই আড্ডা ছেড়ে উঠতে হল।

মাটির একটা বড় ঘর। সেটাই ভেটি পাড়ার কারখানা। কিন্তু গিয়ে দেখি সব ভোঁ ভাঁ। শুধু দু চারজন লোক ব'সে। বেশ উত্তেজিত হয়ে কী নিয়ে যেন তারা কথা বলছে।

জিজ্ঞেস ক'রে জানা গেল, পাড়ায় একটা ব্যাপার নিয়ে একটু ঘোলামোলা চলেছে। গ্রামে একজনের বাড়ি থেকে কাল কলসী কয়েক গুড় চুরি গিয়েছিল। আজ এমন একজনের বাড়িতে সেগুলো পাওয়া গেছে, যে একাজ করতে পারে ব'লে কারো ধারণাতেই ছিল না। সবাই বুঝতে পারছে, এটা একেবারেই অভাবে স্বভাব নষ্টের ব্যাপার। তবু এতে গোটা পাড়ারই তো বদনাম। তাছাড়া সকলেই জানে, গুড় চুরি করার একটা বিশেষ মানে আছে। বেশী জানাজানি হলে আবার কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়বার ভয় দুপক্ষেই আছে।

কাজেই ব্যাপারটা যেন বেশীদূর না গড়ায় সেই ব্যবস্থা করতে সবাই ব্যস্ত।

তারপর? আপনি এখানে কী মনে ক'রে? গ্রাম নিয়ে লিখবেন বুঝি? বাইরে থেকে দেখে কিছুই বুঝবেন না, স্যার। সব উল্টো

পাল্টা লিখবেন। লিখতে গেলে এখানে এসে থাকতে হবে। একদম আমাদের সঙ্গে। তবে বুঝতে পারবেন কিভাবে আমরা বেঁচে আছি। আমরা আপনাকে খেতে দিতে পারব না। কেননা এ পাড়ায় বাড়ি বাড়ি ঘুরলেও কোথাও একদানা চাল পাবেন না। আপনি সরকারী লোক নন তো? কিছু মনে করবেন না, স্যার।

লেখাপড়া করেন? লেখাপড়ার মুখে আগুন। ঐ যে আমাদের পাড়ার মাস্টার···লেখাপড়া শিখে তার এমন দেমাক হয়েছে যে বাগ্দীদের সমাজে আর মিশতে চায় না।

আপনি বাইরের লোক, আপনাকে আর সে অলপ্পেয়ে অলবড়্যেটার কথা কী বলব···আমাদের ঐ যে অমুকের ভাইগো, সে মুখপোড়াও এখন মাস্টার হয়েছে। কোন্নগরের কাছে কোথায় পড়ায়। ওর দাদা দিনমজুরি ক'রে কত কষ্টে ওকে পড়াল। এম-এস্‌সি পাশ করল। বুড়ো মা, ভাই, দাদা—কারো দিকে সে আজ একবার চেয়েও দেখে না। কলকাতার ভদ্দরলোকদের তো জানেন···আজকাল এক কায়দা হয়েছে। মেয়ের জন্যে মাস্টার রাখে, তারপর সেই বড়শীতেই মাস্টারকে জামাই হিসেবে গেঁথে তোলে। ওর তাই হল। এক উঁচু জাতের মেয়ে বিয়ে করেছে। তাও দেখতে ভাল হলে কথা ছিল। বাপটা বিনিপয়সায় মেয়ে পার করে দিয়েছে। বোকা আর কাকে বলে। কেন? বাগ্দী সমাজে কি মেয়ে জুটত না! দু পাঁচ হাজার টাকা দেবার মত লোকও পাওয়া যেত। কী হবে ছেলেপুলেদের লেখাপড়া শিখিয়ে? লেখাপড়া শিখে তো এই হাল···

রাত্তির হয়ে যাচ্ছিল। উঠতে হল।

ফিরে আসতে আসতে মনে হচ্ছিল—সমস্যাটা জাতের নয়, লেখাপড়া শেখা না শেখারও নয়। সমস্যাটা শ্রেণীর। কাছের লোক দূরে চলে যাবার। যাকে ধ'রে বাকি সবাই উঠে দাঁড়াবে ভাবছিল, হঠাৎ হাত ছেড়ে দিয়ে তার ওপরে উঠে আপন বাঁচার পন্থা নেওয়া।

সত্যিই তো। এঁকে বাঁচা বলে না। পালানো বলে।